রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

নেপাল মজুমদার

সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী :: কলিকাতা ৬

ভূমিকা

'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের রাজনীতিক দর্শন ও চিন্তা-চেতনার বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থের বিষয় নয়। অন্যত্র আমরা সে আলোচনা করেছি।

ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এক বিশেষ যুগ-সন্ধিক্ষণে সুভাষচন্দ্র যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকে কি চোখে দেখেছিলেন,—রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সম্পর্কই বা কি ছিল, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারই বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যানুগ ইতিহাস অনুধাবন করাই হল এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁদের এই সম্পর্ক কিছুতেই ঠিকমত বর্ণনা করা যাবে না, যদি না সমসাময়িক দেশের তথা বিশ্বের রাজনীতিক পটভূমি এবং চিন্তা-চেতনা ও আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার ঘাত-প্রতিঘাত সঠিকভাবে চিত্রিত করা যায়।

গত ত্রিশ থেকে চল্লিশ দশকে অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে বিশ্বসংকট যতই ঘনীভূত হতে থাকে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক সংকট ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত ততই তীব্র এবং প্রকট হতে থাকে,—বিশেষতঃ কংগ্রেসের মধ্যে।

এই সংকটকালে সুভাষচন্দ্র যখন, কংগ্রেসের মধ্যে সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিশীল দল-গোষ্ঠীগুলিকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করে সারা দেশব্যাপী এক প্রত্যক্ষ গণসংগ্রামের জন্য উদ্যোগী হলেন, স্বভাবতঃ তার ফলে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ-সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব তখনও পর্যন্ত সুবিধাবাদী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের কব্জার মধ্যে। তাই ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্রের প্রাথমিক পরাজয় ঘটল। তাছাড়া বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলিও শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারলেন না। ফলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যে 'বামপন্থী সমন্বয় কমিটি'

(১৯৩৯ সালে জুন মাসে) গড়ে উঠছিল তা ভেঙ্গে ছত্রখান হয়ে গেল। এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব পুনরায় দক্ষিণপন্থীদের দৃঢ় কব্জাবদ্ধ হল।

মহাযুদ্ধ তখন পুরোবেগে শুরু হয়ে গেছে। ইংরেজরা ঘরে-বাইরে 'অক্ষ শক্তি'র হাতে পর্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত। সোভিয়েট রাশিয়া তখনও আক্রান্ত হয় নি এবং যুদ্ধের চরিত্ররূপ নিয়ে তখনও পর্যন্ত বামপন্থীদের মধ্যে কোন গুরুতর মতপার্থক্য হয় নি। এই সুযোগে সুভাষচন্দ্র শেষবারের মতো দেশের মুক্তির জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কার্যসূচী রাখলেন। বলা বাহুল্য, তা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হল। একক বিচ্ছিন্ন সুভাষচন্দ্র শেষ পর্যন্ত বিপ্লব প্রচেষ্টায় ও শক্তি সংগ্রহের জন্য দেশের বাইরে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।

অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের কথা এই যে, আমাদের দেশের মুক্তিসংগ্রামের এত বড় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আজও পর্যন্ত কোন বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত ইতিহাস রচিত হল না। এই অধ্যায়ে গান্ধী জওহরলাল সুভাষচন্দ্র এবং কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বামপন্থী দলগুলির—বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিক ভূমিকার নতুন করে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশী করে অনুভূত হচ্ছে—কেননা এই বিশ্লেষণ সমীক্ষা ও পর্যালোচনার মধ্যেই অতীতের ভুল-ত্রুটিগুলি ধরা পড়বে, যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের নির্ভুল কর্মনীতি নির্ধারণের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়।

বলা বাহুল্য, এই ইতিহাস রচনা কিংবা তার সমীক্ষাও এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের সবিনয় নিবেদন, এই ইতিহাস রচনার জন্য কিছু মূল্যবান তথ্য ও মাল-মশলা আমরা সংগ্রহ ও সংকলন করে দেবার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থ মধ্যে। পূর্বেই বলেছি, সুভাষচন্দ্রের রাজনীতিক কর্মসাধনাকে রবীন্দ্রনাথ কি চোখে দেখেছিলেন বা দেখতে চেয়েছিলেন, উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি ছিল, তা অনুধাবন করাই হল এই গ্রন্থরচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। এবং এই কারণেই এই কালের রাজনীতিক ইতিহাসের একটি রেখাচিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে গ্রন্থ মধ্যে। সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের স্থান আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। তাই তাঁদের জীবনের ও কর্মসাধনার ইতিহাস ভাবাবেগ ও মোহহীন দৃষ্টিতে রচনা করার প্রয়োজন বেশী করে অনুভূত হচ্ছে।

সুভাষচন্দ্রের রাজনীতিক কর্মসাধনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং তাঁর বক্তৃতা, ভাষণ, বিবৃতি ইত্যাদির উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে চিঠিপত্র, বাণী ও তার-বিনিময় ইত্যাদি গ্রন্থ-মধ্যে সংকলিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য, ১৯৩১ সালে বন্যাত্রাণ উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মধ্যে যে মনোমালিন্য ও বিতর্ক হয় তার তথ্যসম্বলিত ইতিহাস বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া National Planning Commission ও সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারে ডঃ মেঘনাদ সাহা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন তারও বিস্তারিত প্রামাণ্য তথ্যাদি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমি 'বিশ্বভারতী'র পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছি। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ 'রবীন্দ্র সদন'-এ রক্ষিত তথ্য ও চিঠিপত্রাদি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য ও ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের কাছ থেকে সর্বদাই উৎসাহ প্রেরণা লাভ করেছি। শ্রদ্ধেয় শৈলেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছ থেকেও নানা বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ লাভ করেছি। 'নবজীবন ট্রাস্ট' ও 'নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো' গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের চিঠিপত্রগুলির জন্য এবং ডঃ অজিতকুমার সাহা ও শ্রীঅনিলকুমার চন্দ ডঃ মেঘনাদ সাহা ও তাঁর মধ্যে পত্র-বিনিময় ইত্যাদি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। 'ন্যাশানাল লাইব্রেরী' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কর্তৃপক্ষ পুরান পত্রিকার ফাইলগুলি দেখবার অনুমতি দিয়েছেন। এই সুযোগে সকলকেই আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সর্বশ্রী শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দেব, রঞ্জিত রায়, ডঃ সুশীল রায়, ডাঃ শিশিরকুমার বসু, তরুণকুমার দাস, অজয়েন্দ্রনাথ দত্ত, জানকীনাথ দত্ত, সৌম্যেন অধিকারী এবং 'রবীন্দ্র সদন' 'বিশ্বভারতী সেন্ট্রাল লাইব্রেরী' ও বিশ্বভারতী 'গ্রন্থন বিভাগ'-এর পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করেছি।

বন্ধুবর অরুণকুমার রায় ও অধ্যাপক অশোককুমার ভট্টাচার্যের উৎসাহ ও সহযোগিতা না-পেলে এই গ্রন্থরচনা সম্ভব হত না। সব শেষে 'সারস্বত

লাইব্রেরী'র কর্তৃপক্ষকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এই দুর্দিনে তাঁরা যে এই ধরনের গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহী হয়েছেন তাতে তাঁদের সারস্বতমনা ও রুচিবোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থ প্রকাশের কাজে সর্বশ্রী প্রশান্ত ভট্টাচার্য ও অমিয় ভট্টাচার্য মশায়ের সাহায্য পেয়েছি। শিল্পী বন্ধু শ্রীচারু খান্ প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করে দিয়ে বাধিত করেছেন।

উল্লেখযোগ্য, এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায়ই ইতিপূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া 'চতুষ্কোণ' ও 'সারস্বত' পত্রিকায়ও কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলা দরকার। ভারতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের মহান ভূমিকা এবং তাঁর রাজনীতিক চিন্তা-চেতনা ও কর্মসাধনার বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত ইতিহাস লেখকের "ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ" চার খণ্ডে আলোচিত হয়েছে।

১৯শে কার্তিক, ১৩৭৫

হেতমপুর

বীরভূম

নেপাল মজুমদার

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

'মহাজাতি সদন'-এর ভিত্তিপ্রস্তরস্থাপন অনুষ্ঠানে
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র : আদিপর্ব

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কখন প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয়, কখন তাঁদের মধ্যে পত্রবিনিময় শুরু হয় সঠিকভাবে তা জানা যায় না। যতদূর জানা যায় ১৯১৪ সাল নাগাদ সুভাষচন্দ্র একদল ছাত্র সহ শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেদিন তিনি ছাত্রদের কর্তব্য বা করণীয় বিষয় সম্পর্কে কবির কাছে উপদেশ চান। সুভাষচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সী কলেজের ইন্টারমিডিয়েট্ ক্লাসের ছাত্র। তখন তিনি তাঁর পথ ও গুরু খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কবি সেদিন তাঁদের পল্লী-উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তরুণ সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুদের এ উপদেশ ঠিক মনঃপূত হয় নি,—অর্থাৎ তার তাৎপর্য সেদিন তাঁরা সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি, একথা সুভাষচন্দ্র স্বয়ং পরে লিখেছেন।

এর প্রায় দুবছর পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের জনৈক ভারত-বিদ্বেষী ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন সাহেবকে (Prof. E. F. Oaten) সেখানকার ছাত্ররা প্রহার করার ফলে যে গোলমালের সৃষ্টি হয়, তার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করেন।

এই ঘটনাটি নিয়ে দেশে তখন বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, এই ঘটনাটি উপলক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ এই সময় 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' প্রবন্ধটি (সবুজপত্র, চৈত্র ১৩২২। দ্রঃ শিক্ষা।। পৃঃ ২০১-১৭) রচনা করেন। এই প্রবন্ধটির ইংরেজী তর্জমাও *Modern Review*-তে প্রকশিত হয়। কবি তার একটি কপি বাংলার তদানীন্তন গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের কাছে পাঠিয়ে দেন এই আশায় যে, গভর্নর চ্যান্সেলার হিসেবে ছাত্রদের সম্পর্কে চূড়ান্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে সহৃদয়তার সঙ্গে তাদের কথাটা বিচার করে দেখবার সুযোগ পাবেন। কী ভয়ঙ্কর আত্মাবমাননা ও অপমানজনক ব্যবহার করার ফলে ছাত্ররা এই রকম আচরণ করতে প্ররোচিত হয়েছিল,

এই কথাটাই সকলকে বোঝাবার জন্য কবি সেদিন খোলাখুলি ছাত্রদের পক্ষ সমর্থন করে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। বলা বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেদিন সুভাষচন্দ্রকে ক্ষমা করেন নি। সুভাষচন্দ্র কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

এর প্রায় বছরখানেক পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রের উপর কিছুটা সদয় হলে তিনি 'স্কটিশচার্চ' কলেজে পড়বার সুযোগ পান (জুলাই, ১৯১৭)। সেখান থেকে দর্শনে 'অনার্স' নিয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি বি. এ. পাস করে বিলেতে আই. সি. এস. পড়তে যান (১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর)। সেখানে মাত্র ৮মাস পড়েই তিনি পরীক্ষা দিয়ে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে আই. সি. এস. পাস করেন।

এর অনতিকাল পরেই দেশে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। বিলেতে থাকতেই সুভাষচন্দ্র এই আন্দোলনের সংবাদ পেয়ে মনস্থির করে ফেলেন, ইংরেজের গোলামী তিনি করবেন না,—দেশের মুক্তির জন্য তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করবেন। অরবিন্দ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সর্বত্যাগী মূর্তিটি তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে তখন কলকাতার ছাত্রসমাজ দলে দলে স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাংলার ছাত্রসমাজকে অভিনন্দন জানিয়ে গান্ধীজী স্বয়ং কলকাতা এসে 'ন্যাশনাল কলেজ'-এর উদ্বোধন করে গেলেন (৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২১)। এই সব সংবাদে সুভাষচন্দ্র খুবই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বিলেতে থাকতেই ১৯২১ সালের মে মাসেই তিনি সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দিলেন।

স্মরণ রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপ ও আমেরিকা সফর করে দেশে ফিরছেন। সুভাষচন্দ্র বিলেতে থাকাকালে তাঁর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকার কিংবা বিশেষ কোন আলাপ-আলোচনা হয়েছিল কিনা জানা যায় না। তবে দেশে ফেরার পথে তাঁরা উভয়েই একই জাহাজে ফেরেন। এই ফেরার পথে জাহাজেই অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। শোনা যায় কবিই নাকি সুভাষচন্দ্রকে গান্ধীজীর কাছে নির্দেশ গ্রহণ করবার পরামর্শ দেন। সুভাষচন্দ্রও গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করে

ঐ দিনই (১৬ই জুলাই, ১৯২১) অপরাহ্লে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজী তাঁকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর নির্দেশানুযায়ী কাজ করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কলকাতায় ফেরার পরই সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। তিনি হলেন জাতীয় বিদ্যাপীঠের প্রথম অধ্যক্ষ। এর পর তাঁর অসামান্য প্রতিভাবলে কিভাবে তিনি ভারতবর্ষের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চের প্রথম সারিতে স্থান করে নেন সে-ইতিহাস আজ সকলের কাছেই খুবই সুপরিচিত।

কিন্তু এখানে যেটা লক্ষ্য করবার বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে, ১৯২১ থেকে ১৯৩০—এই দীর্ঘ নয় বৎসরের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্রের মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল না। অবশ্য এর মধ্যে সুভাষচন্দ্র দু একবার কবির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলেও তাঁর কাছে ঘনিষ্ঠভাবে এগিয়ে যাবার মত তেমন কোন আগ্রহ-আকর্ষণ অনুভব করেন নি।

সম্ভবত তার অন্যতম কারণ এই যে, অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে কবির মনোভাব ও বক্তব্য সুভাষচন্দ্রের ভালো লাগে নি। তাছাড়া দেশবন্ধুর অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাঁর রাজনীতিক চিন্তাধারা ও মানসিকতা ধীরে ধীরে একটা অবয়ব নিচ্ছিল। এবং অল্প কাল পরেই প্রায় সমস্ত দিক থেকেই তিনি দেশবন্ধুকে 'গুরু'র পদে বরণ করে নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এর বেশ কিছু কাল আগে থেকেই দেশবন্ধু রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যকৃতির এবং তাঁর রাজনীতিক চিন্তার তীব্র সমালোচনা করে আসছিলেন। ১৯২১ সালে ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর অসহযোগ-তত্ত্ব, বয়কট ও চরকা-আন্দোলন সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করলে তার প্রতিবাদে দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র (ঔপন্যাসিক), আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখেরা কবির বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা শুরু করলেন। এই প্রসঙ্গে একটি তথ্যের উল্লেখ করব।

১৯২১ সালে ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু, মোলানা আজাদ, সুভাষচন্দ্র ও আরো কয়েকজন নেতা গ্রেপ্তার হলেন। তার কিছুদিন পরেই আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনের কথা এবং দেশবন্ধু পূর্বেই এর সভাপতি নির্বাচিত

হয়েছিলেন। বন্দী হবার পর জেল থেকেই তিনি তাঁর সভাপতির অভিভাষণটি লিখে পাঠান এবং হাকিম আজমল খাঁ এটি আমেদাবাদ কংগ্রেসে পাঠ করেন। কিন্তু এই ভাষণেও অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা [দ্রঃ *Congress Presidential Addresses*, Vol-II. Pp. 538-39] করে তিনি লিখলেন,

"আমাদের চরম লক্ষ্য স্বাধীনতা, কেননা জাতীয় ধারার অনুযায়ী করিয়া আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার এবং জাতির ভাগ্য গঠন করিবার অধিকার দাবি করিতেছি। আমরা চাই না ইহাতে পাশ্চাত্যের আরোপিত অনুষ্ঠানগুলি আমাদের প্রতিবন্ধকতা করে, অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার শিক্ষা দ্বারা আমাদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে। এইখানে আমি ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথের বাণী শুনিতে পাইতেছি, তাহা আমায় বাধা দিয়া বলিতেছে, 'পাশ্চাত্যের সভ্যতা আজ আমাদের দ্বারে অতিথি হইয়া আসিয়াছে, আমরা কি আতিথেয়তা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে বিমুখ করিব; আমরা কি স্বীকার করিব না যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্মেলনেই জগতের মুক্তি নিহিত রহিয়াছে।'

"আমি স্বীকার করি ভারতীয় জাতীয়তাকে বাঁচিতে হইলে অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে আসিতেই হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্তির বিরুদ্ধে আমার দুইটি কথা বলিবার আছে। প্রথম কথা এই যে, আতিথেয়তা প্রদর্শনের পূর্বে আমাদের নিজস্ব একখানি আবাস থাকা প্রয়োজন, আর দ্বিতীয় কথা এই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করিবার পূর্বে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতাকে তাহার আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস স্বাধীনতা না আসিলে প্রকৃত মিলন অসম্ভব, যদিও অন্ধ দাসোচিত অনুকরণ হইতে পারে যেমনটি এতাবৎকাল হইয়া আসিয়াছে। বৈদেশিক শিক্ষা-দীক্ষার নিকট ভারতীয় সভ্যতার পরাজয় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে—ইহা রাজনীতিক অধীনতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ভারতকে ইহার প্রতিরোধ করিতেই হইবে। যখন ভারতের জাতীয় জীবনের অন্তর-স্পন্দন অনুভূত হইবে, কেবল তখনই উভয় সভ্যতার সম্মেলনের কথা উঠিতে পারে।"

[নারায়ণ, ৮-ম বর্ষ, ৪-র্থ সংখ্যা ।। ফাল্গুন, ১৩২৮]

স্বভাবতঃই সুভাষচন্দ্রের 'পরে তাঁর গুরুর এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব পড়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন ও তার পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র কি ধারণা পোষণ করে আসছিলেন সে-কথা পরে তিনি তাঁর *The Indian Struggle* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ (১৯৩৪) করেছেন। এখানে তার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা হল ঃ

"মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতীয় উদারপন্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগণের সহিত খুবই মিল ছিল, যাঁহারা কংগ্রেসের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বর্জনের নীতিতে ভীষণ অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। অসহযোগের জোয়ারে যদিও তাঁহাদের প্রভাব সাময়িকভাবে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, তবু যেটুকু প্রভাব তখনও তাঁহাদের ছিল উহাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছিলেন। এই চেষ্টায় তাঁহারা ভারতের বিখ্যাত কবি ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত এক বিরাট ব্যক্তির সমর্থন লাভ করেন। জুলাইয়ের প্রায় মাঝামাঝি কবি ইউরোপ হইতে বোম্বাইয়ে পোঁছেন। বাস্তবিক পক্ষে ঐ একই জাহাজে তাঁহার সঙ্গে আমি আসি। আমাদের যাত্রাপথে তাঁহার সঙ্গে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত অসহযোগের নূতন নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তিনি কোনও প্রকারেই ঐ নীতির বিরোধী ছিলেন না। তাঁহার শুধু ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল এই যে, আরও বেশী গঠনমূলক কাজ হউক, যাহাতে শেষ পর্যন্ত দেশবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া এক রাষ্ট্রের মধ্যে আর এক রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা যায়। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সহিত আয়ার্ল্যাণ্ডের সিন্‌ফিন্‌ আন্দোলনের গঠনমূলক দিকের মিল ছিল এবং আমার মতও ছিল একেবারে অনুরূপ। কিন্তু তিনি ভারতে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই একদল লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিলেন, যাঁহারা অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন ; এবং ঐ আন্দোলনের ত্রুটিসমূহের প্রতি— এবং সেই সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও ভেষজবিদ্যা, কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচীর সহিত যাহার কোনও সম্পর্ক ছিল না, সে-সম্বন্ধে মহাত্মার ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিই কেবল তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণে তাঁহারা অগ্রণী হইলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করাই

অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য এরূপ একটা ধারণা হওয়ায় কবি 'শিক্ষার মিলন' শিরোনামায় কলকাতায় একটি তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ দিলেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা হইতে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার যে কোনও প্রচেষ্টাকে স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্জনের বিরোধিতা করিলেন। এই আক্রমণকে মুখ বুজিয়া কংগ্রেসী মহল মানিয়া লইতে পারিলেন না কিন্তু কবির সমযোগ্যতাসম্পন্ন এমন একজন বিদগ্ধ ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব ছিল না, যিনি তাঁহার আক্রমণের জবাব দিতে পারেন। যাহা হউক, বাংলার প্রধান ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'শিক্ষার বিরোধ' সম্বন্ধে এক ভাষণে ইহার জবাব দিতে সাহসী হইলেন। তাঁহার ভাষণের মূল কথা ছিল এই যে, যদিও সংস্কৃতির একটা বিশ্বজনীন ভিত্তি আছে তবু প্রত্যেক দেশের নিজস্ব বিশেষ একটি সংস্কৃতি রহিয়াছে, যাহা তাহার জাতীয় প্রতিভার সৃষ্টি। ভারতকে তাহার নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা ও উহার বিকাশসাধন করিতে হইবে, এবং তাহা করিতে গিয়া যদি বৃটিশ প্রভাবযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল বর্জন করিতে হয়, তাহাতে আপত্তির কিছু নাই। কবির আক্রমণকে বরণ করিয়া লওয়া মহাত্মার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব ছিল না; বিশেষতঃ এই কারণে যে, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতেই তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল। কবিকে শান্ত করিবার জন্য মহাত্মাকে সেজন্য কয়েকবার তাঁহার নিকট যাইতে হইল। কিছুকাল কাটিবার পর কবি বাধাদান হইতে একেবারে নিরস্ত হইলেন। এবং মহাত্মার পরবর্তী আন্দোলনগুলিতে তাঁহার বিশ্বস্ততম সমর্থকদিগের একজন হইয়া উঠিয়াছিলেন।"

[ভারতে মুক্তির সংগ্রাম, পৃঃ ৬০-৬১]

বলা বাহুল্য, অসহযোগ আন্দোলন এবং বিশেষতঃ গান্ধীজী সম্পর্কে কবির ধারণা ও বক্তব্য সুভাষচন্দ্র সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। অসহযোগ অন্দোলনকালে কবির একটা মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল সত্য কথা, কিন্তু তার অর্থ এই নয়, তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অস্বীকার কিংবা তার বিরোধিতা করেছিলেন। পরন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন

উপলক্ষে সারা ভারতে যে অভূতপূর্ব জনজাগরণ, স্বাধীনতাস্পৃহা ও সংগ্রামী-চেতনার উন্মেষ ঘটে, কবি তাকে বার বার স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাছাড়া সংগ্রামের নীতি ও কৌশলের ক্ষেত্রে গান্ধীজী যে অহিংস সত্যাগ্রহ সংগ্রামের সূচনা করেন কবি তাকেও বার বার স্বাগত অভিনন্দন জানান।

কিন্তু গান্ধীজীর কাছ থেকে তিনি আরও অনেক বেশী প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন, অশিক্ষা ও সমস্ত মধ্যযুগীয় ধর্মীয় কুসংস্কারের বাঁধ-ভাঙার আন্দোলনে গান্ধীজী নেতৃত্ব দিয়ে জনচেতনাকে গণতান্ত্রিক চেতনা ও আন্দোলনের দিকে প্রসারিত করবেন। কবি চিরদিনই ইউরোপের রেনেসাঁস-রিফর্মেশান-রেভল্যুশনের মর্মবাণীকে—ইউরোপের চিত্তমুক্তির বাণীকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই দিক থেকে কবি অত্যন্ত নিরাশ হলেন। অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনে সারা ভারতে তীব্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে উগ্র ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদের যে জোয়ার এসেছিল রবীন্দ্রনাথের মত কবির পক্ষে তা মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। বস্তুতঃ একদিকে যেমন তিনি জনসাধারণের কুসংস্কারমুক্ত গণতান্ত্রিক চেতনার মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন অপর দিকে তেমনি দেশের স্বাধীনতা বা মুক্তি সংগ্রামের তিনি একটা আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এই, ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাধনায় আন্তর্জাতিকতার মহান বাণী থাকা চাই। স্মরণ রাখা দরকার, গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ই কবি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের এবং পূর্ব পশ্চিমের মিলনকেন্দ্ররূপে 'বিশ্বভারতী'র পরিকল্পনা করেন।

সর্বোপরি গান্ধীজীর জীবন-দর্শন—বিশেষতঃ তাঁর 'হিন্দ্-স্বরাজ-'এর আর্থনীতিক-দর্শনকে কবি কোনদিনই স্বীকার বা গ্রহণ করতে পারেন নি। পক্ষান্তরে কবি একদিকে যেমন সামগ্রিক পল্লী-পুনর্গঠন কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন অপরদিকে তেমনি আধুনিক শিল্পায়ন (Modern Industrialisation) এবং সমবায় ও বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত ক্ষেত-খামার গড়ে তুলবার জন্য আন্দোলন করে চলেছিলেন। এই সব গুরুতর মৌলিক প্রশ্নে গান্ধীজীর সঙ্গে কোনদিনই তাঁর মতৈক্য কিংবা

আপোষ হয় নি। যদিও গান্ধীজীর চারিত্র-মাহাত্ম্য ও তাঁর ঐতিহাসিক অবদানকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানাতে তিনি কোনদিনও কুণ্ঠিত হন নি এবং তাঁদের ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যও কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয় নি। এ সব কথার আমরা অন্যত্র বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আলোচনা করেছি।*

যাই হোক, এই কালের মধ্যে সুভাষচন্দ্র কেন যে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে এগিয়ে যাবার আগ্রহ-আকর্ষণ অনুভব করেন নি তা তাঁর উপরোক্ত রচনাটির থেকে কিছুটা আঁচ করা যায়।

এবার আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য ১৯২১ থেকে ১৯৩০ সাল—এই কালের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তাঁর কর্মসাধনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করব ঃ

পূর্বেই বলেছি, ১৯২১ সালে জুলাই মাসে বিলেত থেকে ফিরেই সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর নির্দেশে জাতীয় বিদ্যাপিঠের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধু সহ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ঐ বৎসরই ১০ই ডিসেম্বর তিনি দেশবন্ধু, মৌলানা আজাদ প্রমুখ কয়েকজন নেতার সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে দেশবন্ধুর ও তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ড হয়।

পর বৎসর—১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরের শেষভাগে উত্তরবঙ্গে এক ভয়াবহ বন্যাপ্লাবন হয়। এই সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র তার অন্যতম সেক্রেটারী হিসেবে বন্যাত্রাণ কার্যে অপূর্ব কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন।

ঐ বৎসরই ডিসেম্বরের শেষভাগে তিনি ঐতিহাসিক গয়া-কংগ্রেসে, যোগদান করেন। সেখানে তিনি দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলের কাউন্সিল প্রবেশ নীতির সমর্থন জানালেন। এর অনতিকাল পরেই—১৯২৩ সালে ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন প্রচারকার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন; তাছাড়া বাংলা দেশে 'স্বরাজ্য দল' গঠনেও অপূর্ব কর্মকুশলতার পরিচয় দেন। দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত 'বাংলা কথা' নামে একটি দৈনিক পত্র হল তাঁদের প্রচার-

* লেখকের "ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ" ২-য় ও ৩-য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

কার্যের প্রধান হাতিয়ার এবং সুভাষচন্দ্র হলেন তার সম্পাদক। পরে দেশবন্ধুর *Forward* পত্রিকার পরিচালনার দায়িত্বও তাঁর উপর পড়েছিল।

পর বৎসর—১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য-দল কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন-যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং দেশবন্ধুই কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হলেন। এর অল্পকাল পরেই—১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র নূতন আইন অনুসারে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম প্রধান কর্মকর্তা (Chief Executive Officer) নিযুক্ত হন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কর্পোরেশনের এক সিদ্ধান্তের ফলে (পরে বাংলা সরকারের তা অনুমোদনের পর) তাঁর মাসিক বেতন হয় ৩০০০ টাকা, কিন্তু স্বেচ্ছায় তিনি ঐ বেতন না-নিয়ে মাত্র ১৫০০ টাকা বেতন নেন।

এর প্রায় ৬মাস পরেই—২৫শে অক্টোবর (১৯২৪) প্রাতে সুভাষচন্দ্র ও অনিলবরণ রায় প্রমুখ স্বরাজ্যদলের বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় কর্মী গ্রেপ্তার হলেন বঙ্গীয় ফৌজদারী আইনের সংশোধিত অর্ডিন্যান্সের বলে। গ্রেপ্তারের পর সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে আলিপুর জেলে এবং পরে বহরামপুর জেলে আটক রাখা হয়। সবশেষে গভর্ণমেন্ট তাঁকে বর্মার মান্দালয় জেলে আটক করে রাখে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এই সময় মান্দালয় জেল থেকে সুভাষচন্দ্র তাঁর বন্ধু দিলীপ রায়কে দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে দীর্ঘ ও মনোজ্ঞ আলোচনাপূর্ণ এক পত্র দেন (৯ই অক্টোবর ১৯২৫)। দিলীপ রায় মশায় এই চিঠিটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কবি তা পাঠ করে খুবই তারিফ করে দিলীপ রায় মশায়কে পত্র দিয়েছিলেন।

দীর্ঘকাল মান্দালয় জেলে আটক থেকে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ১৯২৭ সালে এপ্রিল নাগাদ তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে চিকিৎসার জন্য রেঙ্গুনে প্রেরণ করা হয়। এর কিছুদিন পরেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলে (১৬ই মে ১৯২৭) তিনি দেশে ফিরে আসেন।

উল্লেখযোগ্য, ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের পক্ষে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থীরা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নানা গোলমালে কংগ্রেসে তা গৃহীত হলেও তখনও পর্যন্ত গান্ধীজী

ও কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা স্পষ্ট করে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'-এর বদলে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র আদর্শ গ্রহণ করতে রাজী হন নি।

এমন কি এর পরের বছরেও কলকাতা-কংগ্রেসে (ডিসেম্বর-১৯২৮) জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থীরা যখন 'পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন তখনও তা গৃহীত হল না। গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাবে আরও এক বৎসর সময় দিতে চাইলেন ইংরেজকে—যদি তারা ইতিমধ্যে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত সর্বদলীয় কমিটির খসড়া শাসনতন্ত্রের (মোটামুটি তাতে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস'ই দাবী করা হয়েছিল) দাবী মেনে নেয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য, বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভায় জওহরলাল বা সুভাষচন্দ্র কেউই গান্ধীজীর এই প্রস্তাবটির সরাসরি বিরোধিতা করতে চান নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্য অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রই গান্ধীজীর ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তার একটি সংশোধনী-প্রস্তাব আনলেন এবং জওহরলাল তা সমর্থন করলেন। সংশোধনী প্রস্তাবটি ছিল এই :

"মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতীয় জনগণের আদর্শ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে অটল থাকিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, ব্রিটিশের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত স্বাধীনতা পাওয়া যাইতে পারে না।"

অবশ্য সংশোধনী প্রস্তাবটি ৯৭৩-১৩৫০ ভোটে পরাজিত হয়। তবুও জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী শক্তি যে বেশ সংহত ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠছে কলকাতা কংগ্রেসে এতে করে তারই প্রমাণ পাওয়া গেল। উল্লেখযোগ্য, ১৯২৮ সালের প্রথম ভাগেই জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ্ গঠিত হয়েছিল। কংগ্রেসের মধ্যে নবীন ও প্রগতিশীল বামপন্থীদের সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে ইংরেজের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার লড়াইয়ের পথ গ্রহণ করার জন্য কংগ্রেসের মধ্যে ক্রমে ক্রমে তাঁরা চাপ সৃষ্টি করে চলেছিলেন। কলকাতা কংগ্রেসের কিছুদিন পূর্বেই সুভাষচন্দ্রের সম্পূর্ণ সামরিক কায়দায় বিরাট এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুললেন, আর তিনিই স্বয়ং হলেন এর সর্বাধিনায়ক (G. O. C.)।

কলকাতা-অধিবেশনে কংগ্রেস প্রতিনিধি ও নেতাদের সুভাষচন্দ্র বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, সামরিক কায়দায় এই বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শক্তি প্রদর্শনের পশ্চাতে তাঁদের উদ্দেশ্য ও বক্তব্যটা কী। যাই হোক কলকাতা কংগ্রেসে শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর প্রস্তাবই গৃহীত হল।

এর ঠিক এক বছর পর লাহোর কংগ্রেসেই পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সত্য কথা, কংগ্রেসে কাউন্সিল বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল বটে এবং ভবিষ্যতে আইন অমান্য ও খাজনা-ট্যাক্স বন্ধেরও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সংগ্রামের কোন সুস্পষ্ট কার্যসূচী দেওয়া হয় নি।

সভাপতি জওহরলাল নেহরু স্বয়ং প্রখ্যাত সমাজতন্ত্রবাদী ও একজন সর্বজন-প্রিয় বামপন্থী নেতা। লাহোর কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে তিনি প্রকাশ্য গণ-সংগ্রামের আহ্বান জানালেন অথচ কংগ্রেসের পরেও আসন্ন সংগ্রামের বিস্তারিত কর্মসূচীর খসড়া তো দূরের কথা, একটা ন্যূনতম কর্মসূচীও তিনি উপস্থাপিত করতে পারলেন না, এইটাই বিস্ময়ের কথা। মার্কস্‌বাদে বিশ্বাসী জওহরলালের পক্ষে জাতীয় আন্দোলনে ন্যূনতম কার্যসূচী উদ্ভাবন ও পেশ করা মোটেই শক্ত ছিল না। আসলে তিনি জানতেন, কংগ্রেসে প্রধানতঃ গান্ধীজীর আনুকূল্যে ও অনুগ্রহে তিনি সভাপতি। যে-কংগ্রেসের নেতৃত্বে গান্ধীজীর এত প্রভাব প্রতিপত্তি, যেখানে গান্ধীজী যা বলবেন তাই কংগ্রেসে গৃহীত হবে, সেখানে তিনি জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের একটি সর্বাত্মক কার্যসূচী পেশ করতে সাহস পান নি। তাই সংঘর্ষের কার্যক্রম নির্দেশের ভার নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর অর্পিত হলেও কার্যতঃ গান্ধীজীর উপরেই সর্বাধিনায়কের দায়িত্বভার অর্পিত হল।

অথচ লাহোর কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও এক বলিষ্ঠ সংগ্রাম-নীতির প্রস্তাব পেশ করেন। চূড়ান্ত সংগ্রামের ও পাল্টা-সরকার গঠনের লক্ষ্য ও পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেশের শ্রমিক, কৃষক ও যুব সংগঠনের সাহায্যে অন্দোলনকে বেগবান করবার আহ্বান জানিয়ে লাহোর কংগ্রেসে এক প্রস্তাব আনলেন। এই সংশোধনী প্রস্তাবের এক জায়গায় তিনি বললেন

"ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদ এবং তাহার বন্ধুদের উচ্ছেদ-সাধনের নিমিত্ত ও পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভের জন্য এই কংগ্রেস সংকল্প

করিতেছে যে, ভারতবর্ষে পাশাপাশি আর একটি প্রতিযোগী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পক্ষে অবিরাম আন্দোলন চালাইতে হইবে এবং অপরদিকে কর-প্রদান বন্ধ ও যেখানে যখন সম্ভব হইবে তখন সেখানে ব্যাপক ধর্মঘট সমেত নিরুপদ্রব আইন-অমান্য আন্দোলন চালাইতে হইবে। এই দুইটি কার্যপদ্ধতি সফল করিবার উদ্দেশ্যে এই কংগ্রেস যুবকদিগকে, শ্রমিকদিগকে, কৃষকদিগকে এবং নিপীড়িত সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য দেশবাসীদিগকে আহ্বান করিতেছে এবং কংগ্রেসের মূলনীতি অনুসারে এই কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছে যে, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহ, গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিটিসমূহ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, পোর্ট-ট্রাস্ট, আদালত ইত্যাদি বর্জন করিতে এবং কংগ্রেসসেবিগণকে ভবিষ্যতে নির্বাচন প্রার্থী না-হইতে অনুরোধ করিতেছে এবং ব্যবস্থাপক সভা, কমিটি ও লোকাল বডি'র বর্তমান সদস্যদিগকে পদত্যাগ করিতে এবং আইনজীবীদিগকে অবিলম্বে ব্যবসায় বন্ধ করিতে অনুরোধ করিতেছে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা জানুয়ারী ১৯৩০ ।। ১৭ই পৌষ, ১৩৩৬]

কাউন্সিল বয়কট সম্পর্কে মতিলাল নেহরুর প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি বললেন, শুধু এই কার্যসূচীই স্বাধীনতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এর জন্য তিনি শ্রমিক ও কৃষকের আন্দোলনের সঙ্গে সর্বাত্মক বা বয়কটের পূর্ণ কর্মতালিকা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে তাঁর ভাষণে বলেন :

"আমরা যদি কংগ্রেসকে শক্তিশালী এবং সংগ্রামশীল করতে চাই, তাহা হইলে যাহারা কংগ্রেসের বাহিরে আছে, তাহাদিগকে ভিতরে আনিতে পারিব বলিয়া আমার বিশ্বাস ;—কৃষক, শ্রমিক এবং যুবকদের কথাই আমি বলিতেছি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই সব শ্রেণীর অর্থনীতিক এবং সামাজিক অভিযোগ আছে। এই জন্য ইহারা কংগ্রেসের বাহিরে রহিয়াছে। অর্থনীতিক এবং সামাজিক অন্যায়গুলিরও প্রতিকার করিতে হইবে ; শুধু রাজনীতি লইয়া সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না। ঐ সব শ্রেণীকে কংগ্রেসের ভিতরে আনিয়া তাহাদের শক্তিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিযুক্ত করিতে

হইবে। কংগ্রেস যদি অত্যাচারিতের পক্ষে না দাঁড়ায়, তবে যে কংগ্রেস কি করিয়া তাহার রাজনীতিক কর্মতালিকা লইয়া অগ্রসর হইতে সফল হইবে আমি বুঝি না। বয়কটকে যদি কার্যকর করিতে হয়, তাহা হইলে বয়কটের পূর্ণ কর্মতালিকা লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত। আংশিক বয়কটের আমি কোন মূল্য দেখি না। আদালতে গিয়া আইন-ব্যবসা করা পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণার বিরোধী, কলিকাতা কর্পোরেশনের ন্যায় প্রতিষ্ঠানসমূহে রাজানুগত্যের শপথ গ্রহণও ঐরূপ স্বাধীনতার মূলনীতির বিরোধী। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। আধাআধি কোন কাজ আমি পছন্দ করি না। এই জন্য আমি বয়কটের পূর্ণ তালিকা গ্রহণের পক্ষপাতী।" [ঐ]

এ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র পরে লিখেছেন,

……"On behalf of the Left Wing, a resolution was moved, by the writer, to the effect that the Congress should aim at setting up a parallel Government in the country and to that end, should take in hand the task of organising the workers, peasants and youths. This resolution was also defeated, with the result that though the Congress accepted the goal of complete independence as its objective, no plan was laid down for reaching that goal—nor was any programme of work adopted for the coming year."…[*The Indian Struggle*, P. 174]

সুভাষচন্দ্র ভাল করেই জানতেন, কংগ্রেসে তাঁদের সংগ্রামী কর্মসূচী ভোটে পরাজিত হবে কিন্তু তা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর রাজনীতিক বিশ্বাস ও মতামত কংগ্রেস-মঞ্চে ঘোষণা করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, লাহোর কংগ্রেসে ওয়ার্কিং কমিটি মনোনয়নের সময় গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারেই সুভাষচন্দ্র ও শ্রীনিবাস

আয়েঙ্গারের নাম বাদ পড়ে। সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বামপন্থীরা ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে গান্ধীজীর মনোনয়নের পরিবর্তে নির্বাচনের দাবি করেছিলেন, কিন্তু তাও গৃহীত হয় নি। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই সুভাষচন্দ্র গান্ধীজী তথা কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে তাঁর রাজনীতিক বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম শুরু করেন।

লাহোর কংগ্রেসের অল্পকাল পরেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র তাতে কি ভূমিকা গ্রহণ করেন পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তার বিস্তারিত আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্র পত্র-বিনিময়ের সূচনা

সুভাষচন্দ্র রাজনীতিক খ্যাতিতে আসার পূর্বে কবির সঙ্গে তাঁর কোন পত্রালাপ শুরু হয়েছিল কিনা জানা যায় না। যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয়, ১৯৩০-৩১ সাল থেকেই উভয়ের মধ্যে চিঠিপত্র ও তার-বিনিময় শুরু হয়।

১৯৩০ সালে ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের ৯ মাস কারাদণ্ড হয় (১৯২৯ সালে আগস্ট মাসে 'নিঃ ভাঃ লাঞ্ছিত রাজনৈতিক বন্দী দিবসের' শোভাযাত্রা সম্পর্কে রাজদ্রোহের অভিযোগে)। এর প্রায় মাস দেড়েক পর কবি ইউরোপ যাত্রা করেন (৪ঠা মার্চ)। ঐ বছরই আগস্ট মাসে সুভাষচন্দ্র কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। সুভাষচন্দ্র তখনও কারাগারে। ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ তখনও রাশিয়ায়। রাশিয়া ভ্রমণের পর কবি আমেরিকায় যান (৯ই অক্টোবর)। এই আমেরিকা ভ্রমণকালে কবি নিউ হ্যাভেন-এ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন (১৯শে অক্টোবর)। রয়টারের মাধ্যমে তারে-বেতারে এ খবর সর্বত্র প্রচারিত হল। সুভাষচন্দ্র তখন কলকাতায়। কবির গুরুতর অসুস্থতার সংবাদে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে আমেরিকায় কবিকে তার করলেন (২২ অক্টোবর : কলকাতা),

"City of Calcutta anxious about your illnes. On behalf of the citizens, I wish speedy recovery and a safe return home. Wire health."

কয়েকদিন পর কবি একটু সুস্থ হয়ে উঠলে পর সুভাষচন্দ্রকে জবাবী তার করলেন (৩রা নভেম্বর),

'ধন্যবাদ, পূর্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল আছি। ইতি রবীন্দ্রনাথ'।

আমেরিকা সফর শেষে কবি ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ পুনরায়

বিলেতে যান। কিছুদিন পর—৯ই জানুয়ারী (১৯৩১) তিনি 'নার্কাণ্ডা' জাহাজে দেশের পথে যাত্রা করেন। ২৬শে জানুয়ারী গভর্ণমেণ্ট গান্ধীজী, জওহরলাল প্রমুখ নেতাদের মুক্তি দেন। ঐদিনই কলকাতা পুলিস কমিশনারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র কলকাতায় মনুমেন্টের নীচে এক বিরাট জনসমাবেশে নেতৃত্ব করেন। পুলিশের প্রচণ্ড লাঠি ও বেটনের আঘাতে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা আহত অবস্থায়ই গ্রেপ্তার হলেন। বিচারে সুভাষচন্দ্রের ৬মাস জেল হয়। রবীন্দ্রনাথ তখনও সমুদ্রবক্ষে জাহাজে। ৩০শে জানুয়ারী তাঁর জাহাজ বোম্বাই বন্দরে ভিড়ে। বোম্বাইয়ে কবি সব শুনে সাংবাদিকদের সামনে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। বোম্বাই থেকে কবি সোজা শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। শ্রীনিকেতনে তখন সম্বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে খুবই তোড়জোড় চলছে। ৬ই ফেব্রুয়ারী কবি এই উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে দেশের কর্মীদের উদ্দেশে দুটি ভাষণ দেন। দেশে ফেরার পর কবি শান্তিনিকেতনে—'নবীন'-এর গান রচনা ও সঙ্গীতাভিনয়ের মহড়ায় ব্যস্ত ছিলেন।

এই সময়ই গান্ধী-আরউইন আপোষ-আলোচনা শুরু হয় (১৭ই মার্চ)। দীর্ঘ দিন এই আপোষ-আলোচনা চলল। অবশেষে ৫ই মার্চ মধ্যাহ্নে 'বড়লাট-ভবনে' ঐতিহাসিক 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' (বা দিল্লী চুক্তি) স্বাক্ষরিত হয়।

বলা বাহুল্য, 'দিল্লী চুক্তি' স্বাক্ষরিত হলে দেশের বিভিন্ন বামপন্থী গোষ্ঠী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হন। চুক্তির ২নং ধারার সঙ্গে লাহোর কংগ্রেসের পূর্ণ-স্বাধীনতার সিদ্ধান্তের কোনই সংগতি নেই। তাঁরা ভাবছিলেন, এরই জন্য কি দেশ এত দুঃখ, এত অত্যাচার-লাঞ্ছনা ভোগ করল? সুভাষচন্দ্র তখনও কারাগারে। মতিলাল নেহরু গত হয়েছেন। সুতরাং আপোষ-চুক্তিতে স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য থেকে সরে না আসার জন্য গান্ধীজীর উপর যিনি চাপ দিতে পারতেন্ তিনি জওহরলাল। কিন্তু তিনিও পর্যন্ত গান্ধীজীর বিরোধিতা বা অপ্রীতিভাজন হবার ঝুঁকি না নিয়ে চুক্তি অনুমোদন করলেন।

'দিল্লী-চুক্তি'র বিরুদ্ধে বিপ্লবী এবং বামপন্থীদের অন্যতম প্রধান অভিযোগ এই যে, এর ফলে শুধু সত্যাগ্রহী বন্দীরাই মুক্তি পেলেন। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অজস্র সাজাপ্রাপ্ত, অন্তরীণাবদ্ধ এবং বিচারাধীন বন্দী আছেন। তাছাড়া ভগৎ সিং-দের ফাঁসির দণ্ডাদেশ মকুব এবং মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারেও কোন প্রতিশ্রুতি সরকার পক্ষ থেকে পাওয়া যায় নি।

'দিল্লী-চুক্তি'র কয়েকদিন পর সুভাষচন্দ্র মুক্তিলাভ করেন (৮ই মার্চ)। এর কয়েকদিন পরই সুভাষচন্দ্র বোম্বাইয়ে গিয়ে এইসব বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টকে চাপ দেবার জন্য গান্ধীজীকে অনুরোধ জানান (১৪ই মার্চ)। এর কয়েকদিন পরই সংবাদ প্রকাশিত হয়, গভর্ণমেণ্ট ভগৎ সিং-দের ফাঁসির দণ্ডাদেশ মকুব প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেছেন। এই সংবাদে সমস্ত দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই সময় সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীকে অনুরোধ জানান যে, ভগৎ সিং-দের ফাঁসি মকুবের প্রশ্নে, দিল্লী-চুক্তি বাতিল ঘোষণা করে গভর্ণমেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল। নেতারা বিভিন্ন প্রদেশ থেকে করাচী-কংগ্রেসে যোগদানের জন্য যাত্রা করলেন। অকস্মাৎ ২৪শে মার্চ প্রভাতী সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয় ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে পূর্বদিন রাত্রে লাহোর জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

এই সংবাদে সারা দেশ প্রচণ্ড ক্রোধ ও আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইল। ২৪শে মার্চ 'ভগৎ সিং' শোকদিবস প্রতিপালিত হয়। গান্ধীজী করাচী পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে নওজোয়ান ভারতসঙ্ঘের উদ্যোগে বিরাট এক জনতা তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ভগৎ সিং-দের ফাঁসির জন্য তাঁকে দায়ী করেন। নেতারা সকলেই আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন, 'দিল্লী-চুক্তি' অনুমোদনের প্রশ্নে কংগ্রেসে হয়ত ঝড় উঠবে।

কিন্তু করাচী-কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র সত্যসত্যই এক প্রাজ্ঞোচিত সংযম ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। 'দিল্লী-চুক্তি'র সমালোচনা করে তিনি বামপন্থীদের বক্তব্য পেশ করেন কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে কংগ্রেসের মূল প্রস্তাব গ্রহণে কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে

চাইলেন না। এই সম্পর্কে তিনি তাঁর *The Indian Struggle* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করে করাচী-কংগ্রেসে তাঁদের ভূমিকার ব্যাখ্যা করেছেন (দ্রঃ ২০৬ পৃঃ)।

রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায়। বসন্তোৎসবের পর কলকাতায় 'নবীন' গীতিনাটিকাটি মঞ্চস্থ করা এবং সেই সাথে তাকাগাকি এবং তাঁর শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সেখানে জুজুৎসুর ক্রীড়া-কসরৎ দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার ১৯২৯ সালে কবি কানাডা থেকে ফেরার পথে জাপানে গিয়ে জুজুৎসু ও জুডোর ক্রীড়া-কসরৎ দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। জাপান থেকে ফেরার সময় তকাগাকি সান্ নামে জাপানের এক প্রখ্যাত জুজুৎসু-বীরকে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের জুজুৎসু শিক্ষা দেবার জন্য আনবার ব্যবস্থা করে আসেন। এর কিছুকাল পরেই তাকাগাকি শান্তিনিকেতনে আসেন। তাকাগাকি শান্তিনিকেতনে আসার পর কবি বহু রকম চেষ্টা করেছিলেন, যাতে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছেলে-মেয়েরা এসে তাঁর কাছে থেকে জুজুৎসুর ক্রীড়া-কৌশল শিখে নেয়। কবি এর জন্য বহু অর্থব্যয় করেছিলেন। কিন্তু কবিকে এ ব্যাপারে শোচনীয় ভাবে নিরাশ হতে হয়। বহু বিজ্ঞাপন এবং বৃত্তি ঘোষণা করেও দেশের যুবকদের মধ্যে থেকে বড় একটা সাড়া পাওয়া গেল না অথচ কোচিন প্রভৃতি দূর দেশ থেকেও কয়েকজন শিক্ষার্থী শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। এদিকে তাকাগাকিকে নিয়ে কবি এক মহা সমস্যায় পড়লেন। দুই বছরের চুক্তির মেয়াদে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। জুজুৎসু শিক্ষার এবং তাঁর ভাতা-মাইনে ইত্যাদি বাবদ যে অর্থব্যয় হচ্ছিল, বিশ্বভারতীর সেই আর্থিক সংকটমুহূর্তে তা আর বেশীদিন যোগান সম্ভবপর ছিল না। তাই কবি কলকাতায় এই জুজুৎসু ক্রীড়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন এই আশায় যে, রাজনীতিপ্রিয় কলকাতাবাসী ও পৌরপিতাগণ হয়ত এতে আকৃষ্ট হবেন। কিন্তু প্রদর্শনীর দিন তাঁর যে শোচনীয় অভিজ্ঞতা জন্মে তাতে তিনি তাকাগাকিকে দেশে রাখার ব্যাপারে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এই সময় সুভাষচন্দ্রের কথা তাঁর মনে হয়। সুভাষচন্দ্রের মেয়র-এর কার্যকাল শেষ হয়ে এসেছিল। কবির মনে হয়, সুভাষচন্দ্র এর গুরুত্ব ও মূল্য বুঝবেন এবং তাকাগাকিকে কলকাতা কর্পোরেশনের অধীনে নিযুক্ত করে কলকাতার ছেলেমেয়েদের জুজুৎসু শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখন খুবই ব্যস্ত ছিলেন। করাচী-কংগ্রেস থেকে তিনি তখনও ফিরতে পারেন নি বলে তাঁর সঙ্গে কবির দেখা হয়ে উঠল না। কয়েকদিন অপেক্ষা করে কবি চৈত্রের শেষভাগে শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন।

কিন্তু তাকাগাকির মত গুণী মানুষকে ধরে রাখা বা জুজুৎসু শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে কিছু করা গেল না, এ চিন্তা তাঁর মনে ক্ষণে ক্ষণে কাঁটার মত বিঁধছিল। কয়েকদিন পর তাকাগাকিকে কলকাতায় রাখার ব্যাপারে অনুরোধ জানিয়ে কবি সুভাষচন্দ্রকে এক পত্র লিখলেন। সেটি ছিল এই :

কল্যাণীয়েষু,

তোমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছিলুম, তুমি তখন দূরে গিয়েছিলে। তুমি জানো বহু অর্থব্যয় করে জাপানের একজন সুবিখ্যাত জুজুৎসুবিৎকে আনিয়েছিলুম। দেশে বারে বারে যে দুঃসহ উপদ্রব চলছিল তাই স্মরণ করে আমি এই দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম। মনে আশা ছিল দেশের লোক সকৃতজ্ঞচিত্তে আমার দায়িত্ব লাঘব করে এই দুর্লভ সুযোগ গ্রহণ করবে। দুই বৎসরের মেয়াদ আগামী অক্টোবরে পূর্ণ হবে। কোচিন প্রভৃতি দূর দেশ থেকে শিক্ষার্থী এসেছে কিন্তু বাংলা থেকে কাউকে পাই নি। যে ব্যয়ের বোঝা আমার পক্ষে অত্যন্ত গুরুভার তাও সম্পূর্ণ হয়ে এল অথচ আমার উদ্দেশ্য অসমাপ্ত হয়েই রইল। জাপান থেকে এরকম গুণীকে পাওয়া সহজ হবে না। য়ুরোপে আমেরিকায় জুজুৎসু শিক্ষার অধ্যবসায় কি রকম চলচে তা তুমি নিশ্চয় জানো। আমাদের নিঃসহায় দেশে এর প্রয়োজন যে কত গুরুতর তাও

নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। এখন এই লোকটিকে তোমাদের পৌর শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত করবার কোন সম্ভাবনা হতে পারে কিনা আমাকে জানিয়ো। যদি সম্ভব না হয় তাহলে এ'কে জাপানে ফিরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবো।

আমার নববর্ষের আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

ইতি ৩।৪ বৈশাখ ১৩৩৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

(স্বাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখন নানা কাজে খুবই ব্যস্ত। বিশেষতঃ বাংলা কংগ্রেসের গৃহবিবাদ তখন খুবই তীব্র আকার ধারণ করেছে। উল্লেখযোগ্য, এর প্রায় ৩।৪ বৎসর আগে থেকেই বাংলা কংগ্রেসের বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে মতভেদ চলে আসছিল। ফলে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক দলের নেতা সুভাষচন্দ্র, অপর দলের নেতা জে. এম. সেনগুপ্ত। এই দুই গোষ্ঠী প্রধানতঃ A. I. C. C. ও B. P. C. C.-তে এবং কর্পোরেশনে নেতৃত্ব ও প্রাধান্য লাভের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে এক ভয়াবহ আত্মকলহে লিপ্ত হন। করাচী কংগ্রেসের পর সুভাষচন্দ্র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে তাঁর গোষ্ঠীর মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা করছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হন (সাময়িক ভাবে)। করাচী ও সিন্ধু সফর তাড়াতাড়ি শেষ করে তিনি কলকাতায় ফিরেই কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসনের এক সভাতে কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম প্রস্তাব করেন (১২ই এপ্রিল, ১৯৩১)। প্রস্তাবটি সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হলে সুভাষচন্দ্র এক প্রেস-বিবৃতিতে বলেন,

"বাংলার গৃহবিবাদ অবসান করিব এই দৃঢ় সংকল্প লইয়া আমি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। গৃহবিবাদের জন্য বাংলার মর্যাদা যথেষ্ট হানি হইয়াছে এবং অবিলম্বে ইহার অবসান আবশ্যক।

……গত বৎসর আমাকে বাধ্য হইয়া মেয়রের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বঙ্গীয় প্রাঃ কংগ্রেস কমিটির অভিমত এই যে, মেয়র পদ কাহারও একচেটিয়া রাখা কর্তব্য নহে, এজন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে মেয়র পদের জন্য মনোনীত করা হয়। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যালিটিতে স্থির হয় যে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে মেয়র করা হইবে, পুনর্নির্বাচন প্রয়োজন হইলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়-কে মেয়র করা হইবে। বি. পি. সি. সি. এই সিদ্ধান্ত মঞ্জুর করেন কিন্তু কতিপয় কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পার্টির সদস্য এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে মেয়র করিবার জন্য যত্নবান হন। শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য আমাকে সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে দাঁড় করান হয়। এক্ষণে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে এবং আমার আর মেয়র থাকিবার আবশ্যকতা নাই। এজন্য দলের সভায় আগামী বৎসরের মেয়র পদের জন্য আমি সানন্দে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম প্রস্তাব করিয়াছি, তিনি ঐ পদে সর্বাংশে যোগ্য ব্যক্তি। এক্ষণে আমি সর্বান্তঃকরণে কংগ্রেসের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিব। এই সিদ্ধান্তে আশা করি সকল গোলযোগের অবসান হইবে। প্রকৃত কর্মীদের মধ্যে ত্যাগ, সেবা ও দুঃখবরণ ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিতে পারে না।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা—৩০শে চৈত্র ১৩৩৭।। ১৩ই এপ্রিল, ১৯৩১]

১৫ই এপ্রিল কলকাতা কর্পোরেশনের সভায় সুভাষচন্দ্র মেয়র পদের জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম প্রস্তাব করলে পর তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আব্দুল রেজ্জাক হলেন ডেপুটি মেয়র।

এদিকে শান্তিনিকেতনে কবি সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে জবাবের আশায় অধীর হয়ে উঠেছিলেন। সম্ভবতঃ কবির পত্রটি যথাসময়ে সুভাষচন্দ্রের হস্তগত হয় নি। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় কবি কিছুটা আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন, হয়ত তাকাগাকিকে কর্পোরেশনে রাখার ব্যাপারে কিছু একটা বিহিত করে

দিতে পারবেন। এই আশায় কবি কয়েকদিন পর ডাঃ রায়কে একটি চিঠি দেন (২৫শে এপ্রিল, ১৯৩১)। চিঠিটি ছিল এই :

To

Dr. B. C. Roy, M. D., F. R. C. S.
Mayor of Calcutta Corporation
Calcutta.

April 25, 1931.

Dear Dr. Roy,

Please accept my sincere congratulations on your election as the Mayor of Calcutta Corporation.

I wrote sometime ago to Srijukta Subhas Chandra Bose about our Jiu-Jitsu professor, Mr. Takagaki but apparently he has not been able to reply to it as he is touring about in East Bengal. May I now put before you the case of Prof. takagaki whom as you may know, I brought from Japan specially for the purpose of giving a thorough training in the art of Jiu-Jitsu to the students of Bengal. Prof. Takagaki comes of a highly distinguished family in Japan and is one of the most well-known experts in Jiu-Jitsu in that country. When I found that our countrymen did not properly realize the importance of the visit of Prof. Takagaki to our country, I had to take up myself the entire financial responsibility of his travel and stay in this country. I engaged his services for two years and boys and girls of our institution have received instruction from him with remarkable results. Our students gave a demonstration

of Jiu-Jitsu in Calcutta at which several members of the Corporation were present, and I was told that they all appreciated it very much.

*   *   *

It will be a great pity if Prof. Takagaki has to be sent back to Japan without the student community in Calcutta ever getting the opportunity of mastering from him the art of self-defence and physical training which I need hardly out is specially required by our boys and girls. Prof. Takagaki has to make definite arrangements from now for his future programme and therefore I am writing to you requesting the Corporation to take advantage of his presence in our country and to engage him for giving instructions to the students in Calcutta. Prof. Takagaki is willing to remain in Calcutta for the purpose if suitable arrangements are made for him.

I do hope that my appeal will find response in the Calcutta Corporation and that both yourself and Srijukta Subhas Chandra Bose will consider the proposal favourably and retain the services of Prof. Takagaki for a cause which concerns the well-being of the students of Bengal,

With kind regards,

Yours sincerely

Sd/- Rabindranath Tagore

জবাবে ডাঃ রায় কবিকে কি লিখেছিলেন তা জানা যায় না। সুভাষচন্দ্র তখনও পূর্ববঙ্গ সফর করছিলেন। সুভাষপন্থী ও সেনগুপ্তপন্থীদের বিরোধ তখন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই বিরোধের ফলে বছর দুই

আগে ছাত্র প্রতিষ্ঠানও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য, এই সময় সুভাষপন্থী ছাত্রসমিতি (B. P. S. A) পূর্ণ দাসের নেতৃত্বে নেত্রকোণায় এক ছাত্র-সম্মেলন ডেকেছিলেন, আর সেনগুপ্তপন্থীরা (A. B. S A) ডেকেছিলেন মৈমনসিংহ শহরে। ২৪শে এপ্রিল এই সম্মেলন উপলক্ষে সেনগুপ্ত মৈমনসিংহ শহরে গেলে একদল ছাত্র প্রবল বিক্ষোভ জানালেন। গোলমালে শেষ পর্যন্ত সম্মেলন পণ্ড হল। আর তাই নিয়ে কাগজপত্রে সেনগুপ্ত ও সুভাষপন্থীদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হল। মোট কথা, এইসব গোলমালে সুভাষচন্দ্র তাকাগাকিকে কলকাতা কর্পোরেশনে রাখার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নি বলেই মনে হয়। যা-ই হোক শেষ পর্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়েই কবিকে তাকাগাকিকে বিদায় দিতে হল।

বন্যাত্রাণ : সুভাষচন্দ্র-আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

লর্ড আরউইনের কার্যকাল শেষ (১৮ই এপ্রিল, ১৯৩১) হয়ে যাবার পর তাঁর জায়গায় লর্ড উইলিংডন বড়লাট হয়ে এলেন। উইলিংডন একজন পাকা ঝানু ব্যুরোক্রাট্। তাঁর আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী দমননীতি অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। সরকারী আমলাতন্ত্র ও পুলিশের কর্মকর্তারা 'দিল্লীচুক্তি' ভঙ্গ করে দেশের প্রগতিশীল সংগ্রামী জনগণের উপর নানা দিক থেকে পীড়ন ও আক্রমণ চালালেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতারা খুবই বিব্রত বোধ করলেন। বড়লাটকে তাঁরা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, এই অবস্থা ও মনোভাবের পরিবর্তন না-হলে কংগ্রেসের পক্ষে 'গোল-টেবিল বৈঠকে' যোগদান করা সম্ভব হবে না। ঠিক এই সময়ই জে. এম. সেনগুপ্ত-সুভাষচন্দ্রের বিরোধ চরমে পৌঁছায়। গান্ধীজী প্রমুখ নেতারা এতে আরও বিপর্যস্ত বোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর মধ্যস্থতায় সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র সালিশে বা আপোষ-মীমাংসায় বসতে রাজী হলেন (৯ই জুন, ১৯৩১)। ওয়ার্কিং কমিটি এই কাজের দায়িত্ব দিয়ে এম. এস. আণেকে বাংলাদেশে পাঠালেন (১৬ই জুন)।

এর কিছুদিন পর বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীজীর আলোচনায় মোটামুটি একটি সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে যাবার পর গান্ধীজী গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বিলেত যাত্রা করেন (২৯শে আগস্ট, ১৯৩১)। সঙ্গে গেলেন মহাদেব দেশাই, পিয়ারেলাল, দেবদাস গান্ধী, সরোজিনী নাইডু ও মীরা বেন্।

এদিকে বাংলাদেশের অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। পুলিশের নির্যাতন ও দলন-নীতির প্রতিক্রিয়ায় বিপ্লবীদের পাল্টা আক্রমণও স্বভাবতঃই বাড়তে থাকে। অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর কয়েকটি রাজনীতিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

মিঃ পেডি বিপ্লবীদের গুলীতে প্রাণ হারান। ৭ই জুলাই দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয় আর তার কয়েকদিন পরই আলিপুরের জেলা ও সেসন জজ মিঃ গারলিক বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন (২৭শে জুলাই)। এর পরই সারা বাংলা দেশের বুকে পুলিশের বীভৎস তাণ্ডবলীলা শুরু হয়। তার উপর আবার ঠিক এই সময়ই (২৮-৩১ শে জুলাই) উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে এক ভয়াবহ বন্যাপ্লাবনে দেশের লোকের দুঃখ ও দুরাবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে উঠল। বহু লোক প্রাণ হারাল—কত যে ঘর-বাড়ি, ধনসম্পদ, শস্যক্ষেত ও গবাদি পশু নিহত হল তার আর ইয়ত্তা নেই।

এই অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস কমিটি খুবই তৎপরতার সঙ্গে অগ্রণী হয়ে (২রা আগস্ট) একটি রিলিফ্ কমিটি গঠন করে। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্যর নীলরতন, সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ বাংলা দেশের নেতৃস্থানীয়দের নামে সংবাদপত্রে আবেদন জানান হল, কংগ্রেস রিলিফ কমিটির তহবিলে সাহায্যদানের জন্য। ১০ই আগস্ট কলকাতার এলবার্ট হলে এই কমিটির পক্ষ থেকে এক বিরাট জনসভায় সুভাষচন্দ্র ও রামানন্দ প্রমুখ নেতারা ঐ মর্মে আবেদন জানালেন দেশবাসীর উদ্দেশে। স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই রিলিফ কমিটি নিয়ে এর কয়েকদিন পর সুভাষচন্দ্র ও আচার্য রায়ের মধ্যে খুবই মনোমালিন্য ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথও পরোক্ষে এই গোলমালে কিছুটা জড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

পূর্বেই বলেছি ৪ঠা আগস্ট থেকে প্রত্যহই সংবাদপত্রে বি. পি. সি. ফ্লাড্ রিলিফ কমিটির পক্ষে ক্যাপ্টেন এন. এন. দত্ত ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ নেতাদের নামে সাহায্য দানের জন্য দেশবাসীর উদ্দেশে আবেদন প্রকাশিত হচ্ছিল। ক্যাপ্টেন এন. এন. দত্ত অবশ্য আগেই এর সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৮ই আগস্ট কমিটির এক মিটিঙে সভাপতি হিসাবে আচার্য রায়ের নাম গৃহীত হয়। ১০ই আগস্টের এলবার্ট হলের সভায় আচার্য রায় স্বয়ং সভাপতিত্ব করেছিলেন। এবং আবেদন পত্রাদিতে সভাপতি হিসেবে তাঁর নাম ঘোষিত হয়ে আসছিল। এর মধ্যে কাণাঘুষা চলতে থাকে সেনগুপ্ত ও সতীশ দাশগুপ্ত প্রমুখ খাদিপন্থীরা স্বতন্ত্রভাবে আর একটি বন্যা রিলিফ

কমিটি গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন এবং স্বয়ং আচার্য রায় তাতে সভাপতিত্ব করতে সম্মত হয়েছেন। এই খবর পেয়ে ক্যাপ্টেন দত্ত ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই আচার্য রায়কে ঐ কার্য থেকে বিরত থেকে বি. পি. সি'র পক্ষে একটি মাত্র রিলিফ কমিটি গঠন করতে অনুরোধ জানালেন (১৭ই আগস্ট)। জে. এম. সেনগুপ্ত তখন বোম্বাইয়ে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যোগদান করতে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই আচার্য রায়ের সভাপতিত্বে সতীশ দাশগুপ্ত প্রমুখ খাদিপন্থীদের উদ্যোগে 'বঙ্গীয় সংকটত্রাণ সমিতি' নামে একটি কমিটির পক্ষে সাহায্যদানের আবেদন প্রচারিত হয় এবং আচার্য রায় চিঠিতে সেকথা পরিষ্কার লিখে ক্যাপ্টেন দত্তকে জানিয়েছিলেন। ১৮ই আগস্ট সেনগুপ্ত বোম্বাই থেকে ফিরেই এই কমিটির পক্ষ সমর্থনে এক বিবৃতিতে ঘোষণা করলেন—

"দেখিয়া সুখী হইলাম যে, আচার্য রায় ইতিমধ্যেই 'বঙ্গীয় সংকটত্রাণ সমিতি' নামে একটি সাহায্যসমিতি গঠন করিয়াছেন। আমাকেও এই সমিতির একজন সদস্য করা হইয়াছে। এখন আচার্য রায়ের পরিচালনাধীনে আমাদের সকলের শক্তি নিবদ্ধ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সংগঠনকার্যে সুদক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সম্পাদকরূপে আচার্য রায়কে সাহায্য করিবেন। আজ বাংলার দুর্দশা অতি ভীষণ, কালক্ষেপ করার অবসর নাই। আমি সাধারণভাবে জনসাধারণকে বিশেষ করিয়া কংগ্রেসসেবীদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, আচার্য রায় যে সাহায্যভাণ্ডারের পরিচালক ও কোষাধ্যক্ষ সেই সাহায্যভাণ্ডারে তাঁহারা যথাসাধ্য দান করুন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা—২রা ভাদ্র ১৩৩৮ ।। ১৯শে আগস্ট ১৯৩১]

পরদিন এই বিবৃতি পাঠ করে সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত বিষণ্ণ ও মর্মাহত হয়ে পড়লেন। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলা দেশে আচার্য রায় গান্ধীবাদী বা খাদিপন্থীদের প্রধানতম পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বয়কট ও চরকা আন্দোলনে তিনি বাংলাদেশের অন্যতম অগ্রণী নেতা হয়েছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের বিশেষতঃ চরকা ও খাদি আন্দোলনের বিরোধিতা

করেছিলেন বলে তিনি আচার্য রায় কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছিলেন। কবি অবশ্য তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন (দ্রঃ 'চরকা'—কালান্তর।। পৃঃ ২৫৭-৭৪)। ওসব কথা আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি।* তবু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ করা দরকার। ১৯২২ সালে অক্টোবর মাসে উত্তর বঙ্গের বন্যাপ্লাবন উপলক্ষে **Bengal Relief Committee**'র তহবিলে যে বিপুল অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল রিলিফ কার্যের পরও তার বেশ একটা পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থেকে যায়। আচার্য রায় ও সতীশ দাশগুপ্ত প্রমুখ খাদিপন্থীরা এই টাকা চরকা ও খাদি প্রসার আন্দোলনে নিয়োগ করেন। সুভাষচন্দ্র এই কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। এটাকে তিনি মোটেই ভালো চোখে দেখেন নি, অবশ্য প্রকাশ্যেও তিনি খাদিপন্থীদের এই কার্যের তেমন কোন প্রতিবাদ বা সমালোচনা করেন নি। এর পর কাউন্সিল প্রবেশ নিয়ে যখন গান্ধীপন্থী ও স্বরাজ্যদলের মধ্যে তীব্র বিরোধ বাধে তখনও খাদিপন্থীদের সঙ্গে আচার্য রায়ের ঘনিষ্ঠতাটি তিনি মোটেই ভালো চোখে দেখেন নি। এমন কি এবারকার বন্যাপ্লাবনের কয়েকদিন আগেও "বাংলার খাদি কি ধ্বংস হবে? চরকা দাও চরকা দাও" এই শিরোনামায় আচার্য রায় ও সতীশ দাশগুপ্তের এক যুগ্ম নিবেদন প্রকাশিত হয় (দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা—৮ই জুলাই ১৯৩১)। ঐদিনই দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির খবর প্রকাশিত হয়। সুভাষচন্দ্রের বয়স তখন অল্প। স্বভাবতঃই আচার্য রায়ের এই সুর তাঁর মোটেই ভালো লাগে নি। সেই সময় সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে নিঃ ভাঃ ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশন হচ্ছিল। সভাপতির অভিভাষণে তিনি দেশের শ্রমিক ও কৃষকের দুর্বার গণ-আন্দোলনের আহ্বান জানালেন। যাহোক মোটেই ওপর এই সব নানা কারণেই আচার্য রায়ের সম্পর্কে তাঁর মনে কোথায় যেন একটা 'কিন্তু' রয়ে গিয়েছিল। ১৯শে আগস্ট সেনগুপ্তের ঐ বিবৃতি এবং ক্যাপ্টেন এন. এন. দত্তকে লেখা আচার্য রায়ের চিঠিটি পড়ে সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ঐদিনই বেশ একটু কড়া ভাষায় আচার্য রায়ের উদ্দেশে এক খোলা চিঠি লিখলেন (১৯শে আগস্ট)। ২২শে আগস্ট এটি 'লিবার্টি' (Liberty) পত্রে প্রকাশিত

* [দ্রঃ "ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ"—দ্বিতীয় খণ্ড]

হয়। বলা বাহুল্য, চিঠিতে সুভাষচন্দ্র মৃদু ক্ষোভ প্রকাশ করতে ছাড়েন নি। চিঠিটির মর্মার্থ ছিল এই :

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সমীপেষু,
প্রেসিডেন্ট, **Bengal Provincial Congress Flood And Famine Relief Committee**

প্রিয় মহাশয়,

ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট আপনার লেখা চিঠিটি আমি দেখেছি—যেটা আমাদের সকলকেই খুবই আঘাত দিয়েছে। কোন্ কমিটির সভাপতি পদ গ্রহণ করা আপনার ঠিক হবে তা নির্ধারণ করার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই একান্তই আপনার। কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য আপনার ও জনসাধারণের অবগতির জন্য নিবেদন করছি :

(১) রিলিফ কমিটি ১৯৩১ সালের ২রা আগস্ট গঠিত হয় (বি. পি. সি. সি. কার্যকরী সমিতির আলোচনার প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য) এবং ৪ঠা আগস্ট তারিখেই সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হয়। আপনি খুবই অনুগ্রহ করে এতে সহযোগিতা করতে সম্মতি দিয়েছিলেন।

(২) ১৯৩১ সালে ৮ই আগষ্ট তারিখে উক্ত রিলিফ কমিটির মিটিঙ হয় এবং তাতে আপনাকে সভাপতি নির্বাচন করা হয় (রিলিফ কমিটির সভার আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

(৩) ১০ই আগষ্ট (১৯৩১) **Bengal Congress Flood And Famine Relief Committee**'র প্রথম জনসভা হয় এবং সেই সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য আপনার নাম প্রস্তাব করতে গিয়ে আমি ঘোষণা করেছিলাম যে, আপনার সভাপতিত্বে আমরা রিলিফ কমিটি গঠন করেছি।

(৪) এর একেবারে শুরু থেকেই **B. P. C. Flood And Famine Relief Committee**র সভাপতি হিসেবে আপনার নামই সারা ভারতবর্ষে সংবাদপত্রে পাঠান হয়েছিল।

(৫) আমি জানতে পারলাম ক্যাপ্টেন দত্ত সেনগুপ্তের অনুপস্থিতিতে (সেই সময় তিনি বোম্বাইয়ে থাকায়) সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করে রিলিফ কমিটির সঙ্গে তাঁর দল সহযোগিতা করতে পারবেন কিনা জানতে চেয়েছিলেন। আরও জানতে পারলাম যে তখন ক্যাপ্টেন দত্তকে বলা হয়েছিল যে, সেনগুপ্ত বোম্বাই থেকে ফিরলে পর এর জবাব পাবেন।

(৬) কিন্তু সেনগুপ্ত বোম্বাই থেকে ফিরে আসার পরও কোন জবাব পাওয়া গেল না। পরন্তু কমিটিতে আপনার সাথীদের এ ব্যাপারে কোন আলোচনা করার অপেক্ষা না-রেখেই আপনি আমাদের কমিটির সভাপতিপদ ত্যাগের ইচ্ছা ব্যক্ত করে ক্যাপ্টেন দত্তকে চিঠি দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন।

(৭) যেহেতু আমরা শুরু থেকেই সমস্ত দল ও গোষ্ঠীর সহযোগিতালাভের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে আসছিলাম সেই কারণেই গত সোমবার, ১৭ই আগস্ট আমি আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলাম যাতে কোনরকমেই দুটি কমিটি গঠিত না হয়। সেই সময় আমি আপনাকে আরও বলেছিলাম যে, এই রিলিফের ব্যাপারে সেনগুপ্তর দলের সহোযোগিতা লাভের জন্য আমরা খুবই ব্যগ্র আর এই ব্যাপারে আমাদের সেক্রেটারী ক্যাপ্টেন দত্ত আগেই অগ্রণী হয়ে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই সময় আপনি একটি আপোস-মীমাংসার চেষ্টার কথা বলায় আমি আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম যাতে করে সেই মুহূর্তে সংবাদপত্রে এ-সব ব্যাপারে কোন বিতর্ক শুরু না-হয়।

(৮) সংবাদপত্রে বিতর্ক শুরু করার ব্যাপারে আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বস্তুতঃ পরদিনই—অর্থাৎ ১৮ই আগস্ট আপনার পত্রটি প্রকাশিত হয়।

(৯) আমি আপনাকে আরও বলেছিলাম যে, B. P. C. Flood and Famine Relief Committee-র তহবিলের উদ্দেশ্যে অর্থসাহায্য সরাসরি আপনার নামে আসছে এবং শেষ পর্যন্ত যদি আপনি ঠিকই করে ফেলেন যে আপনি আমাদের কমিটির সভাপতিপদ ত্যাগ করবেন তা হলে উক্ত অর্থ যেন আপনি আমাদের কমিটির হাতে সমর্পণ করেন। আমি জানি না আপনি এ ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে কি স্থির করেছেন তবে আমি জানতে পারলাম যে আপনি ঐ অর্থ "সঙ্কট ত্রাণ কমিটি"র হাতে সমর্পণ করেছেন—অথবা সেই রকম ইচ্ছা করেছেন। 'B. P. C. Flood and Famine

Relife Committee'র প্রায় ১৫০০্ টাকা আপনার হাতে যাওয়ার পর 'সংকট ত্রাণ কমিটি' গঠিত হয়।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সশ্রদ্ধচিত্ত এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইতিপূর্বেই ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাকে আমাদের কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে পাবার জন্য ব্যগ্রতার কথা বলেছিলাম এবং এতে যে আমাদের অগ্রাধিকার আছে সেকথাও বলেছি। আপনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা জানিয়ে ক্যাপ্টেন দত্তকে চিঠি দিয়েছিলেন তা দিয়ে যাতে আপনার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত দলীয় মনোবৃত্তির অভিযোগ না-আসে আমি আশা করি সে-বিষয়ে আপনি অনুগ্রহ করে বিবেচনা করে দেখবেন। বন্যা রিলিফের মত ব্যাপারে জনসাধারণের চোখে আপনি চূড়ান্ত দলীয় মনোবৃত্তির পরিচায়ক হিসেবে প্রতিভাত হবেন কিনা— এটা সম্পূর্ণ আপনার একান্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার। অনুগ্রহ করে এ চিঠি প্রেসে দেবার জন্য আপনার অনুমতি পেতে পারি কি?—যেহেতু আমাদের সেক্রেটারীকে লেখা আপনার চিঠি ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। ইতি—

১৯।৮।৩১

আপনার বিশ্বস্ত

সুভাষচন্দ্র বসু

এই চিঠি প্রকাশিত হলে আচার্য রায় তাতে অত্যন্ত বেদনা ও আঘাত পান। জবাবে তিনি তাঁর মনোবেদনা ব্যক্ত করে সংবাদপত্রে সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশে এক দীর্ঘ খোলা-চিঠি প্রকাশ করেন (২১শে আগস্ট, ১৯৩১)। এর অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল।

সায়েন্স কলেজ

২১শে আগস্ট ১৯৩১

প্রিয় সুভাষ,

আমি তোমার ১৯শে তারিখের চিঠি পাইয়াছি। আমি বি. পি. সি. রিলিফ কমিটির প্রেসিডেন্ট কেন হইতে পারি নাই তাহার হেতু পূর্বেই জানাইয়াছি। তুমি বলিয়াছ যে ৮ই আগস্ট তোমাদের কমিটি আমাকে

প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন, কিন্তু ৮ই হইতে ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাকে সে সংবাদ দেওয়া হয় নাই। এবং ঐ সময়ে যে সকল বিজ্ঞপ্তি ও আবেদন ঐ কমিটি হইতে বাহির করা হইয়াছে তাহাতে আমার নাম প্রেসিডেন্ট বলিয়া উল্লেখ নাই, কিন্তু ডাঃ নরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম সেক্রেটারী বলিয়া উল্লিখিত আছে। আমি ১৪ই তারিখে 'সঙ্কট সমিতি'র সভাপতিত্ব গ্রহণ করি।

তুমি লিবার্টিতে একখানা চিঠি কাল বাহির করিয়াছ, সে সম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বলিব। ঐ চিঠিটা আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা। কিন্তু উহা আমাকে পাঠান হয় নাই। ঐ চিঠিতে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি সম্বন্ধে কতকগুলি অভিযোগ আছে।...

"আমি প্রার্থনা করি সেদিন আসুক, যখন তুমি আমার সকল শুভ চেষ্টার সহিত যুক্ত হইয়া কার্য করিবে—কিন্তু আজিকার দিনে তোমার দিক হইতে আমি সে সম্ভাবনাও তো কোন প্রকারেই দেখিতেছি না।...

"আমি রিলিফের কাজ সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, ডাঃ নীরেন্দ্র দত্ত, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেন প্রভৃতির মত লোক লইয়া চালাই। কি কাজ আমার দ্বারা হইয়াছে বা হইতেছে তাহা বাংলা দেশ জানে।

"খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিও তোমার পত্রে আক্ষেপ আছে,...

"তুমি একদিকে আমাকে তোমাদের রিলিফের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছ, আবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯২২ সালের রিলিফের টাকা আমার দ্বারা অপব্যয়িত হইয়াছে, একথাও বলিতেছ। একই সাথে একবার গালি দেওয়া, আর একবার স্তুতি করায় মনে হয়, তুমি ধমক দিয়া কাজ আদায় করিতে চাও।

"আমি তোমাদের কমিটির সভাপতি না-হওয়ায় তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ—আমি একেবারে দলভুক্ত হওয়ার চরমে গিয়াছি বলিয়াছ। তুমি আমার উপর কলঙ্ক লেপন করিবার কাজে ব্রতী হইয়াছ, তুমি আমার সৃষ্ট একটি অত্যন্ত প্রিয় সংস্থার সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ। আমি খাদি প্রতিষ্ঠানের কথা বলিতেছি। তুমি যাহা খুশি করিয়া যাও, আমি তোমার সহিত বাদানুবাদে নামিব না। তোমার আরোপিত কলঙ্কের হাত হইতে আমার

আত্মরক্ষার আবশ্যক নাই। আর যদি কয়েক বৎসর বাঁচি তো আমি আশা করি, দেশবাসীরা আমাকে সহ্য করিবেন, আমাকে মাতৃভূমির সেবায় সুযোগ দিবেন। ঈশ্বর পরম কারুণিক। তোমার বয়স কাঁচা আছে। ঈশ্বর তোমাকে বুঝিয়া চলিবার মত সুবুদ্ধি দিন।

শুভার্থী

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

আচার্য রায়ের এই পত্র প্রকাশিত হলে সুভাষচন্দ্র তার জবাবে এক দীর্ঘ খোলা-চিঠি লিখলেন (২৩শে আগস্ট, ১৯৩১)। পরদিন এটি *Liberty* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই চিঠিতে তিনি ১৯২২ সালের বেঙ্গল রিলিফ কমিটির টাকা খাদি প্রসার আন্দোলনে নিয়োজিত করার অধিকার সম্পর্কে পরিষ্কার প্রশ্ন ও অভিযোগ উত্থাপন করেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। বন্যাপ্লাবনের খবরে খুবই তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে সাহায্য সংগ্রহের জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস ফ্লাড রিলিফ কমিটির পক্ষে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মশায় কবিকে এতে সাহায্য ও সহযোগিতা করবার আবেদন জানিয়ে তার করেছিলেন,

"Devastating flood East and North Bengal; suffering breaks all past records; immediate extensive help imperative; Please send your mite Subhas Bose or Bidhan Roy."

জবাবে কবি সঙ্গে সঙ্গে এক তারবার্তায় জানালেন (২০শে আগস্ট)

"Our institution raising flood relief funds which will be forwarded soon with my own contribution.—Togore."

[*Liberty*—August 22, 1931]

তাছাড়া কবি কংগ্রেস রিলিফ কমিটির আবেদন পত্রাদিতে তাঁর নাম রাখবার সম্মতি জানিয়ে দিলেন।

বলা বাহুল্য, আচার্য রায় কর্তৃক 'বঙ্গীয় সংকট ত্রাণ কমিটি' গঠনের পরই সুভাষপন্থীরা রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

এর কয়েকদিন পরেই আচার্য রায় ও সুভাষচন্দ্রের বাদানুবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। সুভাষচন্দ্র শেষে নিরুপায় হয়ে কবিকে কংগ্রেস রিলিফ কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণের জন্ত অনুরোধ জানালেন। কবি সংবাদপত্র যোগে সুভাষচন্দ্র-আচার্য্য রায়ের বাদানুবাদ সবই পড়েছিলেন। বন্যা সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে এমন একটি বিশ্রী আত্মকলহের সৃষ্টি হওয়ায় অন্যান্যদের মত কবিও মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় সুভাষচন্দ্রের ঐ অনুরোধ এসে পড়ায় তিনি খুবই বিব্রত বোধ করছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বন্যাপীড়িতদের কথা চিন্তা করেই বাংলা কংগ্রেসের এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। ৩রা সেপ্টেম্বর বি. পি. সি. ফ্লাড রিলিফ কমিটির সভাপতিত্ব করতে সম্মতি জানিয়ে তিনি সুভাষচন্দ্রের কাছে (কংগ্রেসের নামে) চিঠিটি লিখে পাঠালেন, (দ্রঃ *Liberty*—১০ই সেপ্টেম্বর '৩১):

Visva-Bharati
3rd September 1931

To

Bengal Provincial Congress Flood and Famine Relief Committee.

Dear Sirs,

With reference to your letter of date, if my being President of your Relief Committee would be of any help in your good work that would give me great pleasure. You may issue appeals for funds, at your discretion in my name as such President.

Yours truly
Sd/- Rabindranath Tagore

পূর্বেই বলেছি, বন্যাপীড়িতদের সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে কবি

ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতীর মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় তিনি 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি ঘষে-মেজে গীতিনাট্যের উপযোগী করে তার মহড়া শুরু করে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য,—কলকাতায় মঞ্চস্থ করে বন্যা পীড়িতদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করবেন।

উল্লেখযোগ্য, কবির সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এই সময় বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যকদের উদ্যোগে 'রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব' উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি চলছিল। এই উৎসব উপলক্ষে তাঁরা 'বিশ্বভারতী'র সাহায্যের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করে কবির হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে (ঔপন্যাসিক) এক পত্রে (২৯শে আগস্ট) জানালেন যে, এই তহবিল তিনি বন্যাপীড়িতদের সাহায্যেই পাঠিয়ে দেবেন। পত্রটি ছিল এই :

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

শরৎ, শুনেছি তোমরা আমার অর্ঘ্যরূপে কিছু টাকা সংগ্রহের সংকল্প করেচ। দেশে এখন দারুণ দুর্দিন, এ সময়ে কোনো ব্যাপারের জন্যে অর্থের দাবী করা বিহিত হবে না। যদি আমার হাতে কিছু দিতে চাও তবে সেটার লক্ষ্য হবে দুর্গতদের দুঃখ হরণ। আমিও স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করচি—কলকাতায় এই উদ্দেশ্যে একটা কিছু পালাগানের কথা চলচে—এই উপায়ে কিছু কুড়োনো যাবে আশা করি। তোমরা জয়ন্তী উপলক্ষে অল্প-স্বল্প যা কিছু করতে পারবে আমার হাতে দিলে এ পুণ্যকর্মে আমার সহায়তা করা হবে। নিজের শক্তিতে কিছু করতে পারি এই বন্যাতে সে-উপায় রাখি নি। ইতি—১২ই ভাদ্র ১৩৩৮

তোমাদের

(স্বাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এর কয়েকদিন পরেই সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে বি. পি. সি. ফ্লাড রিলিফ কমিটির সভাপতিত্ব করার অনুরোধ এলে কবি তাতে সম্মতি জানিয়ে

এর কয়েকদিন পরেই আচার্য রায় ও সুভাষচন্দ্রের বাদানুবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। সুভাষচন্দ্র শেষে নিরুপায় হয়ে কবিকে কংগ্রেস রিলিফ কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণের জন্ত অনুরোধ জানালেন। কবি সংবাদপত্র যোগে সুভাষচন্দ্র-আচার্য্য রায়ের বাদানুবাদ সবই পড়েছিলেন। বন্যা সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে এমন একটি বিশ্রী আত্মকলহের সৃষ্টি হওয়ায় অন্যান্যদের মত কবিও মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় সুভাষচন্দ্রের ঐ অনুরোধ এসে পড়ায় তিনি খুবই বিব্রত বোধ করছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বন্যাপীড়িতদের কথা চিন্তা করেই বাংলা কংগ্রেসের এই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। ৩রা সেপ্টেম্বর বি. পি. সি. ফ্লাড রিলিফ কমিটির সভাপতিত্ব করতে সম্মতি জানিয়ে তিনি সুভাষচন্দ্রের কাছে (কংগ্রেসের নামে) চিঠিটি লিখে পাঠালেন, (দ্রঃ *Liberty*—১০ই সেপ্টেম্বর '৩১):

Visva-Bharati
3rd September 1931

To

Bengal Provincial Congress Flood and Famine Relief Committee.

Dear Sirs,

With reference to your letter of date, if my being President of your Relief Committee would be of any help in your good work that would give me great pleasure. You may issue appeals for funds, at your discretion in my name as such President.

Yours truly
Sd/- Rabindranath Tagore

পূর্বেই বলেছি, বন্যাপীড়িতদের সাহায্য সংগ্রহের ব্যাপারে কবি

ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতীর মাধ্যমে স্বতন্ত্রভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় তিনি 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি ঘষে-মেজে গীতিনাট্যের উপযোগী করে তার মহড়া শুরু করে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য,—কলকাতায় মঞ্চস্থ করে বন্যা পীড়িতদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করবেন।

উল্লেখযোগ্য, কবির সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এই সময় বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যকদের উদ্যোগে 'রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব' উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি চলছিল। এই উৎসব উপলক্ষে তাঁরা 'বিশ্বভারতী'র সাহায্যের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করে কবির হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে (ঔপন্যাসিক) এক পত্রে (২৯শে আগস্ট) জানালেন যে, এই তহবিল তিনি বন্যাপীড়িতদের সাহায্যেই পাঠিয়ে দেবেন। পত্রটি ছিল এই:

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

শরৎ, শুনেছি তোমরা আমার অর্ঘ্যরূপে কিছু টাকা সংগ্রহের সংকল্প করেচ। দেশে এখন দারুণ দুর্দিন, এ সময়ে কোনো ব্যাপারের জন্যে অর্থের দাবী করা বিহিত হবে না। যদি আমার হাতে কিছু দিতে চাও তবে সেটার লক্ষ্য হবে দুর্গতদের দুঃখ হরণ। আমিও স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করচি—কলকাতায় এই উদ্দেশ্যে একটা কিছু পালাগানের কথা চলচে—এই উপায়ে কিছু কুড়োনো যাবে আশা করি। তোমরা জয়ন্তী উপলক্ষে অল্প-স্বল্প যা কিছু করতে পারবে আমার হাতে দিলে এ পুণ্যকর্মে আমার সহায়তা করা হবে। নিজের শক্তিতে কিছু করতে পারি এই বন্যাতে সে-উপায় রাখি নি। ইতি—১২ই ভাদ্র ১৩৩৮

তোমাদের

(স্বাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এর কয়েকদিন পরেই সুভাষচন্দ্রের কাছ থেকে বি. পি. সি. ফ্লাড রিলিফ কমিটির সভাপতিত্ব করার অনুরোধ এলে কবি তাতে সম্মতি জানিয়ে

লিখেছিলেন (৩রা সেপ্টেম্বর)। পরদিন তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে এই তহবিলে দান করার আবেদন জানিয়ে কবিতার আকারে কয়েক ছত্র লিখে সুভাষচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর সুভাষচন্দ্র তা *Liberty* পত্রিকায় প্রকাশ করে লিখলেন,

Dr. Rabindranath Tagore, who has kindly consented to become the President of the Bengal Congress Flood and Famine Relief Committee, has addressed the following appeal to the people :

অন্নহারা গৃহহারা চায় উর্ধ্বপানে
ডাকে ভগবানে।
যে দেশে সে ভগবান মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে
সাড়া দেন বীর্যরূপে দয়ারূপে দুঃখে, কষ্টে, ভয়ে
সে দেশের দৈন্য হবে ক্ষয়
হবে তার জয়।

১৮ই ভাদ্র
১৩৩৮ — স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

The following is the English version of the above :

The famished, the homeless
raise their hands towards heaven
and utter the name of God.

Their call will never be in vain
in the land where God's response
comes through the heart of man
in heroic service and love.

Santiniketan
Sept. 4-1931

কিন্তু কবি বিশ্বভারতী বন্যা রিলিফ কমিটিরও সভাপতি ছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে ঐ চিঠি লেখার পরই কবির খেয়াল হয়, এই তহবিল নিয়ে গোলমাল ও জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। তাই কবি পরদিনই এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়ে দিলেন যে যাঁরা বিশ্বভারতীর রিলিফ কমিটির টাকা পাঠাতে ইচ্ছুক—কেবল তাঁরাই যেন তাঁর কাছে পাঠান। কবির বিবৃতিটি ছিল এই :

"ক্যাপ্টেন এন. এন. দত্ত (নরেন্দ্রনাথ) যে সাহায্য সমিতির অনারারি সেক্রেটারী ঐ সাহায্য সমিতির প্রেসিডেন্ট পদে আমার নাম থাকায় অনেক ভুল ধারণার উদ্ভব হইতে পারে মনে করিয়া আমি ঐ সমিতির সহিত আমার প্রকৃত সংশ্রব সম্পর্কে এই বিবৃতি প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া বোধ করিলাম। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রিলিফ কার্যের সহিত আমার প্রকৃত সংশ্রব সম্পর্কে আমি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিকট ইতঃপূর্বেই বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছি।

"জনসাধারণ ভালভাবেই জানেন, কংগ্রেস, কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট কোন দল বা আর কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই। বর্তমানে আমি কেবল উত্তর ও পূর্ববঙ্গের বিপন্নদের সাহায্যদান কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। ক্যাপ্টেন দত্তের উক্ত কমিটি ছাড়া অন্য কোন কমিটিও যদি আমাকে তাহাদের কমিটিতে গ্রহণ করিতে চাহিতেন, আমি সানন্দে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে বিশ্বভারতীর ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যখন নিজেরাই সাহায্যদান কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন আমি অন্য কোন সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা আবশ্যক বলিয়া মনে করি না।

"আমার নিকট যে টাকা পাঠান হইবে ঐ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বিশ্বভারতীর মারফৎ যাঁহারা সাহায্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদের প্রেরিত টাকাও যখন আমার নিকট আসিবে তখন অন্য কোন কমিটির মারফৎ সাহায্যদানের জন্য প্রেরিত টাকা আমাদের নিকট আসিলে এক গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। কাজেই জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, আমার নিকট যে সকল টাকা আসিবে উহা বিশ্বভারতীর সাহায্য সমিতির

জন্য প্রেরিত বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে এবং অন্য কোন সমিতির আয়-ব্যয়ের জন্য আমি দায়ী নহি।”

[আনন্দবাজার পত্রিকা—২০শে ভাদ্র ১৩৩৮ ।। ৬ই সেপ্টেঃ ১৯৩১]

পাছে এই নিয়ে কোন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এজন্য কবি পূর্বেই আচার্য রায়কে তাঁর বক্তব্য খুলে লিখেছিলেন। এই বিবৃতি দেওয়ার পর কবি সুভাষচন্দ্রকেও এক চিঠিতে তাঁর অবস্থাটা পরিষ্কার খুলে লিখলেন। সেটি ছিল এই :

Visva-Bharati
Santiniketan, Bengal

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
কল্যাণীয়েষু,

আমি তোমাকে জানিয়েছিলুম কেবল নাম দিয়ে মাত্র আমি খালাস। টাকাকড়ির কোনো দায়িত্ব আমার নয়। বন্যা সম্বন্ধে যতগুলি কর্মসঙ্ঘ গঠিত হয়েছে নামের দ্বারা আমি সকলের সঙ্গেই যুক্ত হতে পারি কিন্তু কেবল বিশ্বভারতীর সঙ্গেই আমার কর্মের সম্বন্ধ। এইজন্যে তোমাদের গ্রহণযোগ্য টাকা আমার কাছে পাঠানো সঙ্গত হবে না। দেখা গেল লোকের এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হয়েছে তাই আমাকে লিখতে হোলো।

ইতি ১৯ ভাদ্র ১৩৩৮
(স্বাঃ) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এদিকে কবির ঐ বিবৃতি প্রকাশিত হলে সুভাষ-বিরোধীরা তার ব্যাখ্যা করলেন যে, আসলে কবি কংগ্রেস রিলিফ কমিটির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেই ঐ বিবৃতি দিয়েছেন। এই সংবাদ কানে যেতেই কবি তাঁর সেক্রেটারী অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়কে তৎক্ষণাৎ লোকের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য এক প্রেস-বিবৃতিতে ব্যাপারটা পরিষ্কার ব্যাখ্যা করবার নির্দেশ দিলেন। (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১)। বিবৃতিটি ছিল এই :

“As Dr. Rabindranath Tagore's recent statement in the

Press regarding Flood Relief work in Bengal has been misunderstood in certain quarters, I have been authorised by Dr. Tagore to state that he continues to be the President of the Bengal Provincial Congress Flood and Famine Relief Committee and never had any intention of resigning that position. What the statement had implied was that after the formation of the Visva-Bharati Relief Committee, he did not consider it desirable to join a third Committee, though any such request made at an earlier stage would have been duly considered by him,

"Dr. Tagore desires that all contributions meant for the Bengal Provincial Congress Flood and Famine Relief Fund should be sent to the Treasurer, Sj. Subhas Chandra Bose or the Secretary, Capt. N. N. Dutta at 1, Wellington Square, Calcutta, who will duly account for all receipts and disbursements and who will in due course place before the Committee and the public the audited accounts of the fund. This arrangement will avoid confusion with the Visva-Bharati Relief Fund which has been started at Santiniketan,"

[*Liberty*—September 10, 1931]

এদিকে এর কিছুদিন আগেই চট্টগ্রামে এক ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়। গান্ধীজীর বিলেত যাত্রার পরদিনই চট্টগ্রামের কুখ্যাত পুলিশ ইনস্পেক্টর খান্ বাহাদুর আসানুল্লা বিপ্লবীদের গুলীতে প্রাণ হারান (রবিবার ৩০শে আগস্ট) এই ঘটনার পর ঐদিনই রাত্রে চট্টগ্রামে হিন্দুদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু হয়। পুলিশের চোখের সামনেই একদল কুখ্যাত গুণ্ডা শ্রেণীর লোক হিন্দুদের ঘরবাড়ি দোকানপাট লুট করে জ্বালিয়ে দেয়। পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের নিষ্ক্রিয়তায় কারুর বুঝতে বাকি থাকল না, কার

উস্কানিতে এই দাঙ্গা ও আক্রমণ চলছে। একদিকে বন্যাপ্লাবন অপরদিকে চট্টগ্রামে এই পৈশাচিক তাণ্ডবলীলায় কলকাতায় ভীষণ উত্তেজনা দেখা দেয়। বস্তুতঃ চট্টগ্রামে কি যে ঘটেছিল বাইরের লোকে তা কিছুই জানতে পারে নি। ৬ই সেপ্টেম্বর জে. এম. সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একটি তদন্ত প্রতিনিধি দল চট্টগ্রাম যাত্রা করেন।

রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর আরো আশঙ্কা হয়, এর প্রতিক্রিয়ায় কলকাতায় ও অন্যত্র দাঙ্গার প্রসার লাভ করবে। ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯শে ভাদ্র ১৩৩৮) তিনি শান্তিনিকেতন থেকে 'ফ্রী প্রেসের' মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই এই ভয়াবহ ভ্রাতৃ-হত্যার পাপকার্য থেকে বিরত থাকবার জন্য এক মর্মস্পর্শী আবেদন জানালেন। আবেদনটি ছিল এই :

"বাংলার বিভিন্ন স্থানে পর পর যে সকল নৃশংস অত্যাচার-উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইতেছে, উহা কেবল যে আমাদিগকে দুঃখিতই করিয়াছে তাহা নহে, অসহনীয় লজ্জার বোঝাও আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছে। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে, বৃটিশ সরকারের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ছিল এই সকল অত্যাচার-উৎপীড়নে তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বার বার অনায়াসে গ্রামের পর গ্রাম, সহরের পর সহরে এই সকল নৃশংসতার অনুষ্ঠানে বৃটিশ সরকারের নৈতিক মর্যাদা অতিমাত্রায় আহত হইয়াছে।

"কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যেই কোন দল বিশেষকে যখন আমরা আমাদেরই মধ্যে বিদ্বেষের আগুন উস্কাইয়া তুলিতে ও আমাদের জতীয় ইতিহাসকে চিরদিনের মত কলঙ্কিত করিতে দেখি, তখন লজ্জায় সঙ্কোচে আমরা নির্বাক হইয়া পড়ি। এতৎসম্পর্কে আমি সমবেত চেষ্টা দ্বারা নিজ-দিগকে রক্ষা করিবার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, বলিতে ইহাই বুঝাইতে চাই যে, একটি কার্যতৎপর নীতি-সঙ্ঘ গঠন করিয়া আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। উত্তেজনা-অন্ধ আত্মঘাতী দল এই সকল নৃশংস অত্যাচার-উৎপীড়ন দ্বারা আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়েরই অত্যাচারী ও অত্যাচারিত সকলেরই সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে, শান্তি ও সভ্যতার ভিত্তিমূল বিধ্বস্ত করিয়া থাকে।

"বহু দূরে অবস্থিত এক দ্বীপের অধিবাসীর পক্ষে চিরকালের জন্য ভারতের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা রাখা সম্ভবপর হইবে না, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান একই দেশমাতৃকার সন্তান। চিরকাল পাশাপাশি বাস করিয়া এক সম্মিলিত রাজতন্ত্র গড়িয়া তুলিব, জয়-পরাজয়ের সমান অংশ সমভাবে বাঁটিয়া লইব। এই নিদারুণ সঙ্কট মুহূর্তে আমাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সমস্ত সাধু মুসলমানগণকে তাঁহাদের মহান ধর্মের নামে, তাহাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার নামে ও বিপন্ন মানবসমাজের নামে আমি আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া, যে পাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া আমাদিগকে উন্নতির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় ডুবাইয়া দিয়া সমগ্র জগতের চক্ষে আমাদিগকে হীন ও উপহাসাস্পদ প্রতিপন্ন করিয়া ফেলিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে, উহার উচ্ছেদসাধনে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিতেছি।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২০শে ভাদ্র ১৩৩৮ ।। ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১]

এর কয়েকদিন পরে জে. এম. সেনগুপ্ত প্রমুখ চট্টগ্রাম তদন্ত কমিটির নেতারা চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসেই ঘটনার প্রকৃত বিবরণ দিতে গিয়ে সেখানকার পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের ঐ দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করলেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর (২৭শে ভাদ্র ১৩৩৮) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে কলকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভায় জে. এম. সেনগুপ্ত উপরোক্ত মর্মে চট্টগ্রামের সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন। যাই হোক নেতারা সকলেই বন্যাপীড়িত ও চট্টগ্রামের উৎপীড়িতদের সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে দেশের জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাতে থাকেন।

কলকাতায় কবি ব্যক্তিগতভাবেও সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। পূর্বেই বলেছি বন্যাপীড়িতদের উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহের জন্যই কবি কলকাতায় 'গীতোৎসবের' ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় ম্যাডান থিয়েটার ও প্যালেস অব ভ্যারাইটিস নাট্যমঞ্চে গীতোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কালীমোহন ঘোষের নেতৃত্বে কবি পতিসর অঞ্চলে বিশ্বভারতী বন্যা সহায়ক সমিতির একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা

পতিসর ও চৌগ্রামে দুটি সাহায্য কেন্দ্র খুলেছিলেন। বন্যা সহায়ক সমিতি ছাড়াও কবি চট্টগ্রাম উৎপীড়িতদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। 'ফ্রী প্রেস' পরিবেশিত এক সংবাদে জানা যায় কবি গীতোৎসব'-এর উদ্বৃত্ত এক হাজার টাকা চট্টগ্রাম দুর্গতদের সাহায্যার্থে দান করেছিলেন।

[দ্র: আনন্দবাজার পত্রিকা-১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩১]

ঠিক এই সময় হিজলী বন্দীশালায় রাজবন্দীদের উপর পুলিশের নৃশংস গুলিচালনার (১৬ই সেপ্টেম্বর) খবর এসে পৌঁছল। গুলিচালনার ফলে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নিহত হন এবং প্রায় ২৫ জন রাজবন্দী গুরুতর আহত হন। কলকাতায় এই খবর পৌঁছানর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জে. এম. সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র ও অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী প্রমুখ নেতারা হিজলী যাত্রা করেন। পরদিন ১৮ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে তাঁরা স্পেশাল ট্রেন যোগে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনের মরদেহ নিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলেন। স্টেশনে অপেক্ষমান বিশাল জনতা বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন ; তারপর সেই বিশাল জনতা মিছিল করে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে গিয়ে শব-সংকার করেন।

এই ঘটনার পর অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই বাংলা দেশের রাজনীতিক অবস্থার মোড় ফিরে গেল। বাংলা কংগ্রেসে দীর্ঘ দিন ধরে সেনগুপ্ত-সুভাষের যে দলীয় কোন্দল চলছিল হিজলী গুলিচালনার পর তার অবসান ঘটল। খড়্গপুর থেকে ফিরে এই দিনই রাত্রে (১৮ই সেপ্টেম্বর) সুভাষচন্দ্র বি. পি. সি. সি. থেকে পদত্যাগ করে তীব্র আবেগময়ী ভাষায় বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে তিনি কংগ্রেস কর্মীদের সকল বিভেদ-অনৈক্য ভুলে গিয়ে সকলকেই একযোগে কাজ করবার আবেদন জানিয়ে বলেন,

"আমি খড়্গপুর হইতে অবর্ণনীয় বেদনা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আমাদের বন্ধুবর্গকে জেলের মধ্যে কুকুর-বিড়ালের মত গুলী করিয়া মারিবে আর আমরা তখনই বিবাদ-বিসম্বাদে রত থাকিব। সকল বিভেদ ভুলিয়া আজ আমাদিগকে পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে হইবে—শত্রুর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।"...

পরদিন—১৯শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় বাংলা কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীই সম্মিলিতভাবে মনুমেন্টের নীচে এক বিশাল জনসভায় হিজলী গুলী চালনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানালেন। সে এক স্মরণীয় দৃশ্য! একই সভামঞ্চে সেনগুপ্ত ও সুভাষ যখন পাশাপাশি দাঁড়ালেন সমবেত বিশাল জনতা প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়ে উভয়কেই অভিনন্দন জানালেন। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সুভাষ বললেন,

"বহুদিন পর বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আজই একই উদ্দেশ্য লইয়া একই মঞ্চে সমবেত হইয়াছেন। বাংলা বিভেদ অনৈক্যের কুফল আজ মর্মে মর্মে অনুভব করিতে পারিয়াছে। আশা করি, আজ আত্মোৎসর্গীদের এই মহান আত্মত্যাগের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলার বিরাট ঐক্য-সৌধ গড়িয়া উঠিবে।"...

[আনন্দবাজার পত্রিকা-৩রা আশ্বিন ১৩৩৮ ।। ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১]

রবীন্দ্রনাথ তখনও কলকাতায়। হিজলী গুলিচালনার সংবাদে তিনি যে কি পরিমাণ ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন তা সহজেই অনুমান করা যায়। ঐ সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গীতোৎসব বন্ধ করবার নির্দেশ দেন। এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কি ভাবে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রকাশ করা যায় কবি তা ভেবে পেলেন না। জে. এম. সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা বিক্ষোভ সভার প্রস্তাব নিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কবি সানন্দে তাতে সম্মতি দেন। স্থির হয় কয়েক দিন পর—২৬শে সেপ্টেম্বর এই বিক্ষোভ সভায় কবি স্বয়ং সভাপতিত্ব করবেন।

সভা ডাকা হয়েছিল টাউন হলে। কিন্তু সভার আগেই সেখানে এত বিশাল জনসমাগম হয়েছিল যে নেতারা শেষ পর্যন্ত সভার স্থান পরিবর্তন করে মনুমেন্টের নীচে সভা হবার কথা ঘোষণা করে দিলেন। সে এক অবিস্মরণীয় দিন! অসুস্থ শরীরেও কবি সমস্তক্ষণ দাঁড়িয়েই তাঁর লিখিত ভাষণটি সভায় পাঠ করলেন। কবির এই ভাষণটি এতই সুপরিচিত যে এখানে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন হয় না। উল্লেখযোগ্য, ঐ দিনই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র এক বিশেষ সান্ধ্য সংস্করণ সংখ্যায় কবির ঐ ভাষণটি মুদ্রিত হয়।

কবির ইচ্ছানুযায়ী পূর্বেই এর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এর মূল্য ঘোষণা করা হয়েছিল দুই পয়সা এবং তার বিক্রিত অর্থের অর্ধেক চট্টগ্রামের দাঙ্গা দুর্গতদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হবে।

যাই হোক' এই ঘটনার পরই সেনগুপ্ত-সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘকালের বিরোধের অবসান ঘটে। ২৬শে সেপ্টেম্বর এম.এস. আণে এক দীর্ঘ বিবৃতিতে এই কথা ঘোষণা করে কলকাতা ত্যাগ করেন।

ইণ্ডিয়ান স্ট্র্যাগল্ রচনা : কবিকে পত্র

এর কিছুকাল পরেই—ডিসেম্বরের প্রথম ভাগেই (১৯৩১) 'গোল টেবিল বৈঠকে'র ব্যর্থতার খবর এসে পৌঁছল। কয়েকদিন পর গান্ধীজী ভগ্নমনোরথে ও শূন্য হস্তে দেশের পথে যাত্রা করেন। ভারতবর্ষে তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করেই বৃটিশ গভর্ণমেন্ট আগে থেকেই তার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি চালিয়েছিল। ব্যাপক ধরপাকড় খানাতল্লাস এবং কঠোর দমননীতি শুরু হয়ে গেল। গান্ধীজী ভারতে ফিরে আসার আগেই জওহরলাল, শেরওয়ানি, খান্ আব্দুল গফ্ফর খাঁ, ডাঃ খান্ সাহেব প্রমুখ নেতারা ও বহুকর্মী গ্রেপ্তার হলেন।

২৮শে ডিসেম্বর গান্ধীজী বোম্বাইয়ে পৌঁছলেন। সুভাষচন্দ্র ও ওয়ার্কিং কমিটির অবশিষ্ট নেতারা আগেই বোম্বাইয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সরকারের দমননীতি ও মনোভাবের কঠোর নিন্দা করে এবং এর পরিবর্ত্তন না-হলে পুনরায় সংগ্রাম শুরু করার কথা ঘোষণা করা হয়। ২রা জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র কল্যাণ রেল ষ্টেশনে গ্রেপ্তার হলেন (১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের বলে)। পরদিন-মধ্যরাত্রে গান্ধীজী ও বল্লভভাই প্যাটেল গ্রেপ্তার হলেন। তারপর চলল অবাধ দমননীতি ও পুলিসী সন্ত্রাসরাজ। এর প্রতিক্রিয়ায় সারা দেশে প্রবল বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হল।

রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায়। গান্ধীজী প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তার এবং সারা দেশে অবাধ পুলিসী সন্ত্রাসরাজ শুরু হওয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এই সময় তিনি পরপর কয়েকটি বিবৃতি দিলেন। কিন্তু কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলগুলির উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি না-থাকায় পুলিসের প্রবল দমননীতির মুখে আন্দোলন কিছুকাল পরেই স্তিমিত হয়ে এল।

এদিকে গ্রেপ্তারের কিছুকাল পরেই সুভাষচন্দ্র জেলখানায় খুবই অসুস্থ

হয়ে পড়লেন। সরকার চিকিৎসার জন্য প্রথমে তাঁকে 'ভাওয়ালী স্যানাটোরিয়ামে'—পরে লক্ষ্ণৌ-এ বলরামপুর হাসপাতালে পাঠালেন। সেখানে কিছুদিন পরই চিকিৎসকরা তাঁর অসুখের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিদেশে চিকিৎসার জন্য সুপারিশ করলেন। এই অবস্থায় ইংরেজ সরকার কতকটা বাধ্য হয়েই তাঁকে ইউরোপে যাবার অনুমতি দিলেন। এই সময়ই তিনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর কাছে তার বিদেশে পরিচয় পত্র দেবার জন্য অনুরোধ জানান। গান্ধীজী তখনও যারবেদা কারাগারে। তিনি নাকি প্রথমে তাতে সম্মতি জানালেও—যে কোন কারণেই হোক শেষ পর্যন্ত তা দেন নি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সেই সময় তাঁকে একটি ছোট্ট পরিচয়পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা এবং রামমোহন রায়ের মৃত্যুশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির উদ্বোধন সভায় যোগদানের উপলক্ষে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি (১৯৩৩) নাগাদ কবি কলিকাতায় এসেছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময় সুভাষচন্দ্রের কোন আত্মীয়ের মারফৎ তাঁর ঐ অনুরোধ পত্রটি কবির কাছে এসে পড়ে। ১৮ ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৩) কবি জোড়াসাঁকো বাড়ী থেকে সুভাষচন্দ্রের জন্য পরিচয় পত্রটি লিখে দেন। সেটি এখানে যথাযথ উদ্ধৃত করা হল :

6, Dwarakanath Tagore Lane.
Calcutta.
Feb.-18, 1933.

My friend Subhas Chandra Bose is going for his treatment. I earnestly hope my friends will be kind to him and help him.

Sd/- Rabindranath Tagore.

কিন্তু এই ধরনের পরিচয় পত্র সুভাষচন্দ্রের ঠিক মনঃপূত হয় নি,—এ "যেন অনুরোধ রক্ষার জন্য লেখা"। এ পরিচয়পত্রের তিনি যে সদ্ব্যবহার করেন নি, এ কথা তিনি স্বয়ং কবিকে পরে লিখেছিলেন। এই

প্রসঙ্গে নলিনীকিশোর গুহ মশায় তাঁর "বাংলায় বিপ্লববাদ" গ্রন্থে লিখেছেন,

......"১৯৩৩ সালে গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে (সুভাষচন্দ্রকে) ইউরোপের স্বাস্থ্য নিবাসে যাওয়ার চুক্তিতে কারামুক্তির আদেশ দিলেন। —সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর নিকট হইতে ইউরোপের বিশিষ্ট নেতাদের বরাবরে পরিচয়-পত্র চাহিয়াছিলেন। গান্ধীজী জানান যে, বিদেশে যাওয়ার পূর্বে তিনি সুভাষবাবুকে পত্র দিবেন। সুভাষচন্দ্র বিদেশে যাইতেছেন—মহাত্মাজীর পরিচয়-পত্র নিতে পারিলে সেখানে পরিচয়ের এবং কাজ কর্মেরও বিশেষ সুবিধা হইবে ইহা মনে করেন এবং চিঠির প্রত্যাশা করেন। যখন বোম্বাইয়ে জাহাজে—তখনো চিঠি আসিল না। অনেকেই দেখা করিতে আসেন, কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও অনেকে আসেন; সুভাষচন্দ্র আশা করেন, এবার হয়তো পত্র আসিতেছে! অবশেষে একবারে শেষ মুহূর্তে দেখা গেল—মহাদেব দেশাই আসিতেছেন; এবারে বাঞ্ছিত 'পরিচয়-পত্র' আসিবে; সুভাষ বাবু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। খামখানা অতিক্ষীণকায়—হাতে লইয়াই সুভাষবাবু মনে করিলেন পত্র কোথায়? পত্র খুলিলেন! মহাত্মাজী সংক্ষেপে জানাইয়াছেন, 'আমি পরে ভাবিয়া দেখিলাম (second thought) আমি বিদেশে পরিচয়-পত্র দিতে পারিনা'। —সুভাষচন্দ্রের হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে, এমনই অবস্থা হইল। বড়ই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা দুর্জয় আত্মবিশ্বাস—এই আত্ম-বিশ্বাসই ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রকৃতিগত ধর্ম —দেখা দিল। সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতেও একখানা পরিচয়-পত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পত্রখানা বাহির করিলেন: তাহাও টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। 'অপরের প্রত্যাশা আর করিব না। আমার পরিচয় আমিই দিব।' ".....

[বাংলায় বিপ্লববাদ—পৃঃ ৩৪৮]

২৩শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩৩) দ্বিপ্রহরে লয়েড ট্রিষ্টিনো কোম্পানীর "গাঙ্গে" জাহাজে সুভাষচন্দ্র ইউরোপ যাত্রা করেন। কিন্তু এই সম্পর্কে

সংবাদ পত্রে যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাতে অবশ্য মহাদেব দেশাইয়ের আগমনের কথা পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কে পরদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'ফ্রী প্রেস' পরিবেশিত সংবাদ-বিবরণে বলা হয় :

"অদ্য দ্বিপ্রহরে লয়েড ট্রিষ্টিনো কোম্পানীর 'গাঙ্গে' জাহাজ বোম্বাই পরিত্যাগ করিয়াছে। জাহাজ নোঙ্গর তুলিলে জনৈক পুলিশ কর্মচারী জাহাজে গিয়া তাঁহাকে বলেন, ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে তাঁহার উপর যে আদেশ জারি হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাহৃত হইল। ২৩শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে শ্রীযুত বসুর অবরোধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আদেশ কার্য্যকরী হইবার কথা ছিল কিন্তু তাহাকে জানান হয় যে, বস্তুতঃপক্ষে ২৩ শে তারিখে দ্বিপ্রহরের পরই তিনি মুক্ত হইলেন।......

"পুলিশের উপস্থিতিকালে, সকলকে শ্রীযুত বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট জেদ ধরায় তিনি তাঁহার তিনজন ঘনিষ্ঠ অভিনেতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসন্মত হন। কিন্তু কোনও ক্রমে তাঁহারা জাহাজের কেবিনে গিয়া তাহার সহিত কয়েকটি কথা বলিয়া তাঁহাকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।"

ঐ তারিখে A. P. র সংবাদদাতা লিখেছেন,

"পুলিশের উপস্থিতিতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের আত্মীয়গণকে 'গাঙ্গে' জাহাজের ডেকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয়। শ্রীযুত বসুর মাতুল ডঃ দত্ত, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বসু ও তাহার পত্নী এবং শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র (অমিয় বসু—লেখক) প্রভৃতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীযুত বসু একখানা আরাম কেদারায় শুইয়া তাঁহাদের সহিত এক ঘণ্টার উপর কথাবার্তা বলেন। অপর কাহাকেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয় নাই, এমন কি সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিদিগকেও সেই অনুমতি দেওয়া হয় নাই। ডঃ শৈলেন্দ্র সেন শ্রীযুত বসুর সঙ্গীস্বরূপ যাইতেছেন।"—এ. পি.

[আনন্দবাজার পত্রিকা—১২ই ফাল্গুন ১৩৩৯ ।। ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩]

এর কোনটিতেই মহাদেব দেশাইয়ের আসার ও বিদায়সম্বর্ধনা কিংবা

গান্ধীজীর বার্তাবহ হয়ে সুভাষচন্দ্রকে চিঠি দেওয়ার কথার উল্লেখ দেখি না। মহাদেব দেশাই বিদায়কালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন অথচ সংবাদপত্রে তার কোন বিবরণ প্রকাশিত হল না, এটা স্বভাবতঃই ভাবতে কষ্ট হয়।

যাই-ই হোক এর কয়েকদিন পরই সুভাষচন্দ্র ভিয়েনায় পৌঁছলেন (৮ই মার্চ '৩৩)। ভিয়েনাতে তিনি বিশেষজ্ঞদের চিকিৎসাধীনে থেকে অচিরেই কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। এর অনতিকাল পরেই তিনি তাঁর সুবিখ্যাত *'The Indian Struggle'* গ্রন্থটি রচনা শুরু করেন। গ্রন্থ রচনা শেষ হবার মুখে তিনি ভিয়েনা থেকে রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লেখেন (৩রা আগষ্ট, ১৯৩৪)।

এই পত্রে তিনি কবিকে এই মর্মে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখার জন্য বার্ণার্ড শ কিংবা এইচ. জি. ওয়েলস্‌কে অনুরোধ করে কিছু লেখেন। অবশ্য এই চিঠিতে কবির গান্ধীজীর প্রতি 'অন্ধভক্তি' সম্পর্কে দু' একটি অসংযত মন্তব্য ছিল যা পাঠ করার পর কবি কিছুটা আহত হন। পত্রটি যথাযথভাবে এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

C/o American Express Company
Vienna
৩রা আগষ্ট, ১৯৩৪

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

একটা বিশেষ কারণে আপনাকে বিরক্ত করিতেছি, আশা করি তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন।

লণ্ডনের জনৈক প্রকাশকের অনুরোধে আমি এখন একটি পুস্তক লিখিতেছি। পুস্তকের বিষয়—'The Indian Struggle, 1920-34'। প্রকাশকের নাম—Wishart and Company, 9 John Street, Adelphi, London. W. C. 2। আগষ্ট মাসের মধ্যেই আমার লেখা শেষ হইবে এবং অক্টোবরের মধ্যে বই প্রকাশিত হইবে। যে সমস্ত

Joint Select Committee'র রিপোর্ট সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হইবে, ঠিক সেই সময়ে আমার বইটিও প্রকাশিত হইবে। পুস্তকের গোড়ায় "Historical Background" শীর্ষক এক অধ্যায় থাকিবে এবং একেবারে শেষে "Coming Events" শীর্ষক এক অধ্যায় থাকিবে। প্রকাশকদের আশা যে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় খুব বেশী বিক্রি হইবে এবং তাঁহারা জার্মান ও ফরাসী অনুবাদেরও চেষ্টা করিতেছেন। আমি এখন চাই কোনও বিশিষ্ট লেখকের কাছ থেকে আমার পুস্তকের জন্য সূচনা বা Foreword.

আমি নিজে খুব সুখী ও সন্তুষ্ট হইব যদি Bernard Shaw-র লেখনী হইতে কয়েকটি ছত্র পাই। এ বিষয়ে হয় তো আপনি সাহায্য করিতে পারিবেন। আপনি যদি Bernard Shaw মহাশয়কে এ বিষয়ে লিখিতে পারেন তাহা হইলে বড় উপকৃত হইব। তবে আপনি যদি কোনও প্রকার সঙ্কোচ বা অনিচ্ছা বোধ করেন তাহা হইলে আমি আপনাকে অনুরোধ করিতে চাই না। এবং আপনি যদি লেখা স্থির করেন, তাহা হইলে এমন ভাবে অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন যাহাতে প্রকৃতপক্ষে কিছু কাজ হয়। কেবল আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য লিখিয়া কোনও লাভ নাই। আমি যখন ইয়ুরোপে আসি, আপনি তখন অনুগ্রহ করিয়া Romain Rolland মহাশয়কে আমার সম্বন্ধে পরিচয় পত্র দিয়াছিলেন কিন্তু সে পরিচয় পত্র যেন অনুরোধ রক্ষার জন্য লেখা। সুতরাং সে পত্রের আমি সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই এবং নিজেই Rolland মহাশয়ের সহিত পত্র ব্যবহার আরম্ভ করি। Bernard Shaw মহাশয় বোধ হয় আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না সুতরাং তাঁহাকে ভাল করিয়া লেখা দরকার হইবে।

আমি ভরসা করি যে আমার পুস্তকের আদর হইবে, কারণ প্রকাশক মহাশয় আমার সহিত advance contract করিয়াছেন এবং royaltyর টাকা লইয়া আমি লেখা আরম্ভ করিয়াছি।

Bernard Shaw ব্যতীত আর একজনের কাছ থেকে Foreword পাইলেও কাজ হইতে পারে—H. G. Wells। Rolland মহাশয়ের

কথা আমার মনে হইয়াছিল কিন্তু তিনি প্রচণ্ড রকমের "গান্ধীভক্ত", অথচ আমি তাহা নহি এবং তাঁহাকে সেকথা আমি জানাইয়াছি। সুতরাং Rolland মহাশয় যে আমার পুস্তকের সূচনা লিখিতে রাজি হইবেন সে আশা আমি করিতে পারি না। Bernard Shaw বা Wells মহাশয় মহাত্মাজী সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন কিন্তু তাঁহারা অন্ধভক্ত ন'ন—সুতরাং তাঁহারা হয় তো রাজি হইতে পারেন। আপনার কথাও আমার মনে হইয়াছিল কিন্তু আমি জানি না আপনি রাজনীতি-বিষয়ক পুস্তকের জন্য কিছু লিখিতে ইচ্ছুক হইবেন কি না। তদ্ব্যতীত, আপনি নিজে সম্প্রতি মহাত্মাজীর অন্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন —অন্ততঃপক্ষে আপনার লেখা পাঠ করিলে সেরূপ ধারণা মানুষ স্বভাবতঃ পোষণ করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় মহাত্মাজীর সমালোচনা আপনি বরদাস্ত করিতে পারিবেন কি না আমি জানি না। আমার পুস্তকটা হইবে—"an objective study of the Indian movement from the standpoint of an Indian nationalist."

Bernard Shaw মহাশয়ের ঠিকানা—4 Witehall Court, London S. W. 1—আপনি ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে লিখিতে পারেন অথবা চিঠিটা আমার নিকট পাঠাইতে পারেন। আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি

আপনার অনুগত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

পুঃ আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি শেষ অধ্যায়ে লিখিব। ঐ অধ্যায়ে ভবিষ্যতে ভারতের আন্দোলন কি আকার ও রূপ ধারণ করিবে সে বিষয়ে আমার মত ও ধারণা প্রকাশ করিব।

সুভাষ

রবীন্দ্রনাথকে ঠিক এই ধরণের চিঠি লেখা একমাত্র বোধ হয় সুভাষচন্দ্রের পক্ষেই লেখা সম্ভব ছিল। সুভাষচন্দ্র সুভাষচন্দ্রই। কারও সম্পর্কে তাঁর

ধারণা বা মনের ভাব গোপন করে কিছু বলাটা তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। এ চিঠি পড়ে কবি হয়ত কিছুটা ক্ষুণ্ণ ও বিরক্তও হয়েছিলেন —বিশেষ করে তাঁকে গান্ধীজীর 'অন্ধভক্ত' বলাতে। তাছাড়াও ঠিক ঐ ধরণের অনুরোধ জানিয়ে—বিশেষতঃ বার্ণার্ড শ'র মত লোককে চিঠি লিখতে তিনি প্রচুর সঙ্কোচ বোধ করলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি সুভাষচন্দ্রকে তাঁর এই অনুরোধ রক্ষার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতার কথা জানিয়ে জবাব দিয়েছিলেন। কবির পত্রটি এখানে যথাযথ উদ্ধৃত করা হল ঃ

স্নেহভাজনেষু,

Bernard Shaw কে আমি ভালোমতো জানি ; তোমার বইয়ের পূর্বভাষণ লেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে আমি সাহস করি নে। করলেও ফল হবে না এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমার পাণ্ডুলিপিখানির এক কপি তুমি নিজেই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেখতে পার। এতদিনে সংবাদপত্রযোগে নিশ্চয় তিনি তোমার পরিচয় পেয়েছেন।

এই উপলক্ষে একটা কথা তোমাকে বলা আবশ্যক বোধ করি। মহাত্মা গান্ধী অতি অল্পকালের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের মনকে এক যুগ থেকে আর এক যুগে নিয়ে যেতে পেরেচেন। কেবল একদল রাষ্ট্রনৈতিকের নয় সমস্ত জনসাধারণের মনকে তিনি বিচলিত করেতে পেরেচেন—আজ পর্যন্ত আর কেউ তা পারে নি। এর পূর্বে ভারতবর্ষের এখানে ওখানে ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে দুর্বল রকমের রাষ্ট্রনৈতিক সুড়সুড়ি লেগেছিল মাত্র। মহাত্মাজির চরিত্রের মধ্যে এই একটা প্রবল নৈতিকশক্তিকে ভক্তি যদি না করতে পারি তবে সেইটেকেই বলব অন্ধতা। অথচ তাঁর সঙ্গে আমার স্বভাবের বুদ্ধির ও সংকল্পের বৈপরীত্য অত্যন্ত প্রবল। মনের দিকে কল্পনার দিকে ব্যবহারের দিকে তিনি আর আমি সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর জীব। কোনো কোনো বিষয়ে তিনি দেশের ক্ষতি করেছেন—কিন্তু দেশের নির্জীব চিত্তে হঠাৎ যে বল এনে দিয়েচেন একদিন সেটা

সমস্ত ক্ষতিকে উত্তীর্ণ হয়ে টিঁকে থাকবে। আমারা কেউই সমস্ত দেশকে এই প্রাণশক্তি দিই নি। ইতি

১৭ই আগষ্ট, ১৯৩৪

শান্তিনিকেতন

তোমাদের

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান্ধাজীর কোন মূর্তিটিকে কবি বেশি শ্রদ্ধা করতেন এই পত্রটিতে এর কিছু আভাস মেলে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজীর এই অবদানকে অস্বীকার করেন নি। তিনি তাঁর ঐ গ্রন্থে প্রধানতঃ ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর রাজনীতির বাস্তব সার্থকতা সম্বন্ধে সমালোচনা করেছেন। তবে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার (৭ই এপ্রিল, ১৯৩৪) করে নেওয়াতে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ সংগ্রামপন্থীরা গান্ধীজীর উপর খুবই রুষ্ট ও বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। গান্ধীজীর আপোষপন্থী রাজনীতির সম্পর্কে প্রথম থেকেই তাঁর মনে একটা সন্দেহ ও বিরূপতা রয়ে গিয়েছিল। স্মরণ রাখা দরকার, এর প্রায় বছর খানেক আগে যখন গান্ধীজী সাময়িকভাবে আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন তখন সুভাষচন্দ্র ও বিঠলভাই প্যাটেল ভিয়েনা থেকে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিবৃতি দেন (৯ই মে, ১৯৩৩)।

যাই-ই হোক কবির ঐ পত্র পাওয়ার পর সুভাষচন্দ্রের মানসিক অবস্থা কি হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। এরপর সুভাষচন্দ্র স্থির করেন, তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা কাউকে দিয়েই তিনি লেখাবেন না। গ্রন্থ রচনার শেষে তিনি স্বয়ং তার ভূমিকা লিখলেন (২৯শে নভেম্বর, ১৯৩৪)। ঠিক এই সময়েই পিতার গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তিনি বিমানযোগে দেশের পথে যাত্রা করেন। কিন্তু ১লা ডিসেম্বরই মধ্যরাত্রে সুভাষচন্দ্রের পিতা—জানকীনাথ বসুর মৃত্যু হয়। ৩রা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় করাচী বিমানবন্দরে অবতরণ করে সুভাষচন্দ্র পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়েই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। ঠিক এই

অবস্থাতেই পুলিশ তাঁর জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে খানাতল্লাসি করে অবশেষে তাঁর *Indian Struggle* গ্রন্থের টাইপ-কপিটি বাজেয়াপ্ত করে নেয়। পরদিন সুভাষচন্দ্র বিমানযোগে দমদমে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর কতকগুলি কঠোর সর্তাধীনে তাঁদের এলগিন রোডের বাড়ীতে বন্দী থাকবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সংবাদে বার্ণার্ড শ, এইচ. জি. ওয়েলস্ ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশ্বের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও মনীষীরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। এই প্রসঙ্গে 'প্রবাসী' লিখেছিল,

"সুভাষচন্দ্র করাচী পৌঁছিবার পর তাঁহার জিনিষপত্র হাতড়াইয়া তাহার মধ্য হইতে তাঁহার অচিরে প্রকাশিতব্য ভারতীয় স্বাধীনতা প্রচেষ্টা বিষয়ক রাজনৈতিক পুস্তকের টাইপ্‌লিপি হস্তগত করে এবং পরে তাহা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

"কাগজে বাহির হইয়াছে, বিলাতের বার্ণার্ড শ, এইচ. জি. ওয়েলস্ য়্যাল্ডস্ হ্যাক্‌ষলি এবং আর্ল রাসেল প্রমুখ লেখকগণ এবং ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ সুভাষবাবুর বহির টাইপ্‌লিপি বাজেয়াপ্ত করার জোরাল প্রতিবাদ করিয়াছেন বা করিবেন।"…[প্রবাসী-মাঘ ১৩৪১]

এই ঘটনার পর সুভাষচন্দ্র স্বয়ং যদি বার্ণার্ড শ কিংবা এইচ. জি. ওয়েলস্‌কে তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা লেখার জন্য অনুরোধ জানাতেন তাহলে তাঁরা হয়ত তাতে সম্মত হতেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তা করেন নি। সুভাষচন্দ্র যে কত বড় তেজস্বী পুরুষ ছিলেন—কী প্রগাঢ় তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল উপরোক্ত ঘটনা ও চিঠিপত্রগুলি থেকেই তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

যাই-ই হোক তাঁর গ্রন্থের মূল কপিটি বিলেতের প্রকাশকের কাছে থাকায় যথাসময়েই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৫)। অনতিকাল পরেই ভারত সরকার তাঁর গ্রন্থটি ভারতে আসা নিষিদ্ধ করে দেন (২৩শে জানুয়ারী)। সুভাষচন্দ্র তখন ইউরোপে। পিতার শ্রাদ্ধের পর তিনি পুনরায় ভিয়েনা যাত্রা করেন (১০ই জানুয়ারী, ১৯৩৫)।

বলা বাহুল্য, এর কয়েক বৎসর পরেই রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই-ই নয়, গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যখন সুভাষচন্দ্রের বিরোধ তীব্র হয়ে উঠতে থাকে তখন রবীন্দ্রনাথই সুভাষচন্দ্রের পক্ষ গ্রহণ করে এগিয়ে এসেছিলেন। এ সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

বন্দীমুক্তি আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ

১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক 'ভারত শাসন আইন'টি পাস হয়। বলা বাহুল্য, দেশের অধিকাংশ দলই বিশেষতঃ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আইনটির তীব্র নিন্দা করা হয়। কিন্তু 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' ও 'ভারত শাসন আইনের' বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতারা পার্লামেন্টারী বা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ গ্রহণ করতে (অন্ততঃ সাময়িকভাবে) মোটামুটিভাবে একমত হয়েছিলেন। স্বয়ং গান্ধীজীই এতে পূর্বেই সম্মতি দিয়েছিলেন। ফলে সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ এবং দেশের সংগ্রামী আবহাওয়াকে নষ্ট করে কংগ্রেসকে বিপর্যস্ত করবার সুযোগ পায়। এমন কি কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ও প্রগতিশীল গোষ্ঠী আসন্ন নির্বাচন ও মন্ত্রিত্বে অংশ গ্রহণের জন্য কংগ্রেসের মধ্যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। বলা বাহুল্য, দীর্ঘকাল থেকেই কংগ্রেসের এই দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কংগ্রেসের বামপন্থী ও প্রগতিশীল সংগ্রামী শক্তির সংগ্রাম চলে আসছিল। যাই-ই হোক, স্থির হয় কংগ্রেসের আসন্ন লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে এই সব বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই তখন ইউরোপে। কমলা নেহেরুর চিকিৎসা উপলক্ষে জওহরলাল ইউরোপে এসেছিলেন। এই সময়ই তিনি আসন্ন লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর বহু আলোচনা ও পরামর্শ হয়। কংগ্রেসের আশু কর্তব্য হিসাবে সুভাষচন্দ্র তাঁকে বার বার দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবার জন্য পরামর্শ দেন, প্রথমতঃ দপ্তর বা মন্ত্রিত্বগ্রহণকে সর্বতোভাবে বাধা দিতে হবে, দ্বিতীয়তঃ ওয়ার্কিং কমিটির সংগঠনকে প্রশস্ত ও উদার করে

তুলতে হবে যাতে করে প্রগতিশীল ও সংগ্রামী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা প্রয়োজনীয় শক্তি নিয়ে কংগ্রেসের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র একা নেহেরুর শক্তিতে খুব ভরসা করতে পারলেন না। জওহরলালের সঙ্গে পরামর্শ করেই তিনি এক প্রেস-বিবৃতিতে ঘোষণা করে দিলেন, আসন্ন লক্ষ্মৌ-কংগ্রেসে যোগদান করবার জন্য তিনি দেশে রওনা হচ্ছেন। যাত্রার ব্যবস্থা সব ঠিক। এমন সময় ভিয়েনার ব্রিটিশ কন্সাল তাঁকে এই মর্মে সতর্ক করে দিলেন যে, তিনি দেশে ফিরে যাবার চেষ্টা করলে সেখানে পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। সুভাষচন্দ্র তা অগ্রাহ্য করেই দেশে রওনা হলেন।

এদিকে কমলা নেহরুর মৃত্যুর কিছুদিন পরই জওহরলাল বিমান যোগে দেশে ফিরে আসেন (১০ই মার্চ ১৯৩৬)। তিনি আসন্ন লক্ষ্মৌ-কংগ্রেসের প্রস্তুতির কাজে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তার কয়েক দিন পরেই ওয়ার্কিং কমিটি ও সাব্‌জেক্ট কমিটির মিটিং শুরু হবার কথা। ৮ই এপ্রিল জওহরলাল ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা লক্ষ্মৌ-এ মতিনগরে এসে পৌঁছলেন। ঐ দিনই সুভাষচন্দ্র জাহাজ থেকে বোম্বাই বন্দরে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তাঁকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনে গ্রেপ্তার করে। কিছুদিন পর তাঁকে কার্সিয়াঙে শরৎ বসুর বাড়ীতে অন্তরীণ করে রাখা হয় (২০শে মে '৩৬)।

লক্ষ্মৌ-কংগ্রেসে জওহরলাল কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল রাজনীতির সূচনা করবার চেষ্টা করলেন। সভাপতির অভিভাষণে একদিকে যেমন সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শের জন্য গুরুত্ব দিলেন অপরদিকে তেমনি যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনে দেশকে সামিল হবার আহ্বান জানালেন। কংগ্রেসে একটি বৈদেশিক বিভাগ খুলবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, লক্ষ্মৌ-কংগ্রেসে আসন্ন প্রাদেশিক নির্বাচনগুলিতে অংশ গ্রহণের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে তীব্র মত পার্থক্য হওয়ায় এ সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের সামনে দেশে গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা এবং

বন্দীমুক্তি সমস্যা বস্তুতঃ অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাই লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে বন্দী মুক্তি আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্য 'ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘ' (A.I. Civil Liberties Union) নামে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া সুভাষচন্দ্রের গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা করে ১০ই মে তাঁর মুক্তির দাবীতে সারা দেশে 'সুভাষ দিবস' পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে সারা দেশে—বিশেষ করে বাংলা দেশে প্রবল আন্দোলন চলতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। স্বভাবতঃই তিনি এ আন্দোলনে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের একেবারে সূচনা কাল থেকেই একদিকে যেমন তিনি ইংরেজের পৈশাচিক দমননীতির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করে এসেছেন অপর দিকে তেমনি দেশের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা করে এসেছেন। এসব কথা অন্যত্র আমারা বিস্তারিত তথ্য-সম্বলিত আলোচনা করেছি। তাই এ আহ্বানেও তিনি সাড়া না দিয়ে পারলেন না। ৮ই মে তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' মারফৎ এক বিবৃতিতে 'সুভাষ দিবস' উপলক্ষে এক মর্মস্পর্শী আবেদন জানালেন। বিবৃতিটি ছিল এই:

"অনেক দুঃখ অনেক নামে রূপে সমস্ত দেশ জুড়ে জমে উঠেছে। সে দুঃখ দরিদ্রের দুঃখ, অক্ষমের দুঃখ, তার মধ্যে কেবলি আছে শোচনীয়তা। এমন কিছু নেই যা আজকের দিনে পৃথিবীর বড়ো বড়ো সমস্যার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে।

"জটিল অর্থনৈতিক কারণে অন্য দেশে অর্ধাশন একটা অনভ্যস্ত বড়ো সংখ্যায় পৌঁছিবামাত্র বহু ক্ষমতাশীল চিন্তাশীল হৃদয়বান মানুষের দিন ও রাত্রিকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। কর্ম অভাবে অন্ন অভাব অনিবার্য হবেই, এ-কথা সে-সব দেশে নিঃশব্দে স্বীকৃত হয় নি। সে দেশের মানুষ পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকবার অধিকারী, উপবাসের কৃশ-মূর্তি দেখা দেবা মাত্র এ কথাটা গর্জিত হয়ে উঠেছে সেখানে। সে দেশে মানুষের মূল্য আছে।

"আমাদের দেশে অর্ধাশন অনশন দেশেকালে পরিব্যাপ্ত। তার বেদনা ঘরে ঘরে। কিন্তু ক্রন্দন ধ্বনি ঘরের বাইরে পৌঁছবার মতো কণ্ঠ দেশের নেই। আমাদেরও যে বাঁচতে হবে এমন দাবী নেই মানব সমাজের কাছে। পিপাসার জল নেই, অন্ন নেই, আরোগ্যের ব্যবস্থা নেই। মরে যাচ্ছি দ্রুত বেগে, বেঁচে থাকছি আধমারা হয়ে, এর প্রতিকার তো নেই-ই, যথেষ্ট পরিমাণে পরিতাপ নেই মানবের মনে।

"সাংঘাতিক রোগের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হয়ে চলল চারদিকে। নূতন ও পুরাতন মূর্তিতে মারী জীর্ণ করছে সমস্ত দেশের অস্থিমজ্জা, মনকে করছে নিশ্চেষ্ট, আশা ভরসা মিলিয়ে দিচ্ছে ধুলোয়। এর উপরে নিরক্ষরতায় মূর্খতায় এখানে মানুষের মূল্য এসে ঠেকেছে শূন্যে। জগতে এর উদ্বেগ অতি ক্ষীণ, এর নালিশের কোনো জায়গা নেই।

"এই সঙ্গেই এই বাংলা দেশে হাজার হাজার নরনারী আজ বন্দিশালায়। বিচারের দাবী করচিই, সেই দাবীর পিছনে দুঃখ আছে দুঃসহ, কিন্তু তার জোর নেই। বিনা বিচারে যারা দণ্ড ভোগ করছে অপরিমিত কাল ধরে, তাদের মধ্যে দেশের যে বেদনা আছে, তার চেয়ে অনেক বড়ো আছে দেশের অসম্মান। বিচারের অধিকারে আছে মনুষ্যত্বের সম্মান। তার থেকে আমরা বঞ্চিত। কেননা আমরা বিশ্বের গোচর নই, আমাদের মূল্য নেই। এই দেশব্যাপী অভিসম্পাতের আক্রমণ হতে যদি কোনো দিন নিজেদের রক্ষা করতে পারি তা হলেই আমাদের প্রত্যেক অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হবে দেশ-বিদেশে।

"সেদিনের পূর্বে ব্যর্থ বিলাপ ঘোষণা করবার জন্যে সম্পাদকের আমন্ত্রণ স্বীকার করবার উৎসাহ আমার নাই।"

ইতি—২৬শে বৈশাখ, ১৩৪৩

[আনন্দবাজার পত্রিকা—২৯শে বৈশাখ ১৩৪৩ ।। ১২ই মে, ১৯৩৬]

'সুভাষ দিবস' উপলক্ষে ঐ দিন সুভাষচন্দ্র ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে কলকাতায় গড়ের মাঠে বিরাট সভা ও শোভাযাত্রা হয়।

ইতিমধ্যে জওহরলাল এক পত্রে (২২শে এপ্রিল, ১৯৩৬) ভারতীয় ব্যক্তি

স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠনের পরিকল্পনা সম্পর্কে কবিকে বিস্তারিত সব লিখলেন। সারা দেশেই এই ব্যাপারে বিপুল সাড়া পাওয়া গেল। এই সঙ্ঘের সাংগঠনিক প্রস্তুতিতে জওহরলাল সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। ৮ই ও ২১শে জুলাই তিনি কবিকে এক পত্রে Indian Civil Liberties Union-এর 'অনারারি প্রেসিডেন্ট্' হবার অনুরোধ জানালেন। কবি সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে জওহরলালকে জবাব দিলেন। সরোজিনী নাইডু হলেন এই কমিটির চেয়ারম্যান (আগষ্ট ১৯৩৬)। শুরু থেকেই কমিটি রাজবন্দীদের মুক্তি এবং দেশে গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারকে সম্প্রসারিত করার জন্য প্রবল আন্দোলন করতে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ কমিটির পক্ষ থেকে পর পর কয়েকটি বিবৃতি দেন।

১৯৩৬ সালে ডিসেম্বরের শেষভাগে ফৈজপুর কংগ্রেসে পাকাপাকিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, নূতন শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যেই প্রদেশগুলিতে আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করবে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্নে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের সঙ্গে বামপন্থী প্রগতিশীলদের তীব্র মত পার্থক্য হওয়ায় চূড়ান্ত ভাবে ঐ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আসা গেল না। ফৈজপুর কংগ্রেসে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—এই কংগ্রেসে স্পেনে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের নিন্দা করে এবং সমগ্রভাবে যুদ্ধ ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের তীব্র ভাষায় বিনিপাত করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সময়ই League Against Fascism & War-এর ভারতীয় শাখা কমিটি গঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। কবি স্পেনে ফ্যাসিবাদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের তীব্র নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে তার প্রতিরোধে সকলকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবার উদাত্ত আহ্বান জানালেন। এক কথায় ভারতে এই সময় যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও ফাসি-বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে।

এদিকে ফৈজপুর কংগ্রেসের পরেই সমস্ত প্রদেশেই কংগ্রের নেতা ও কর্মীরা নির্বাচনী প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, নির্বাচনী ইস্তাহারে ও প্রচারকার্যে সমস্ত দমনমূলক আইনের নাকচ ও রাজবন্দীদের মুক্তি

দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই নির্বাচন শেষ হয়। কংগ্রেস প্রার্থীরা বিপুল সংখ্যায় জয়লাভ করলেন। ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৬টি প্রদেশে কংগ্রেস একক সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসেবে জয়লাভ করে। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে কিনা স্থির করবার জন্যে ১৭ই মার্চ দিল্লীতে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শুরু হয়। ঐ দিনই সন্ধ্যায় অসুস্থ অবস্থায়ই কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে গভর্ণমেন্ট সুভাষচন্দ্রকে বিনাসর্তে মুক্তি দিলেন। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ তাঁকে কার্সিয়াং থেকে অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে এসে কলকাতায় মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাধীনে রাখা হয়েছিল। কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির পক্ষে তাঁর মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ ও অভিনন্দন জানিয়ে এক তারবার্তা পাঠিয়ে তাঁকে দিল্লী আসবার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখনও অসুস্থ। ২০শে মার্চ দিল্লীতে জাতীয় সম্মেলনে রাজনৈতিক বন্দীদের সাহায্য ও মুক্তি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করবার জন্য কার্যকরী পন্থা গ্রহণের আলোচনা হয়। শরৎচন্দ্র বসু এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। সুভাষচন্দ্রের মুক্তির সংবাদে তিনি 'এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসে'র প্রতিনিধির কাছে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে বলেন যে, এতদিন পরে সরকার তাঁর সম্পর্কে সুবিচার করলেন। ঐদিনই দিল্লীর রাজনৈতিক বন্দী সাহায্য সম্মেলনে তিনি একটি বাণী পাঠালেন।

[দ্রঃ *Amrita Bazar Patrika*—20 March 1937]

এর কয়েকদিন পরেই—৬ই এপ্রিল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিশাল জনসভায় সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানান হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কবি শান্তিনিকেতন থেকেই সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশে সম্বর্ধনা জানিয়ে এক বাণী পাঠিয়েছিলেন। সেটি এই :

"সমগ্র জাতির কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমি সুভাষকে অভিনন্দিত করিতেছি।"

অসুস্থ শরীরেই সুভাষচন্দ্র এই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তার কয়েকদিন পর—২৫শে এপ্রিল সুভাষচন্দ্র চিকিৎসা ও বায়ুপরিবর্তনের জন্য ডালহৌসি যাত্রা করেন। সেখানে তিনি ডঃ ধরমবীরের চিকিৎসাধীনে থাকলেন।

এই সময় কলকাতায় বাংলা কংগ্রেসের সুভাষচন্দ্রের অনুগামীদের উদ্যোগে সুভাষচন্দ্রের হাতে এক লক্ষ টাকার একটি তহবিল তুলে দেবার উদ্দেশ্যে 'সুভাষ কংগ্রেস ফাণ্ড' গঠিত হয়। কলকাতার একটি স্থায়ী কংগ্রেস-ভবন এবং কংগ্রেসের কাজ কর্মের জন্যই এই তহবিল তুলবার কথা ঘোষণা করে দেশবাসীকে অকাতরে সাহায্য করবার আবেদন জানান হয়। এই কমিটির অনারারী সেক্রেটারী নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র কমিটির পক্ষে এক বিবৃতিতে এই আবেদন জানান (২৪শে এপ্রিল)। ৪ঠা মে জওহরলাল বর্মা যাবার পথে কলকাতায় এসে সব শুনে এক বিবৃতিতে 'সুভাষ কংগ্রেস ফাণ্ড'-এ দেশবাসীকে মুক্ত হস্তে সাহায্য করবার আবেদন জানালেন।

এর কয়েক মাস পরেই—৭ই জুলাই ওয়ার্কিং কমিটি কয়েকটি সর্তসাপেক্ষে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ অনুমোদন করলে পর কংগ্রেস ৬টি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গঠন করেন। এর পর কংগ্রেস-মন্ত্রিত্বের প্রধান কাজই হল, রাজবন্দীদের মুক্তিদান। অল্পকাল পরেই ঐ-সব প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া শুরু হয়। কিন্তু বাংলাদেশে তখন ফজলুল হক-নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিত্ব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব। কিন্তু বন্দীমুক্তির প্রশ্নে বাংলা সরকারের এতটুকু উদ্যোগ দেখা গেল না। জুলাইয়ের শেষভাগে (২৪শে জুলাই থেকে) আন্দামান সেলুলার দ্বীপে প্রায় দুই শত রাজনৈতিক বন্দী তাঁদের দেশে ফিরে পাঠাবার ও অন্যান্য দাবীতে অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন। আন্দমান-বন্দীদের দাবীগুলি সংক্ষেপে ছিল এই: (১) সমস্ত অন্তরীণ, রাজবন্দী এবং অন্যান্য দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। (২) সমস্ত দমনমূলক আইন রদ এবং অন্তরীণ করার সমস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা। (৩) আন্দমান-বন্দীদের দেশে ফিরিয়া আনা এবং ভবিষ্যতে কোন বন্দীকে সেখানে পাঠান

চলবে না। (৪) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের "বি" ক্লাস অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করতে হবে।

এই সময় কলকাতায় আন্দামান-বন্দীদের দেশে ফিরিয়া আনা ও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে প্রবল বিক্ষোভ আন্দোলন চলতে থাকে। সুভাষচন্দ্র অসুস্থ অবস্থায় ডালহৌসি থেকে পর পর কয়েকটি বিবৃতিতে এই আন্দোলনকে জোরদার করবার আবেদন জানালেন। ২৮শে জুলাই তিনি *Statesman* পত্রিকায় এক খোলা চিঠিতে খাজা-হক্ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাঁদের হুঁসিয়ার করে দিলেন যে, আন্দামান-বন্দীরা ও রাজবন্দীরা কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুক্তি চাইবেন না।

এদিকে কলকাতায় তখন আন্দামান-বন্দীদের সমর্থনে প্রবল আন্দোলন চলতে থাকে। ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৪ (২রা আগষ্ট, ১৯৩৭) সন্ধ্যায় কলকাতার টাউন হলে বন্দীমুক্তি ও আন্দামান বন্দীদের দাবীর সমর্থনে এক বিরাট জনসভা হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার পূর্বে বিরাট এক মিছিল কলকাতায় কয়েকটি রাস্তায় আন্দামান-বন্দীদের মুক্তির ধ্বনি দিতে দিতে টাউন হলে এসে সমবেত হয়। সভায় তিল ধারণের স্থান ছিল না। আবেগকম্পিত কণ্ঠে কবি তাঁর ভাষণ পাঠ করলেন,

"রাজনৈতিক বন্দীরা দাবী করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আন্দামান হইতে ফিরাইয়া আনা হউক। এই দাবী ন্যায্য এবং সামান্য। এই দেশে গভর্ণমেন্ট জনসাধারণের নিকট দায়ী নহেন; সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে সহস্র মাইল দূরবর্তী এক দ্বীপে নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত যে ব্যবহার করা হয়, সেই সম্পর্কে দেশবাসীর মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ হইতে পারে এবং তাহারা রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ভারতবর্ষে রাখিবার দাবী করিতে পারে,—তাঁহারা দেশে থাকিলে জনমত ভারতীয় কারাজীবনের তীব্র ক্লেশ অন্তত কিয়দংশে হ্রাস করিতে পারে। প্রকাশ, বন্দীদিগকে আন্দামান হইতে দেশে ফিরাইয়া আনা হইবে কি না, তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব ভারত গভর্ণমেন্ট নিজ স্কন্ধ হইতে বাংলা গভর্ণমেন্টের স্কন্ধে স্থানান্তরিত

করিয়াছেন। অধিকন্তু ভারত গভর্ণমেন্ট বন্দীদের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া কারণ দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারা সমস্ত বন্দীর যুক্ত আবেদন বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহেন। শাসনযন্ত্রের হৃদয়হীন অনমনীয়তার নিকট উহার ন্যায়বোধ ও কারুণ্যধর্ম আর একবার পরাজয় মানিল।

"ভারতবর্ষে যে-সকল প্রদেশে গণপ্রতিনিধিগণ শাসনরশ্মি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বিনাসর্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কোচক সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

"শুধু বাংলা দেশেই শত শত যুবক এখনও বিনাবিচারে আবদ্ধ আছে; বাংলা দেশে প্রায়ই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে, শাসকবর্গ জনমতের কোনই তোয়াক্কা রাখেন না; বাংলায় ব্যক্তিস্বাধীনতা মরুভূমির মরীচিকার মতই অলীক।

"আমরা জানি, ইতিপূর্বে আর একবার আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তিন জন বন্দীর মৃত্যু হইয়াছিল। অনশনকারী বন্দীদিগকে বলপূর্বক খাওয়াইবার যে নিষ্ঠুর নীতি তাহাই ঐ তিন জনের মধ্যে দুই জনের মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ। আমরা আবার উহা অপেক্ষা অধিক বন্দীকে ঐরূপ শোচনীয়ভাবে মরিতে দিব কি? বাংলা গভর্ণমেন্ট দিবেন কি?

"বাংলার গভর্ণমেন্টের নিকট আমার অনুরোধ তাঁহারাও বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের গভর্ণমেন্টের ন্যায় পন্থা অবলম্বন করিয়া উদারতা ও সহানুভূতির সহিত রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে বিবেচনা করুন।

"জগতের অধিকাংশ দেশের দণ্ডবিধিতে যে শাস্তিদানের নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত আছে, উহাই মানব সভ্যতার কলঙ্ক; তাহার উপর আবার সম্প্রতি পাশ্চাত্যের কোনও কোনও দেশে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের এক উদ্দাম প্রবৃত্তি সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের গভর্ণমেন্টের মধ্যেও এই ফ্যাসিস্ট নীতি কতকটা সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে। এই নীতি আইন এবং মানব স্বাধীনতার

ন্যায্য দাবীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। শত শত বিপন্ন পরিবার হইতে উত্থিত নৈরাশ্যের উষ্ণশ্বাস এই ভাগ্যহত প্রদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; এই প্রদেশের তরুণ-তরুণীরা অনির্দিষ্টকাল বিনাবিচারে আবদ্ধ থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে। আইনের যে আমূল পরিবর্তন করা আবশ্যক, তাহা সত্য; কিন্তু আমার দেশবাসী আমাকে যে তাঁহাদের সহিত আইনের আমূল পরিবর্তনের দাবী করিতে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা নহে, উহার কঠোরতা হ্রাসের দাবী করিতেই অনুরোধ করিয়াছেন।

"ইউরোপের অন্যান্য দেশের গভর্ণমেন্ট বন্দীদিগকে ডেভিল দ্বীপ, লিপারী দ্বীপ বন্দীনিবাস, অন্যান্য বিশেষভাবে রচিত নরকপুরীতে প্রেরণ করিয়া মানবপীড়নের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ড বন্দীদিগকে তাহাদের মাতৃভূমি হইতে ঐরূপ কোনও কুখ্যাত স্থানে প্রেরণ করিয়া তাহাদের দুঃখভার বৃদ্ধি করে না। তাহাদিগকে শুধু পরাধীন জাতিদের ক্ষেত্রে তাহাদের নিজেদের নিয়মভঙ্গ করিতে দেখিয়া আমরা যখন আতঙ্কিত হই, তখন এই বৈষম্যে আমাদের সকলের হৃদয় আহত হয়। আমার দেশের নামে আমি ইহাই প্রতিবাদ করিতেছি।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা—১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৪ ॥ ৩রা আগষ্ট, ১৯৩৭]

সভার শেষে আন্দামান বন্দীদের দাবীর সমর্থনে আন্দোলনকে জোরদার করবার জন্য 'আন্দামান রাজনৈতিক বন্দী সাহায্য কমিটি' গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই কমিটির সভাপতি হন। কবি স্বয়ং আন্দামান বন্দীদের অনশন ত্যাগ করবার অনুরোধ জানিয়ে তার করলেন।

এরপর আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে দেশে আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। ১৪ই আগষ্ট (১৯৩৭) ঐ কমিটির পক্ষ থেকে 'আন্দামান দিবস' পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়। ঐ দিনই শান্তিনিকেতনে এক জনসভায় কবি আন্দামানে নির্বাসন নীতির তীব্র নিন্দা করে হক্-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন,

"কারাগার থেকে অন্তিম মুহূর্তে যাদের মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়া

হচ্ছে যক্ষা রোগে মরবার জন্যে, তারা সকলেই এই বিলম্বিত মৃত্যুযন্ত্রণা-ভোগের নিশ্চিত যোগ্য—এমন কথা বিনা বিচারে তোমরা কি নিঃসংশয়ে বলতে পার, হে আমার দেশবাসীর স্বদেশী প্রতিনিধি।...

"পূর্বেই বলেছি দণ্ডপ্রয়োগের অতিকৃত রূপকে আমি বর্বরতা বলি। আমি কোনো পক্ষেই হিংসার মূল্য হিংস্রতা দিয়ে দিতে চাই নে; কিন্তু সমাজ ও রাজার তরফ থেকে ধিক্কারের দ্বারা বিচারের প্রয়োজন আছে, উভয় পক্ষেই। নির্জন কারাকক্ষবাস বা আন্দামানে নির্বাসন আমি কোনো প্রকার অপরাধীর জন্য সমর্থন করি নে, যাঁরা দেশবাসীর প্রতিনিধি পদে উচ্চ শাসনমঞ্চে সমাসীন তাঁরা যদি করেন আমি নীচে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতিবাদ করব।"

[রবীন্দ্ররচনাবলী—২৪শ খণ্ড ॥ পৃঃ ৪৬৪]

ক্রমে এই আন্দোলন তীব্র ও ব্যাপকতর হতে থাকে। কিন্তু বন্দীমুক্তি কিংবা আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বাংলা সরকারের বিশেষ কোন উদ্যোগ দেখা গেল না। এদিকে কবি শান্তিনিকেতনে ক্রমেই অশান্ত ও অধৈর্য হয়ে উঠলেন। ১৪ই আগষ্ট অমিয় চক্রবর্তীকে কবি লাটসাহেব এণ্ডারসনের কাছে পাঠান। যাতে করে তাড়াতাড়ি এ-ব্যাপারে একটা কিছু ফয়সলা হয়। কিন্তু অনশনরত বন্দীদের অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে থাকে। কবি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আন্দামানে বন্দীদের অনশন স্থগিত রাখার আবেদন জানিয়ে পুনরায় এক তার করলেন (১৬ই আগষ্ট, '৩৭): "Earnestly appeal to you to call off hunger-strike. Your case taken up by the whole nation. Feel restoration of atmosphere favourable for discussion will greatly be helpful."

২০শে আগষ্ট তিনি গান্ধীজী ও জওহরলালকে যুগপৎ তার করে এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করবার আবেদন জানালেন।

"I have wired to Andamans' prisoners to give up hunger-

strike. Their lives must be saved. Hope you and Jawaharlal will exert utmost influence."

টেলিগ্রাম পেয়েই গান্ধীজী জবাবে কবিকে তার করলেন, "Pray depend upon my doing utmost to end Andaman crisis."

জওহরলালও অনুরূপ মর্মে কবিকে আশ্বাস দিয়ে জবাবী তার করলেন। এরপরই গান্ধীজীর সঙ্গে (বড়লাটের মাধ্যমে) আন্দামান বন্দীদের সঙ্গে তার বিনিময় শুরু হয়। আন্দামান বন্দীদের অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর অনুরোধে অনশন স্থগিত রেখে জানিয়ে দিলেন, তাঁরা আর সন্ত্রাসবাদ ও হিংসার নীতিতে বিশ্বাস করেন না।

এরপর আর বাংলা সরকারের অন্য কোন অজুহাত থাকল না। ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রথম দফায় আন্দামান বন্দীদের ৭৪ জনকে কলকাতায় আনা হল। তারপর আস্তে আস্তে কয়েক দফায় সমস্ত আন্দামান বন্দীদের ফিরিয়ে এনে আলিপুর ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলখানায় রাখা হল।

ইতিমধ্যে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি নিয়ে দেশে খুবই উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক ও আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। অবশ্য এর পাশাপাশি রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলনও অত্যন্ত প্রবল ও ব্যাপক আকার ধারণ করে।

'বন্দে মাতরম্' সংগীত-বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর থেকে দেশে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধটি ক্রমশঃই অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করতে থাকে,—বিশেষ করে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে তখন ফজলুল হক্ মন্ত্রিত্ব। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এখানে এতদূর তীব্র হল যে, বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িকতাকে টেনে আনা হল। এই বিরোধ আরও তীব্র হল, 'বন্দে মাতরম্' সংগীত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন 'শ্রী' ও 'পদ্ম' নিয়ে।

স্মরণ রাখা দরকার, ১৮৯৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম 'বন্দে মাতরম্' গানটি সুর সংযোগ করে গিয়েছিলেন। তারপর বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে এই গানটি অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং তারপর থেকে এতকাল এটি কংগ্রেসের সভা-সমিতিতে গাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ এই সংগীতটিকে উপলক্ষ করে খুবই বিতর্ক উঠল,—এটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া যাবে কিনা। মুসলমানদের মূল বক্তব্য এই যে, এই গানে সুস্পষ্টভাবে হিন্দু পৌত্তলিক দেবী দুর্গার স্তব আছে (যথা—"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী" ইত্যাদি); দ্বিতীয়তঃ এই গান বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এ বর্ণিত মুসলিম বিদ্বেষের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এই কারণেই এটি জাতীয় সংগীত হতে পারে না। অপরপক্ষে বাঙালি হিন্দুদের মূল বক্তব্য হল এই যে, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ও গানটি অর্ধশতাব্দীকাল ধরে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করেছে এবং এরই জন্য সহস্র সহস্র মানুষ এতকাল কারাবরণ ও দুঃখ-নির্যাতন ভোগ করেছে। এ গান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই এই গানটিই ভারতের জাতীয় সংগীত হিসাবে মর্যাদা পাবার অধিকারী। এ গানের ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে যখন এতকাল কোনো কথা উঠে নি তখন এখনই তা উঠবে কেন। মোটকথা, হিন্দু-

মুসলমান সাম্প্রদায়িক দলগুলি কোনপক্ষই অপর পক্ষের সেন্টিমেন্ট বা কথাটা বুঝবার ব্যাগ্রতা দেখালেন না। এই পরিস্থিতিতে গান্ধী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা খুবই বিব্রত বোধ করলেন। কংগ্রেস থেকে বলা হল, ওয়ার্কিং কমিটি ও এ. আই. সি. সি-র আগামী কলকাতা-অধিবেশনে এই সম্পর্কে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এই সব সংবাদে তিনি খুবই মর্মাহত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কবি তাঁর যৌবনকাল থেকেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ও ঐক্যের জন্য সারা জীবনই আকুল আবেদন জানিয়ে চলেছিলেন। আর যে যে কারণে সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিদ্বেষ প্ররোচিত হতে পারে সেগুলি পরিহার করবার জন্য উভয় সম্প্রদায়কেই পরামর্শ ও উপদেশ দিতেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনকালে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের (প্রথম অংশটি) সুর সংযোজন করে কলকাতা কংগ্রেসে (১৮৯৬) গেয়েছিলেন, সত্যি কথা। কিন্তু সমগ্র এই গানটির অন্তর্নিহিত ভাবটি কোনদিনই তাঁকে বিশেষ আকর্ষণ করতে পারে নি, একথা কবি স্বয়ং নিজমুখেই বলেছেন। একথাও সত্যি বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী-আন্দোলনের যুগে কবি স্বয়ং 'বাংলার মাটি বাংলার জল' 'সার্থক জনম আমার,' 'ও আমার দেশের মাটি' প্রভৃতি স্বদেশ-প্রেমমূলক সংগীত রচনা করেছিলেন—ভাবের দিক থেকে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের (অবশ্য শেষাংশটি বাদ দিয়ে) সঙ্গে যেগুলির খুব বেশি একটা পার্থক্য ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে কবিমানসে বিশ্বমানবিকতা ও আন্তর্জাতিকতাবোধের উন্মেষের সাথে সাথে ক্রমে ঐ ধরনের স্বদেশ-প্রেমমূলক সংগীত বা কবিতা রচনা থেকে তিনি বিরত থেকেছেন। বিশেষতঃ 'বন্দে মাতরম্' সংগীত ও রাজনৈতিক শ্লোগানকে তিনি যে কিছুতেই অন্তরের সঙ্গে মেনে নিতে পারছিলেন না— একথা তিনি প্রকাশ্য বিবৃতিতে না-হলেও চিঠিপত্রে বহুবার উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ই তিনি ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্রে পরিণত করবার জন্য বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা করেছিলেন। এই সময়ই আমেরিকা থেকে একটি পত্রে তিনি রথীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন,

"আমার বাণীর পথরোধ করবে এমন সাধ্য কারো নেই। সমস্ত পৃথিবীকে

আমি আপন দেশ বলে বরণ করে নিয়েচি।...পৃথিবী থেকে যাবার আগে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমার আপন সম্বন্ধ অনুভব ও স্বীকার করে যেতে পারলুম এইটেতেই আমি আমার জীবন সার্থক বলে জানচি। আমাদের বাংলাদেশের কোণে একটা বিশ্বপৃথিবীর হাওয়া উঠেচে এইটে আমাদের সকলের অনুভব করা উচিত।...

..."বাংলা দেশের চিত্ত সর্বকালের সর্বদেশে প্রসারিত হোক্ বাংলাদেশের বাণী সর্বজাতি সর্বমানবের বাণী হোক্। আমাদের বন্দে মাতরম্ মন্ত্র বাংলা দেশের বন্দনামন্ত্র নয়—এ হচ্ছে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবীযুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে। কংগ্রেস কন্‌ফারেন্সে তালপাতার ভেঁপু যারা বাজিয়ে বেড়াচ্চে তারা কোন মতেই বুঝতে পারবে না আমাদের দেশের সত্যকার সাধনা কি।...আমরা সর্বদেশের বৈরাগী হব...আমরা মানব-বিধাতার রাজপথে মহামানবের গান গেয়ে বেড়াব।...মহাবিশ্বের পথকেই আমরা দেশ বলে গ্রহণ করব।"...

[চিঠিপত্র—দ্বিতীয় খণ্ড ॥ পৃঃ ৫৮-৬২]

এর কয়েক বৎসর পরেই দেশে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। বলা বাহুল্য, এই আন্দোলনের সুরে কবি ঠিক সায় দিতে পারেন নি। এই কারণে সেদিন 'বন্দে মাতরম্'-উপাসকরা কবির উদ্দেশে তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপ বর্ষণ করতে ছাড়ে নি। এই সময়ই কবি তাঁর মানসিক যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করে প্রমথ চৌধুরীকে এক পত্রে লিখলেন (১৮ই কার্তিক ১৩২৮),

..."দেশের কর্তা ব্যক্তিদের কাছে থেকে হুকুম আস্‌চে যে 'সময় খারাপ অতএব বাঁশি রাখ, লাঠি ধর।' যদি তা করি তাহলে কর্তারা খুশি হবেন, কিন্তু আমার এক বাঁশিওয়ালা মিতা আছেন কর্তাদের অনেক উপরে। তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন। কর্তরা বলেন, 'তিনি আবার কে ? এক ত আছে বন্দে মাতরম্'। তাঁদের গড় করে আমাকে আজ বলতে হচ্ছে— 'আমায় বন্দে মাতরম্ ভুলিয়েচেন ঐ তিনি। আমি দেশছাড়া ঘরছাড়া দলে। আমি ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডাদের যদি আজ মানতে বসি তাহলে আমার

জাত যাবে।' কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডারা শুধু পাণ্ডা নয় তারা গুণ্ডা—অতএব মার খেতে হবে। তাই সই। মার শুরু হয়েচে। ......মরার ভয়ে চাঁদসদাগর শিবকে ছেড়ে সাপের দেবতার কাছে হার মেনেছিল, সেইখানেই তার গাল ময়ে গেল। আমি কিন্তু শিবকে ছাড়ব না। আমার শিব সকল জগতের—কিন্তু সাপের দেবতার জায়গা হচ্ছে গর্তের ভিতরে। সেই গর্তের মুখে দুধকলা জোগাবার বায়না যাঁরা নিয়েচেন তাঁরা যে-ফলের লোভ করেন আমি সেই ফলকে বড় মনে করি নে। আমার মন ম্যাপের গর্তের মধ্যে আর কোনদিন দেবতা খুঁজবে না। বুঝতে পেরেচি এই নিয়ে ঘরে পরে আমাকে ত্যাগ করবে। আমি ঠিক করেচি যার যা মনের সাধ মিটিয়ে নিক্, আমি আর কথা কইব না।"

[চিঠিপত্র—পঞ্চম খণ্ড॥ পত্র ৮৭ পৃঃ ২৭০]

এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, কবি 'বন্দে মাতরম্'-উপাসকদের স্বাদেশিকতাকে কোনমতেই সমর্থন করতে পারছিলেন না। শুধু তাই নয়,— 'বন্দে মাতরম্' শ্লোগান বা ধ্বনিকেও তিনি আন্তরিক সমর্থন করতে পারেন নি। কবি তাঁর সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশে যে বাণী দেন তাতে তিনি 'বন্দে মাতরম'-এর পরিবর্তে 'বন্দে ভ্রাতরম্' শ্লোগান গ্রহণ করবার আবেদন জানান (দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা—২৬শে বৈশাখ, ১৩৩৮)। এমনি আরও উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।

যাই হোক, 'বন্দে মাতরম্'-সংগীত-বিতর্কের ব্যাপারটি কবি খুব বাস্তব ও ভাবাবেগহীন দৃষ্টিতে বিচার করবার চেষ্টা করলেন। অবশ্য তখনই তিনি এ-সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে চাইলেন না। তাছাড়া কবি তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি। ১১ই অক্টোবর (১৯৩৭) তিনি চিকিৎসার জন্য কলকাতা যাত্রা করেন।

কলকাতায় ওয়ার্কিং কমিটিরও এ. আই. সি. সি-র অধিবেশনে এই জাতীয় সংগীত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা। এই উপলক্ষে বাংলাদেশের অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাই 'বন্দে মাতরম্' সংগীতকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে প্রবল আন্দোলন চালালেন। এমন কি 'প্রবাসী' সম্পাদক

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও এর সম্পর্কে প্রবাসী, ও *Modern Review*-তে লিখতে থাকেন। তিনি গান্ধীজীকেও এ সম্পর্কে দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় গিয়ে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বরানগরের বাড়িতে উঠেছিলেন। তিনি কলকাতার উত্তেজনার কথা সবই শুনলেন কিন্তু তখনই তিনি সে-সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে চাইলেন না। কিন্তু কবি কোন মন্তব্য না-করলেও এই সময় কৃষ্ণ কৃপালানী 'Bande Mataram and Indian Nationalism' নামে *Visva-Bharati News*-এ (October, 1937) একটি প্রবন্ধ লিখলেন। এই প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম ছিল এই যে, কংগ্রেসের অহিংসা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' গানটির ভাবের কোন সংগতি নেই এবং এই কারণেই এটি সর্বভারতীয় সংগীত হতে পারে না। এটি অবশ্য কৃষ্ণ কৃপালানীর ব্যক্তিগত অভিমত এবং সে-কথা তিনি জওহরলালকে খুলে লিখবেন, এইটেই স্থির হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র তখন কার্সিয়াঙে। কিছুদিন পূর্বে তিনি ডালহৌসি থেকে কলকাতায় ফিরে (৭ই অক্টোবর) সবই শুনলেন :—কিন্তু তখনই এ-সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে চাইলেন না। ৯ই অক্টোবর তিনি কার্সিয়াঙে যান। এই সময় তিনি কবিকে এই সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত পরিষ্কার লিখে জানাবার অনুরোধ জানান। কবি তার জবাবে সুভাষচন্দ্রকে যে পত্রটি লেখেন, সেটি যথাযথভাবে এখানে উদ্ধৃত করা হল :

সুভাষচন্দ্র বসু

Giddapahar : Kurseong D. H. Ry.

ওঁ

গুপ্তনিবাস

বেলঘরিয়া

সুহৃদ্বর,

বন্দে মাতরম্ গানের কেন্দ্রস্থলে আছে দুর্গার স্তব এ কথা এতই সুস্পষ্ট যে এ নিয়ে তর্ক চলে না। অবশ্য বঙ্কিম এই গানে বাংলা দেশের সঙ্গে

দুর্গাকে একাত্ম করে দেখিয়েছেন, কিন্তু স্বদেশের এই দশভুজামূর্তিরূপের যে পূজা সে কোনো মুসলমান স্বীকার করে নিতে পারে না। এবারে পূজা সংখ্যার বহু সাময়িক পত্রেই দুর্গাপূজার প্রসঙ্গে বন্দে মাতরম্ গানের শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করে দিয়েছে—সহজেই দুর্গার স্তব রূপে একে গ্রহণ করেছে। আনন্দমঠ উপন্যাসটি সাহিত্যের বই, তার মধ্যে এই গানের সুসংগতি আছে। কিন্তু যে রাষ্ট্রসভা ভারতবর্ষের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র সেখানে এ গান সর্বজনীনভাবে সংগত হোতেই পারে না। বাংলা দেশের একদল মুসলমানের মধ্যে যখন অযথা গোঁড়ামির জেদ দেখতে পাই তখন সেটা আমাদের পক্ষে অসহ্য হয়। তাদের অনুকরণ করে আমরাও যখন অন্যায় আব্দার নিয়ে জেদ ধরি তখন সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ এতে আমাদের পরাভব।

বন্দে মাতরম্ প্রবন্ধটি কৃষ্ণ কৃপালানীর লেখা। বিশ্বভারতীর কাগজে তিনি এটা প্রকাশ করবেন আমি জানতুম না। বিশ্বভারতীর সঙ্গে এই আলোচনার কোনো যোগ নেই। এই নিয়ে জওহরলালকে তিনি পত্র লিখবেন এই কথা ছিল।

এখনো ডাক্তারদের চিকিৎসাধীনে আছি।—নিষ্কৃতি পাই নি, শরীরও যথোচিত কর্মক্ষম হয় নি।

ইতি ১৯।১০।৩৭

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ

বাঙালি হিন্দুরা এই আলোচনা নিয়ে চঞ্চল হয়েছেন, কিন্তু ব্যাপারটি একলা হিন্দুর মধ্যে বদ্ধ নয়। উভয় পক্ষেই ক্ষোভ যেখানে প্রবল সেখানে অপক্ষপাত বিচারের প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রীয় সাধনায় আমাদের শান্তি চাই, ঐক্য চাই, শুভবুদ্ধি চাই—কোনো এক পক্ষের জিদকে দুর্দম করে হারজিতের অন্তহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাই নে। [পাণ্ডুলিপি—শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রসদন-এ রক্ষিত আছে]

বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্রকে এটি কবির ব্যক্তিগত পত্র। সন্দেহ নেই কবির এই যুক্তি ও বক্তব্য সুভাষচন্দ্র আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু একথা স্পষ্ট করে সেই উত্তেজনার মধ্যে বলতে গেলে বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যে কি প্রতিক্রিয়া হবে সে-কথা চিন্তা করেই সুভাষচন্দ্র সম্ভবতঃ এই বিতর্কে সম্পূর্ণ নীরব রইলেন। কলকাতায় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি তাতে মোটেই খুশী হন নি। কিন্তু সাংবাদিকদের দারুণ উৎকণ্ঠা, রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে নীরব কেন, তিনি কী বলেন? রথীন্দ্রনাথ সাংবাদিকদের পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, দেশের বিশিষ্ট নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না-হওয়া পর্যন্ত কবি এ-বিষয়ে কোনো বিবৃতি প্রচার করবেন না। তিনি আরও বলেন যে, 'বিশ্বভারতীর' পত্রিকায় কৃষ্ণ কৃপালানীর প্রবন্ধে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে, তা বিশ্বভারতী অথবা কবির মত নয় (দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা—৮ই কার্তিক, ১৩৪৪)। কৃষ্ণ কৃপালানীর প্রবন্ধটি অবশ্য বাংলা দেশের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির উষ্মা ও ক্ষোভের কারণ ঘটিয়েছিল। তার সমালোচনায় বাংলাদেশের একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা লিখলেন (২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৭), "ভারত জননীর হস্তে প্রহরণ থাকিলেই যদি কংগ্রেসের শুচিতা নষ্ট হয় তাহা হইলে কংগ্রেসী গভর্ণমেন্টের পুলিশ ও সৈন্যসামন্তের হস্তে লাঠি ও বন্দুকের পরিবর্তে 'টকলী' রাখাই সংগত। কিন্তু কানপুরে ও বোম্বাইয়ে ইতিমধ্যেই কংগ্রেসী গভর্ণমেন্টকে গুলিবর্ষণ করিতে হইয়াছে। আদর্শ হিসাবে আমরাও অহিংসার সমর্থন করি, কিন্তু শ্রীযুত কৃপালানীর মন্তব্যে যুক্তি অপেক্ষা মতলবই সুস্পষ্ট।"

প্রায় এক পক্ষকাল কার্সিয়াঙে থাকার পর ২৪শে অক্টোবর সুভাষচন্দ্র দার্জিলিঙ্ মেলে কলকাতায় ফিরলেন। পরদিন—২৫শে অক্টোবর সোমবার প্রাতে জওহরলাল ও কংগ্রেস সেক্রেটারী আচার্য কৃপালানী কলকাতায় এলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে শরৎ বসুর উড্‌বার্ন পার্কের বাড়িতে নিয়ে যান। ঐদিনই অপরাহ্নে জওহরলাল বেলঘরিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 'হিন্দু-মুসলমান' সমস্যা ও 'বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কে তিনি বেশ কিছুক্ষণ

আলোচনা করেন। পরদিন গান্ধীজী এলেন। গান্ধীজীকে দেখবার জন্ম হাওড়া স্টেশনে এতো ভিড় হয়েছিল যে, সুভাষচন্দ্র ভিড় এড়াবার জন্ম তাঁকে রামরাজাতলা স্টেশন থেকে নামিয়ে গাড়ি করে সোজা তাঁদের উড্‌বার্ন পার্কের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললেন। ঐদিনই অপরাহ্ণে তিনি মহাদেব দেশাইকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে করে বেলঘরিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হন। গান্ধীজী গিয়েই কবিকে জড়িয়ে ধরলেন। বন্দীমুক্তি-সমস্যা, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও বন্দে মাতরম্ সংগীত ইত্যাদি নিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক তাঁদের মধ্যে আলোচনা হল।

উল্লেখযোগ্য, ঐদিনই ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য পূর্বেই তাঁর সেক্রেটারীর মারফৎ জওহরলালের কাছে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কে তাঁর অভিমত বা বিবৃতিটি পাঠান। দীর্ঘ তিনদিনব্যাপী আলোচনার পর কমিটি 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, অতঃপর এই সংগীতের প্রথম অংশটিই কংগ্রেসের সভা-সমিতিতে গাওয়া হবে। তার যুক্তিতে এই সিদ্ধান্তের এক জায়গায় বলা হয় (২৮শে অক্টোবর, '৩৭),

"ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত এই যে, অতীতের স্মৃতি সুদীর্ঘকালব্যাপী আত্মত্যাগ ও দুঃখবরণের ইতিহাস এবং সর্বসাধারণ কর্তৃক ব্যাপক ব্যবহার এই সংগীতের প্রথম দুইটি কলিকে প্রাণবান ও আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সহিত অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে আবদ্ধ করিয়াছে; সুতরাং এই দুইটি কলি আমাদের সম্ভ্রম ও সমাদরের বস্তু। এই দুইটি কলিতে কাহারও আপত্তি করিবার কিছু নাই। সংগীতের অবশিষ্টাংশ অনেকেই জানেন না এবং প্রায় কখনও গান করা হয় না। উহাতে এমন বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং ধর্মবিষয়ক এমন ভাব বর্ণিত হইয়াছে, যাহা ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের আদর্শের সহিত সামঞ্জস্যহীন।

"বন্দে মাতরম্ সংগীতের কোনও কোনও অংশ সম্পর্কে মুসলমান বন্ধুগণ যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, ওয়ার্কিং কমিটি তাহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেছেন। মুসলমান বন্ধুদের আপত্তি যতদূর যুক্তিসম্মত, তাহা মানিয়া লইয়াও ওয়ার্কিং কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, আমাদের জাতীয়

আন্দোলনে এই সংগীত যে স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাই বহুগুণ গুরুত্বপূর্ণ—জাতীয় আন্দোলন সুস্পষ্টরূপ গ্রহণের পূর্বে এই সংগীত যে একখানা ঐতিহাসিক উপন্যাসে স্থানলাভ করিয়াছিল, সেই কথাটা জাতীয় আন্দোলনে এই সংগীতের ব্যবহারের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি এই নির্দেশ দিতেছেন যে, জাতীয় সভা-সমিতিতে যখনই এই সংগীত গান করা হইবে তখনই যেন শুধু প্রথম কলি দুটি গান করা হয়। তবে এই সংগীতের উপরেও বা এই সংগীতের পরিবর্তে অন্য কোনও নির্দোষ সংগীত গান করিবার পূর্ণ স্বাধীনতাও উদ্যোক্তাগণের থাকিবে।"......

[আনন্দবাজার পত্রিকা—১২ কার্তিক, ১৩৪৪ ॥ ২৯শে অক্টোবর, '৩৭]

তাছাড়া এই সিদ্ধান্তে জাতীয় সংগীত সংকলনের জন্য নিম্নলিখিত চারজনকে নিয়ে একটি সাব্-কমিটি নিয়োগের কথাও ঘোষণা করা হয়,—মৌলানা আজাদ, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র ও আচার্য নরেন্দ্র দেব। আরও স্থির হয়, এই সাব্-কমিটি এই বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করবেন।

পরদিন ওয়ার্কিং কমিটি থেকে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কে কবির বিবৃতিটি প্রেসে দেওয়া হয়। কবির বিবৃতিটি ছিল এই:

'বন্দে মাতরম্' সংগীতকে জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করা যায় কিনা, দুঃখের বিষয় সেই সম্পর্কে এক প্রশ্ন উঠিয়াছে। আমাকে ঐ বিষয়ে মতামত প্রকাশের সময় মনে করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, উহার প্রথম প্যারাতে সুর সংযোজনা করার সুযোগ আমারই প্রথম হইয়াছিল। তখনও এই সংগীতের রচয়িতা জীবিত ছিলেন। কলিকাতায় আহূত একটি কংগ্রেসে আমিই প্রথম উহা গান করি। ঐ সংগীতের প্রথম প্যারাতে যে ভক্তি ও কোমলতার ভাব আছে, উহাতে ভারতমাতার যে সুন্দর রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা আমার চিত্ত বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু তাহার ফলে আমার পক্ষে ঐ সংগীতের প্রথম প্যারাকে সমগ্র সংগীত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কিংবা যে পুস্তকে উহা প্রকাশিত হয়

তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার কোন অসুবিধা হয় নাই। অবশ্য আমি আমার পিতৃদেবের এক-ব্রহ্মবাদের আবহাওয়ায় বর্ধিত হওয়ায় সমগ্র সংগীতটির প্রতি আমার কোন ভালবাসা ছিল না। শাসকগণ আমাদের প্রদেশকে দ্বিধা-বিভক্ত করায় আমরা যখন জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রম করি, সেই সংগ্রামের সময় ইহা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সংগীত হিসাবে প্রচলিত হয়। পরবর্তী সময়ে 'বন্দে মাতরম্' যখন জাতীয় শ্লোগানে পরিণত হয়, তখন উহার জন্য আমাদের বহু বিশিষ্ট বন্ধু যে বিরাট স্বার্থত্যাগ করিয়াছে তাহা সহজে ভুলিতে পারি না। কারণ, আমাদের লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার সংগ্রামে সাফল্যলাভের পক্ষে উহার প্রয়োজন আজ সর্বাপেক্ষা বেশি। কিন্তু আমি অনায়াসে স্বীকার করি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি যদি উহার অন্যান্য ইতিহাসের সহিত পড়া যায় তাহা হইলে উহার এমন অর্থ করা যায় যাহার ফলে মুসলমানদের মনে আঘাত লাগিতে পরে, কিন্তু এই জাতীয় সংগীত যদিও সমগ্র সংগীত হইতে গৃহীত দুইটি প্যারামাত্র, তথাপি উহা যে সর্বদা কেন সমগ্র সংগীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে কিংবা যে ইতিহাসের সহিত দৈবক্রমে ইহা জড়িত তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, তাহার যুক্তিসংগত কোন কারণ নাই। উহার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আছে এবং উহার নিজস্ব এমন একটা উদ্দীপনাময় বৈশিষ্ট্য আছে যাহা, আমার মনে হয়, কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মনে অঘাত করে না।

[আনন্দবাজার পত্রিকা—১৩ই কার্তিক, ১৩৪৪ ॥ ৩০শে অক্টোবর, '৩৭]

উল্লেখযোগ্য, 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির ঐ সিদ্ধান্ত বাংলা দেশের অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকাই ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। সমগ্র সংগীতটি আবশ্যিক জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত না-হওয়ার জন্য তাঁরা উষ্মা ও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। আনন্দবাজার পত্রিকা 'বন্দে মাতরম বর্জন?'—এই শিরোনামায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখলেন (১৩ই কার্তিক, ১৩৪৪),

"যে বিচার মূঢ়তায় অন্ধ হইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সাম্প্রদায়িক

সিদ্ধান্তের কঠোর নিন্দা করিয়াও শেষ পর্যন্ত উহা প্রকারান্তরে মঞ্জুর করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই এবং যে কর্তৃত্বাভিমানের বশবর্তী হইয়া জনমতের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সেই বিজাতীয় সিদ্ধান্ত দেশের উপর দিয়া চাপাইয়া দিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই—'বন্দে মাতরম্' বিরোধী প্রস্তাবের মধ্যে সেই বুদ্ধিভ্রংশতাই পুনরায় দেখা যাইতেছে। আগাগোড়া সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের নিন্দা করিয়া শেষ পর্যন্ত উহা প্রকারান্তরে গ্রহণ এবং আগাগোড়া 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রশংসা করিয়া শেষ পর্যন্ত উহা বর্জন—এ একই বুদ্ধির ক্রিয়া! উদ্দেশ্য এক—সম্প্রদায় বিশেষের তুষ্টিসাধন; ফলও একই—সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয়দান এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের নিকট আত্মসমর্পণ।"

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রকে চিঠিতে যে-কথা লেখেন সে-কথা প্রকাশ্য বিবৃতিতে ঘোষণা করলে যে তার কী ভয়ানক প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম হবে তা তিনি খুব ভালভাবে জানতেন। উভয়পক্ষের সেন্টিমেণ্ট ও তীব্র উত্তেজনার কথা মনে রেখেই যতখানি মোলায়েম করে তাঁর বক্তব্য ব্যক্ত করা যায়, তিনি সেইভাবেই বিবৃতিতে বলেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবির ঐ বিবৃতি জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিকে মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারে নি। ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত যে মোটামুটিভাবে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতির ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে, কবির বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার পরই একথা সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। কাগজে কাগজে তার সমালোচনা চলল। পরদিন আনন্দবাজার পত্রিকা পুনরায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন (১৪ই কার্তিক, ১৩৪৪),

".........'মুসলিম বন্ধুদের আপত্তি'—অপ্রকাশ্য গোপন আপত্তি পূরণ করিবার জন্য এবং ভারতের সর্ববিধ সম্প্রদায়ের বুক হইতে বেদনা-শৈল তুলিয়া লইবার জন্য এত পরামর্শ, এত দুশ্চিন্তা—এমন কি বৃদ্ধ কবিবরের সার্টিফিকেট্ সংগ্রহ করিবার পরও, তাঁহাদের পছন্দসই অংশটুকুকে প্রত্যেক জাতীয় সম্মেলনে এবং কংগ্রেসে আবশ্যিক জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিলেন না কেন? কিম্বা দিতে কুণ্ঠিত হইলেন কেন? যে সংগীত স্বাভাবিকরূপেই জাতীয় সংগীতরূপে পরিণত এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই

গৃহীত—তাহার পরিবর্তে অন্য সংগীতও চলিবে বলিয়া, 'বন্দে মাতরম্'-কে ঐচ্ছিক করিবার মূলে কি মনোভাব রহিয়াছে ?"

ওয়ার্কিং কমিটির ও এ. আই. সি. সি-র ঐ সিদ্ধান্তে বাঙালি হিন্দুদের বেশ বড় একটি অংশ খুবই ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হলেন। সমগ্র সংগীতটিকে গ্রহণ করবার দাবীতে তারা ঋষি বঙ্কিমের প্রতিকৃতিসহ 'বন্দে মাতরম্' সংগীত গাইতে গাইতে কলকাতার বিভিন্ন রাজপথে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা তখনও কলকাতায়,—কিন্তু কেউই এই প্রতিক্রিয়ায় তেমন কিছু প্রভাবিত হলেন না। ১লা নভেম্বর অপরাহ্ণে গান্ধীজী হঠাৎ শরৎ বসুর বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। খবর পেয়ে কবি তৎক্ষণাৎ গাড়ি করে শরৎ বসুর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। একটি ইন্‌ভ্যালিড চেয়ারে করে তাঁকে উপরে গান্ধীজীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। গান্ধীজী একটু সুস্থ হলে সান্ধ্য-উপাসনার পর কবি বেলঘরিয়ায় ফিরে আসেন।

এদিকে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কে কলকাতার উত্তেজনা তীব্রতর হতে থাকে। ৩রা নভেম্বর যাত্রার পূর্বে জওহরলাল কবির সঙ্গে দেখা করে এ-বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করে যান। সুভাষচন্দ্রও কবির সঙ্গে দেখা করে এ-বিষয়ে তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করেন। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির ঐ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

উল্লেখযোগ্য, কলকাতায় 'বন্দে মাতরম্' সংগীত নিয়ে যখন এ রকম দারুণ উত্তেজনা চলছে সেই সময় মাদ্রাজ থেকে ডঃ কাজিন্‌স্‌ই (Dr. J. H. Cousins) এক বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' সংগীতকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। এই বিবৃতির এক জায়গায় বলা হয় (৩রা নভেম্বর, '৩৭),

"My suggestion is that Dr. Rabindranath's own intensely patriotic, ideally stimulating, and at the same time world-embracing '*Morning Song of India*' ('Janagana-mana'...) should be confirmed officially as what it has for almost twenty years been unoffiicially, namely the true National

Anthem of India. This real expression of aspiration for the highest welfare of a whole people—not a metrical paragraph from a geography, though Janagana also has its relationship with nature—is universally known in the country. It has a tune and rhythm that make it singable with definiteness, unity and vigour, whereas the Vande Mataram tune can never be given a satisfactory mass-rendering as its twists and turns are only possible in individual singing. [*Madras Mail*—3rd Nov, 1937]

বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদীদের মন সেই মুহূর্তে 'বন্দে মাতরম্' সংগীতে আচ্ছন্ন ছিল। স্বভাবতঃই ডঃ কাজিনস্-এর এই প্রস্তাবকে অনেকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। *Statesman* ও আরো দু'একটি ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনো পত্র-পত্রিকা কাজিন্‌সের এই প্রস্তাবের উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না; এমন কি কবিসুহৃদ রামানন্দও এই প্রস্তাবের উপর আদৌ গুরুত্ব দিলেন না। কেননা তিনিই সমগ্র 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ এমনও ইঙ্গিত করলেন যে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলতে না-পেরে কাজিন্‌স্‌কে দিয়ে এই প্রস্তাব করিয়েছেন। তাছাড়াও তাঁর জাতীয় ও স্বদেশী-সংগীতগুলি সম্পর্কে নানা সমালোচনা চলতে লাগল। অবশ্য রামানন্দ এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করতে পারেন নি। (প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ ॥ পৃঃ ২৯২-৯৪)। কবি এতে অত্যন্ত বিমর্ষ ও মর্মাহত হয়েছেন কিন্তু এসব সমালোচনার কোন জবাব দেন নি। তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকেই সব চেয়ে ভালোবেসেছেন অথচ তারাই তাঁকে সব চেয়ে বেশি আঘাত করেছে—এই বলে কবি সারা জীবনই দুঃখ করেছেন। ৫ই নভেম্বর তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান।

রাজবন্দীদের মুক্তি প্রচেষ্টায় গান্ধীজীকে আরও কিছুদিন কলকাতায় থাকতে হয়। ইতিমধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটিকে সমগ্রভাবে রাখবার অনুরোধ নিয়ে গান্ধীজীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। এ-বিষয়ে আলোচনার জন্য কবি যতীন্দ্রমোহন

বাগচীর বাড়িতে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের এক আলোচনা সভা হয় (১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৭)। এই সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বড় বড় হরফে এক দীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়,

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের অঙ্গচ্ছেদের সিদ্ধান্ত সমীচীন হইয়াছে কিনা তাহা আলোচনার জন্য গত রবিবার সন্ধ্যায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ভবনে বাংলার কতিপয় বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীর এক ঘরোয়া বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে সমবেত সাহিত্যসেবীরা সকলেই ওয়ার্কিং কমিটির এই অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। 'বন্দে মাতরম্' সংগীত পুরোপুরিভাবে জাতীয় সংগীতরূপে গৃহীত হইবার পক্ষে কি কি যুক্তি আছে তাহা জানাইবার জন্য একটি প্রতিনিধি মণ্ডলী মঙ্গলবার (১৬ই নভেম্বর) বেলা তিন ঘটিকার সময় মহাত্মাজীর নিকট যাইবেন বলিয়া সভায় স্থির হয়।

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর রামাপ্রসাদ চাঁদ, রায়বাহাদুর ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে লইয়া এই প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নেতৃত্ব করিবেন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা—৩০শে কার্তিক, ১৩৪৪ ॥ ১৬ই নভেম্বর, '৩৭]

এইখানে উল্লেখযোগ্য, সুভাষচন্দ্র এই সভায় প্রধান অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তটির পক্ষেই যুক্তি দিয়ে বলেন যে, এই গানকে সর্বজনীন করে তোলবার জন্যই এবং এর অন্তর্নিহিত ভাব অন্যান্য প্রদেশেও সাধারণ্যে প্রচার করবার জন্য বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

* এই সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আরও লিখেছেন,

---

* বন্দে মাতরম্ বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লেখকের অচিরে প্রকাশিতব্য 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' - ৪র্থ খণ্ড গ্রন্থে বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আলোচনা করা হয়েছে।

"আলোচনার সময় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, সমগ্র ভারতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ওয়ার্কিং কমিটি ঐ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যদিও বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবীদের মতে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে 'বন্দে মাতরম্'ই ভারতে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তিনি সমবেত সাহিত্যসেবীদের আরও বলেন যে, 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতের স্থলে অন্য কোন সঙ্গীত নির্বাচিত করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বসু বলেন, 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত বাংলায় যেরূপ ব্যাপকভাবে চলিত অন্যত্র তদ্রূপ নহে। তাই ইহাকে সর্বজনীন করিয়া তুলিবার এবং ইহার অন্তর্নিহিত ভাব অন্যান্য প্রদেশেও সাধারণ্যে প্রচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।"

এর থেকে লক্ষ করবার বিষয়, বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি ও এ. আই. সি. সি'-র সিদ্ধান্তের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র যে একমত ছিলেন এবং তারই স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে কলকাতায় সাহিত্যসেবীদের তা গ্রহণ করে নেবার আবেদন জানিয়ে ছিলেন, এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটিকে অখণ্ডভাবে জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করার জন্য এই সময় বাংলা দেশের প্রতিটি জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকায় ও দৈনিকপত্রে খ্যাত অখ্যাত বহু নেতা ও সাহিত্যিক প্রতিদিনই লিখে চলেছিলেন। কিন্তু এ-সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের কোন বিবৃতি বা রচনাই তাতে দেখা যায় নি।

এর তিন-চার দিন পরই—১৮ই নভেম্বর (১৯৩৭) সুভাষচন্দ্র বিমানযোগে ইউরোপ যাত্রা করেন। ইতিমধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়েছিল আসন্ন 'হরিপুরা কংগ্রেস'-এ তিনি সভাপতি নির্বাচিত হতে চলেছেন। সমস্ত বামপন্থী মহলে বিশেষ করে সমগ্র বাংলা দেশেই সুভাষচন্দ্র তখন অবিসংবাদী জনপ্রিয় নেতা। কিন্তু যাত্রার পূর্বে তিনি যে বিবৃতি দিলেন তাতে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কে কোনই উল্লেখ থাকল না। গান্ধীজী তার আগের দিনই হিজ্‌লী হয়ে ওয়ার্ধা যাত্রা করেন। সময়াভাবের জন্যই তিনি কলকাতায় বাংলার সাহিত্যসেবীদের প্রতিনিধিমণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উঠতে পারেন নি। প্রতিনিধিমণ্ডলীর পক্ষে রামানন্দবাবু সংবাদপত্রে

গান্ধীজীর উদ্দেশে ঐ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে এক দীর্ঘ খোলা চিঠি প্রকাশ করলেন।

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ ॥ ১৮ই নভেম্বর, ১৯৩৭]

কিন্তু বন্দীমুক্তিই তখন দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা, অন্য সব প্রশ্ন সাময়িক চাপা পড়ল গান্ধীজীর সঙ্গে বাংলা সরকারের আলোচনার ফলেই এই সময় বাংলার ১১০০ রাজবন্দী মুক্তি পেলেন। অবশ্য বাকী ৪৫০ জন রাজবন্দীর মুক্তির ব্যাপারে বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তাছাড়া আন্দামান প্রত্যাগত এবং সাজাপ্রাপ্ত বিপ্লবী কয়েদীদের মুক্তির প্রশ্নেও সরকারের তরফ থেকে কোন আগ্রহ দেখা গেল না। ঠিক হল গান্ধীজী একটু সুস্থ হয়ে ফিরে এসে আবার এ-ব্যাপারে বাংলা সরকারের ও বন্দীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন। অবশ্য বন্দীমুক্তি আন্দোলন সমানে চলতে লাগল।

এর কিছু দিন পরেই—৮ই জানুয়ারী (১৯৩৮) সুভাষচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হরিপুরা-কংগ্রেসের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এই সংবাদে দেশের সমস্ত বামপন্থী মহলে বিশেষ করে সারা বাংলা দেশেই যেন উল্লাসের সাড়া পড়ে গেল। তাঁরা ভাবলেন, 'এতদিনে একজন শক্ত ও মনের মতো কংগ্রেস সভাপতি পাওয়া গেল যিনি শক্ত হাতে দেশের হাল ধরবেন! আর যে-সব বাঙালি উগ্র হিন্দু ন্যাশনালিষ্ট বুদ্ধিজীবী বিষণ্ণ ও ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিলেন তারাও খুবই উল্লসিত হয়ে উঠলেন এই ভেবে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কর্পোরেশন এবং সরকারী চাকরীর ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্র অন্ততঃ বাঙালি হিন্দুদের পক্ষে লড়বেন। বিশেষ করে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তটিকে উল্টে দিয়ে তিনি অখণ্ডভাবেই 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটিকে ভারতের একমাত্র জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করবার চেষ্টা করবেন।

বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্র এ-বিষয়ে তাঁদের সম্পূর্ণ নিরাশ করেছিলেন। কেননা তিনি বিলেত থেকে ফিরে আসার কয়েকদিন পরেই বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রদেশিক সম্মেলন হয় (২৯ - ৩১ জানুয়ারী, ১৯৩৮)। কিন্তু বিষ্ণুপুর

সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কে কোন রকম বিতর্কই উঠতে দিলেন না। অবশ্য তাই নিয়ে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করতেও ছাড়লেন না। এর প্রায় এক পক্ষ কাল পরেই 'হরিপুরা কংগ্রেস' অনুষ্ঠিত হয় (১৫ - ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮)। কিন্তু হরিপুরা কংগ্রেসেও সুভাষচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন রকম বিতর্ক উঠতে দেন নি। তাছাড়া হিন্দীকে জাতীয় বা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের জন্য তিনি প্রকাশ্য ভাষণ ও বিবৃতিও প্রচার করলেন।

মোট কথা সরকারী চাকরীতে হিন্দু-মুসলমানের ভাগবাঁটোয়ারা, হিন্দীকে জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ এবং 'বন্দে মাতরম্' সংগীত-বিতর্ক—এর কোনটিই সুভাষচন্দ্র সংকীর্ণ বাঙালি-হিন্দুর দৃষ্টিতে বিচার করেন নি। এই সব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল তাঁর উপর তাতে কোন সন্দেহ নেই। সব শেষে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত-বিতর্ক সম্পর্কে একটি তথ্যের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

১৯৩৯ সালে ১১ই আগস্ট ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ঐদিনই সকালে সুভাষচন্দ্র উড়িষ্যা সফর শেষ করে কলকাতায় পৌঁছান। ঐদিন রাত্রে ৯টা নাগাদ তিনি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়িতে কবি ও সাহিত্যিক বন্ধুদের মজলিসে গেলে পর কথা প্রসঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের কথা ওঠে। এই প্রসঙ্গে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসেবে 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' নামে পুস্তকে লিখেছেন :

......"অন্যান্য কথার পরে সুভাষচন্দ্রকে কালিদাস রায় জিজ্ঞাসা করলেন, —'বন্দে মাতরম্' গানটি আপনার সভাপতিত্বেই আংশিকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে—এতে অবশ্যই আপনার সম্মতি ছিল?' সুভাষবাবু বললেন, 'হাঁ আমার সম্মতি না থাকলে আমি নিশ্চয়ই এর প্রতিবাদ করতাম। শুধু বাংলার দিক থেকে বা বিশেষ কোনো ধর্ম বা জাতির দিক থেকে কোনো বিষয়ের বিচার কংগ্রেস করতে পারে না। আজ সমস্ত সমস্যাকে সর্বভারতীয়

দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে হবে। সেই জন্য সর্ববাদী-সম্মতভাবে যে অংশটুকু গৃহীত হয়েছে তাতে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মর্যাদা কোনো মতে ক্ষুণ্ণ হয়নি বলেই আমি মনে করি।"

[সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র।। পৃঃ ১৫৪-৫৫]

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য, ১৯৩৮ সালে সারা বাংলা দেশ জুড়েই মহাসমারোহে 'বঙ্কিম জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও রক্ষণশীল সাহিত্যিকরা আর একবার চেষ্টা করেছিলেন 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটিকে (অখণ্ড) জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তা সমর্থন করেন নি।

কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র

এই সময় চীন-জাপান যুদ্ধের পরিস্থিতি খুবই সংকটজনক হয়ে উঠে। ৭ই ডিসেম্বর (১৯৩৭) মহাচীনের রাজধানী নানকিং-এর পতন হয়। এই সংবাদে ভারতবর্ষে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। এই সংবাদে কবি অত্যন্ত মর্মাহত হন। ২২শে ডিসেম্বর (৭ই পৌষ, ১৩৪৪) কবি শান্তিনিকেতনে মন্দিরে লাঞ্ছিত ও আক্রান্ত চীনের পক্ষে সহানুভূতি জানিয়ে বললেন,

"চীনের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারে আজ আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত। কিন্তু, আমাদের কী করবার আছে? আমরা কী করতে পারি? অমারা অত্যাচারীকে নিন্দা করছি—কিন্তু বলা যেতে পারে, নিন্দা করে কী লাভ? এই দুঃখবোধ-দ্বারা, দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ ক'রে, আমরাও সেই সৃষ্টির পক্ষে কাজ করছি—এর শক্তি যতই ক্ষীণ হোক এও সৃষ্টির কাজ। আমাদের অস্ত্র নেই কিন্তু আমাদের মন আছে। আমরা লড়াই না-করতে পারি, কিন্তু এ কথা যদি আমাদের মনে জাগ্রত রাখি যে অধর্মের দ্বারা আপাতত যতই উন্নতি হোক তার মূলে আছে বিনাশ—যদি এ কথা বিস্মৃত না হই যে মানব-ইতিহাসের মূলে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে—এ কথা মেনে নিয়ে সেই কল্যাণের পক্ষে আমাদের কর্মকে চেষ্টাকে যেন প্রয়োগ করি। আমাদের মেশিনগান নেই, কিন্তু আমাদের চিন্তা আছে—তার মূল্য যতটুকুই হোক, তাকে আমরা মহতের দিকে প্রয়োগ করব।"

[কালান্তর ।। পৃঃ ৪০০ - ০১]

চীনে জাপানী ফ্যাসিস্তদের পৈশাচিক তাণ্ডবলীলায় কবি যে কতখানি ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়েছিলেন তা তাঁর এই কালের বক্তৃতা, বিবৃতি, চিঠিপত্র ও রচনা ইত্যাদি পাঠ করলে জানা যায়। বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গের

এই সজ্ঘবদ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে 'খ্রীষ্ট জন্মদিনে' তিনি তাঁর অমর কবিতাটি লিখলেন ঃ

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক্ দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

অবশ্য এর প্রায় চার মাস পূর্বেই—১৯৩৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসেই কংগ্রেস থেকে চীনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ২৬শে সেপ্টেম্বরই সারা দেশব্যাপী প্রথম "চীন দিবস" অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতায় ওয়ার্কিং কমিটির ও এ. আই. সি. সি-র অধিবেশনেও চীনের প্রতি পূর্ণ নৈতিক সমর্থন জানিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর ১৯৩৭ সালে ২৪শে ডিসেম্বর জওহরলাল পুনরায় এক প্রেস-বিবৃতিতে ৯ই জানুয়ারী সারা দেশব্যাপী আক্রান্ত চীনের প্রতি সহানুভূতি জানাবার উদ্দেশে 'চীন দিবস' পালনের আবেদন জানান। তাতে বিপন্ন চীনবাসীদের সাহায্যার্থে একটি মেডিকেল ইউনিট পাঠাবার জন্য দেশবাসীকে অকাতরে সাহায্য করার আবেদন জানান হয়। এই বিবৃতি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ তার সমর্থনে শান্তিনিকেতন থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে এক আবেদন-বিবৃতিতে বললেন (৭ই জানুয়ারি, ১৯৩৮),

"ভারতের ইতিহাসের স্বর্ণযুগে ভারত তাহার শ্রেষ্ঠ দান—তাহার আধ্যাত্মিক সম্পদ চীনে প্রেরণ করিয়াছিল। আজ আমি আমার দেশবাসীদিগকে সেই পবিত্র স্মৃতি সমুজ্জ্বল করিতে এবং যে দুঃখ-দুর্দশার নির্মম চাপে চীন আজ নিপীড়িত হইতেছে তাহা প্রশমনের জন্য তাহাদের ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ চীনকে যে কোন আকারে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।"—এ. পি.

[আনন্দবাজার পত্রিকা—২৪শে পৌষ, ১৩৪৪ ॥ ৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৮]

তাছাড়া কবি চীন সাহায্য তহবিলের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে ৫০০৲ টাকা

জওহরলালের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তার হু'দিন পরেই—৯ই জানুয়ারী সারা দেশব্যাপী চীনে জাপ-আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, এবং চীনাদের প্রতি নৈতিক ও সক্রিয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জানিয়ে 'চীন দিবস' পালন করা হয়। আর সেই সঙ্গে জাপানী পণ্য দ্রব্য বয়কট আন্দোলনও প্রবল হয়ে ওঠে।

সুভাষচন্দ্র তখন বিলেতে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করে চলেছিলেন। আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনের সমর্থনে ভারতবর্ষে যে প্রবল আন্দোলন চলেছিল তাকেও তিনি সমর্থন জানালেন। ১১ই জানুয়ারী (১৯৩৮) লণ্ডনে প্যাংক্রাস টাউন হলে এক সম্বর্ধনা সভায় সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের সঠিক পরিপ্রেক্ষিতটি নির্ধারণ করতে গিয়ে বললেন,

"ভারতের ভাগ্য অন্যান্য দেশের নরনারীর ভাগ্যের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। সুদূর প্রাচ্য হইতে শুরু করিয়া পাশ্চাত্য পর্যন্ত—চীন স্পেন ও আবিসিনিয়ায় যে সংগ্রাম চলিয়াছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম যে সেই বিশ্বসংগ্রামেরই অংশ, কংগ্রেস তাহা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছে।"...

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২৯শে পৌষ, ১৩৪৪ ॥ ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৩৮]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এবারে বিলেতে রজনী পামী দত্ত, বেন ব্রাড্‌লে প্রমুখ কমিউনিষ্ট নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনায় সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনীতিক পুরানো ভুল ধ্যান-ধারণাগুলির অনেকখানি সংশোধন করে নিতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে ফ্যাসিজম সম্পর্কে ১৯৩৪ সালে তিনি *The Indian Struggle* গ্রন্থে যে-সব কথা লিখেছিলেন, তারপর ফ্যাসিজমের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হওয়ার পর তাঁর সে-সব ভুল ধারণার যে সংশোধন করে নিতে পেরেছেন, এ কথা তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন। এঁদের এই আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ এই সময় *Daily Worker* পত্রে (২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৮) প্রকাশিত হয়।*

---

* [দ্রঃ *Crossroads*—**Pp. 29-30**]

এই সময় ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। ১৯শে জানুয়ারী নাগাদ পাঞ্জাবে প্রায় কুড়ি জন রাজনৈতিক বন্দী অনশন শুরু করেন। তাছাড়া হাজারিবাগ জেলে এবং আলিপুর, প্রেসিডেন্সী ও ঢাকা জেলের বন্দীরাও মুক্তির দাবীতে কর্তৃপক্ষের কাছে অনশন ধর্মঘটের চরমপত্র দিলেন। বন্দীরা গান্ধীজীকেও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানালেন। গান্ধীজী তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি বলে বাংলা দেশে আসতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। এই সংবাদে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বাংলার মন্ত্রিসভার কাছে পুনরায় আবেদন জানিয়ে এক বিবৃতি দিলেন (শান্তিনিকেতন, ২১শে জানুয়ারী),

"আমি ভরসা করি যে, এই সংকট কালে মহাত্মাজী যাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারেন তজ্জন্য সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। এ জন্য যাহাদের হাতে ক্ষমতা আছে, তাঁহারা যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে তাহারা হিংসা নীতি সর্বপ্রকারে বর্জন করিয়াছে তাহাদিগকে সত্বর মুক্তি দিবার ব্যবস্থা করিবেন।" —ইউ, পি

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ৮ই মাঘ, ১৩৪৪ ॥ ২২শে জানুয়ারী, ১৯৩৮]

পরদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিশাল জনসভায় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করা হয়। এণ্ড্রুজও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া সভায় কবির বাণীটি পাঠ করা হয়।

কিন্তু বাংলা সরকার এ আবেদনে কর্ণপাত করলেন না। ফলে আলিপুর ঢাকা ও বাংলার বিভিন্ন জেলখানায় বন্দীরা অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন।

২৪শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ইউরোপ সফরান্তে বিমানযোগে কলকাতা এসে পৌঁছলেন। কলকাতায় পৌঁছেই বন্দীমুক্তি আন্দোলনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিশাল জনসভায় বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে জোরদার করবার আহ্বান জানিয়ে তিনি দেশবাসীকে চূড়ান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে অবিচলিত থাকবার আবেদন জানালেন। ঐ দিনই হাজারিবাগ

জেলে আট জন বন্দীর অনশনের সংবাদ এসে পৌঁছে। এর কয়েকদিন পরেই—২৯শে জানুয়ারী বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রিয় সম্মেলন শুরু হয় এই সম্মেলন চলা কালেই—৩০শে জানুয়ারী ঢাকা জেলে অনশনব্রতী বন্দী হরেন্দ্র মুন্সীর মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছল। এই সংবাদে কলকাতায় প্রবল উত্তেজনা ও বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। পরদিন কলকাতায় স্কুল কলেজের ছাত্রেরা হরতাল ও বিক্ষোভ মিছিল করে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক বিশাল জনসভা করেন। সভায় সুভাষচন্দ্র এক তীব্র আবেগময়ী ভাষায় বাংলা সরকারের মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে বন্দীমুক্তির বিষয়টি ত্বরান্বিত করবার দাবী জানালেন। কিন্তু কোনই ফল হল না তাতে। এ দিকে অনশনরত বন্দীদের অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যেতে থাকে। ফলে বাংলা দেশে বিক্ষোভ আন্দোলনও প্রবল হয়ে উঠিতে থাকে। ৮ই ফেব্রুয়ারী বঃ প্রাঃ কঃ কমিটির পক্ষে 'নিখিল বঙ্গ রাজনৈতিক বন্দীদিবস' পালনের আবেদন জানান হয়। এই উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি বাণী পাঠাবার অনুরোধ করেছিলেন। কবি তার জবাবে বাংলা সরকারের উদ্দেশে পুনরায় আবেদন জানিয়ে তাঁর বাণীতে বললেন,

"যাঁদের হাতে রাজবন্দীদের মুক্তি দেবার শক্তি দূরের থেকে তাঁদের কেবল এই কথাই জানাতে পারি যে, শক্তিস্য ভূষনং ক্ষমা। ক্ষমা না-করবার যে নিষ্ঠুর ভীরুতা ও অনৌদার্য আজ সত্য আখ্যাধারী প্রায় সকল দেশেই পরিব্যাপ্ত তারি সংক্রামকতা যদি ভারত শাসনবিধিকে অধিকার করে থাকে, তা হলে পীড়িত বাংলাদেশের দুঃখ নিবেদন তাঁদের কাছে ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই দুশ্চিকিৎস বধিরতাকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক সুবুদ্ধির লক্ষণ বলে মনে করি নে। কিন্তু পরামর্শ দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই, আমরা কেবল আজ নিপীড়িত বন্দীদের উদ্দেশ্যে আমাদের একান্ত মনের বেদনা জানিয়ে রাষ্ট্রচালনা কার্যে অবিলম্বে শুভবুদ্ধির প্রত্যাশা করে থাকব।"—ইউ. পি.

[আনন্দবাজার পত্রিকা-২৮শে মাঘ, ১৩৪৪ ॥ ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮]

বলা বাহুল্য, ৮ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে

মিছিল ও সভা করে 'রাজনৈতিক বন্দী দিবস' পালন করা হয়। ঐ দিনই সন্ধ্যায় কলকাতায় টাউন হলে এক বিশাল জনসভায় সুভাষচন্দ্র এক তীব্র আবেগময়ী ভাষায় বন্দীমুক্তি আন্দোলনকে জোরদার করবার আহ্বান জানিয়ে বললেন,—"আসুন, আবার অহিংস উপায়ে গণ-আন্দোলনের সাহায্যে বাংলাদেশে এমন প্রবল বন্যা আনয়ন করি, যাহার আঘাতে সমস্ত জেলের দরজা খুলিয়া যাইবে, মন্ত্রিমণ্ডল ভাসিয়া যাইবে এবং দেশ স্বাধীন হইবে।" দুঃখের বিষয় কবির বাণীটি যথাসময়ে সুভাষচন্দ্রের হাতে না-পৌঁছানর জন্য পরে ইউনাইটেড প্রেসের মারফত তিনি বাণীটি প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

এর কয়েকদিন পরেই হরিপুরা কংগ্রেস শুরু হবার কথা। ১১ই ফেব্রুয়ারী সভাপতি সুভাষচন্দ্র হরিপুরা যাত্রা করেন। ঠিক এই সময় বন্দীমুক্তি প্রশ্নে বিহার ও উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার সঙ্গে গভর্ণরদের তীব্র মতপার্থক্য হওয়ায় তাঁরা পদত্যাগ-পত্র দাখিল করলেন (১৫ই ফেব্রুয়ারী)। হরিপুরা কংগ্রেসে এই সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় স্থির হয়, গান্ধীজী এ ব্যাপারে ভাইসরয় ও গভর্ণরদের সঙ্গে আপোষ আলোচনা চালাবেন। কংগ্রেসের শুরুতেই বিষয়-নির্বাচনী সমিতির অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে দেশের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সর্বোপরি আন্তর্জাতিক সংকটজনক পরিস্থিতি ও মহাযুদ্ধের আশঙ্কা প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটির অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

"সর্ববিধ্বংসী ব্যাপক মহাযুদ্ধের বিভীষিকা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়াছে বলিয়া কংগ্রেস পুনরায় যুদ্ধ ও বৈদেশিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ভারতীয় জনসাধারণের নীতি কি হইবে তাহা ঘোষণা করিতেছে। ......গত কয়েক বৎসর বিভিন্ন দেশ সমূহের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত দ্রুত শোচনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। ফ্যাসিস্ত শক্তিসমূহের আক্রমণ তীব্র হইয়াছে। জার্মানী স্পেন এবং সুদূর প্রাচ্যে ফ্যাসিস্ত শক্তিসমূহ নির্লজ্জভাবে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং পৃথিবীর বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতির

জন্য প্রধানতঃ তাহারাই দায়ী। এখনও নাৎসী জার্মানী সেই নীতি ছাড়ে নাই এবং স্পেনে বিদ্রোহীদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেছে—তাহারা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। ভারতবর্ষ ঐ প্রকার কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। ভারতবর্ষ এ প্রকার যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের জন্য অর্থ এবং লোকবল নিয়োগ করিবে না। ভারতের জনগণের মত না-লইয়া ভারতবর্ষ কোন যুদ্ধে যোগদান করিতে পারে না। সুতরাং ভারতে যে সমরায়োজন চলিয়াছে কংগ্রেস তাহা মোটেই সমর্থন করে না। ভারতে বিমান আক্রমণ হইতে বাঁচিবার এবং অন্যান্য ভাবে ব্যাপক সামরিক আয়োজন করিয়া আসন্ন যুদ্ধের আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হইতেছে। যদি ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়াইবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে প্রতিরোধ করা হইবে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮]

হরিপুরা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র তাঁর সভাপতির অভিভাষণে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আসন্ন সংকটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। প্রদেশে দফ্তর বা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেও দেশবাসীকে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে অবিচল থাকবার আহ্বান জানালেন। দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে একটি Planning Commission গঠনের গুরুত্বটি ব্যাখ্যা করে তিনি তাঁর ভাষণে বললেন, "Last but not the least, the State, on the advice of a Planning Commission, will have to adopt a comprehensive scheme for gradually socializing our entire agricultural and industrial system in the spheres of both production and distribution."...

এ ছাড়া প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তিনি এর বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সর্বশক্তিতে লড়াই করবার আহ্বান জানিয়ে বললেন,

..."We have to fight Federation by all legitimate and peaceful means, not merely along constitutional lines, and in the last resort we may have to resort to mass civil disobedience which is the ultimate sanction we have in our hands."...

তাছাড়া তিনি সংখ্যালঘু সমস্যা, দেশীয় রাজ্যে 'প্রজা-আন্দোলন', বন্দীমুক্তি সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে কংগ্রেসের দায়িত্ব ও করণীয় বিষয় সম্পর্কে সচেষ্ট হবার আবেদন জানালেন। পরিশেষে তিনি কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বাম—উভয় পক্ষকেই ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিতভাবে দেশের মুক্তির জন্য এগিয়ে আসবার আহ্বান জানিয়ে বলেন,

..."The Congress to-day is the one supreme organ of mass struggle. It may have its Right bloc and its Left but it is a common platform for all anti-imperialist organisations striving for Indian emancipation. Let us, therefore, rally the whole country under the banner of the Indian National Congress. I would appeal specially to the Leftist groups in the country to pool all their strength and their resources for democratizing the Congress and reorganizing it on the broadest anti-imperialist basis. In making this appeal, I am greatly encouraged by the attitude of the leaders of *the British Communist Party whose general policy with regard to India seems to me to be in keeping with that of the Indian National Congress.*"

[*Selected Speeches of Subhas Chandra* - pp. 72-94]

পূর্বেই বলেছি, এবারে বিলেতে বেন্ ব্রাড্‌লে ও রজনী পাম্বী দত্ত প্রমুখ কমিউনিষ্ট নেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আলাপ-আলোচনার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এবং তারই

ফলে ভারতবর্ষে 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' নামধারী ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির (তখনও বে-আইনী) সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, হরিপুরা কংগ্রেসে বেন্ ব্রাড্লে, রজনী পামী দত্ত ও হ্যারি পলিট্ এক যুক্ত স্বাক্ষরিত বাণী পাঠিয়েছিলেন। এখানে তার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা হল ঃ

......"জাতির মুক্তি আন্দোলনে কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ যে গুরুদায়িত্ব ও কঠোর কর্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সাফল্যকল্পে তাঁহাদিগকে সাহায করা জনসাধারণের সর্বতোভাবে কর্তব্য। সম্মিলিত জাতীয় দলগঠনে কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। ভারতের জনসাধারণের উহাই এখন প্রধান কর্তব্য। কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কর্মপন্থানুসারে গণ-সংগঠন করিতে পারিলে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে। তাহার ফলে, তাঁহারা নির্বাচনী ইস্তাহারানুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মপন্থা বিশেষভাবে অনুসরণ করিতে পারেন।

"হরিপুরে কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে কংগ্রেস ও কংগ্রেসী মন্ত্রিদিগকে দেখা কর্তব্য—কৃষক ও শ্রমিকদিগকে অর্থনৈতিক দাবী পূরণে, তাহাদের আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গীভূত বলিয়া যেন স্বীকার করা হয়। জাতীয় আন্দোলনের অপরিহার্য অংশ রূপে কংগ্রেস যেন ট্রেড্ ইউনিয়ন ও কৃষক আন্দোলনকে সাহায্য ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে অগ্রসর হন।

..."কি ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের এই নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে, তাহা কংগ্রেসের ও গণআন্দোলনের শক্তির উপর নির্ভর করিবে। দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করিতে হইবে। আমরা আশা করি, হরিপুর কংগ্রেসে এ বিষয় বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে।

"গ্রেট বৃটেনের অনেকেই ভারতের মুক্তি কামনা করেন। ভারতবাসীর মুক্তি সংগ্রামে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সর্বদা সচেতন আছি। এখনও অনেক কিছু করিবার আছে। ভারতের মুক্তিসংগ্রামের সার্থকতা সম্পর্কে আমরা এদেশের শ্রমিক আন্দোলনকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছি। বরদৌলি জেলার হরিপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন ভারতের

জনসাধারণের মুক্তিপন্থার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিবে, ইহাই আমরা আশা করি।" —এ.পি. স্পেশাল

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ৩রা ফাল্গুন, ১৩৪৪ ॥ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮]

হরিপুরা কংগ্রেসের অনতিকাল পরেই সুভাষচন্দ্র গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের প্রবীণ ও নবীন নেতাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমেই নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন। নূতন কমিটিতে আচার্য নরেন্দ্র দেব ও অচ্যুত পট্টবর্ধন থাকতে রাজী হলেন না। তার ফলে সুভাষচন্দ্রকে অনেকাংশে পুরানো সদস্যদের নিয়েই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হয়। পনের জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির যে চোদ্দ জনের নাম তক্ষুনি ঠিক করা হয়, তাঁরা হলেন (১) সুভাষচন্দ্র, (২) বল্লভভাই প্যাটেল, (৩) জওহরলাল, (৪) খান্ আব্দুল গফ্ফর খাঁ, (৫) রাজেন্দ্র প্রসাদ, (৬) মৌলানা আজাদ, (৭) সরোজিনী নাইডু, (৮) ভুলাভাই দেশাই, (৯) শেঠ যমনালাল বাজাজ, (১০) পট্টভি সীতারামীয়া, (১১) শরৎ চন্দ্র বসু, (১২) জয়রাম দাস দৌলতরাম, (১৩) আচার্য কৃপালানী, (১৪) হরেকৃষ্ণ মহাতব। স্থির হয় পরে আর এক জনের নাম কো-অপ্ট্ করে নেওয়া হবে।

বলা বাহুল্য, এই কমিটিতে কংগ্রেসের প্রবীণ দক্ষিণপন্থী নেতারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রিয় সমিতির অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পূর্বেই তাঁর ভাষণে বলেন,

"আপনারা জানেন যে ৬/৭ বৎসর পরে আমি জনসেবায় ফিরিয়া আসিয়াছি। সুতরাং আমি নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রিয় সমিতির সভাপতি থাকিতে যাহাতে কংগ্রেসের নীতির কোন ব্যতিক্রম না-হয় তজ্জন্য আমার পক্ষে উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। নূতন ওয়ার্কিং কমিটিতে সকলে যাহাতে একযোগে কাজ করিতে পারেন তাহার প্রতিও আমার লক্ষ্য রাখা দরকার। এই দুই নীতি সম্মুখে রাখিয়া আমাকে অনেকাংশে পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটিকেই বহাল রাখিতে হইল। যদিও কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, তথাপি মোটামুটি ওয়ার্কিং কমিটি গতবারের মতই রহিল।

"আর একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। গত দুই বৎসর ওয়ার্কিং কমিটিতে আমরা শ্রীযুত অচ্যুত পট্টবর্ধন এবং আচার্য নরেন্দ্র দেবের সহযোগিতা পাইয়াছিলাম। কিন্তু নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের সময় আমি তাঁহাদিগকে ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা নূতন কমিটির বাহিরে থাকাই ভালো মনে করিলেন। কেন তাঁহারা ঐ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা তাঁহারাই ভাল জানেন। ঐ বিষয়ে এখানে কোন আলোচনা করিতে চাই না।"...

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ১১ই ফাল্গুন, ১৩৪৪ ॥ ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮]

অচ্যুত পট্টবর্ধন ও আচার্য নরেন্দ্র দেবের এই সিদ্ধান্তের পরিণাম যে কতখানি মারাত্মক ক্ষতিকারক হয়েছিল তা পরবর্তীকালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের সংকটকালে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে বামীপন্থীরা অনুভব করলেন। যাই-ই হোক, সুভাষচন্দ্র যে শুরু থেকেই সম্মিলিতভাবে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলেন উপরোক্ত ঘটনা থেকেই তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। হরিপুরা কংগ্রেসের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ-আকর্ষণ ছিল না এমন নয়, তবে এ-সম্পর্কে সচরাচর তিনি প্রকাশ্যে কোন মন্তব্য করতে চাইতেন না। অবশ্য হরিপুরা-কংগ্রেসের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সম্পর্কে কবি প্রত্যক্ষ ভাবে কোন আলোচনা না করলেও তিনি এই সময় (২৮শে ফেব্রুয়ারী, নূতন ভারত শাসন আইনের তীব্র সমালোচনা করে 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান'-এ (*Manchester Guardian* - 10 March, 1938) এক দীর্ঘ খোলা চিঠি লেখেন। তাঁর বিলেতের কিছু বন্ধু-বান্ধব এ-সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন বলে এই খোলা চিঠি। তার মর্মার্থ ছিল এই :

"আমার ইংরাজ বন্ধুগণ ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আমার অভিমত জানিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। সর্বপ্রথমে আমি সুস্পষ্ট

ভাবে জানাইতে ইচ্ছা করি যে, পাশ্চাত্যে এইরূপ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে যে, ভারতবর্ষে যে যুক্তরাষ্ট্র প্রায়-প্রবর্তিত হইতে যাইতেছে, তাহা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের চাইতে কোন অংশে কম নহে। জাপান এই কথাটি চীনে খুব ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। আমরা আশা করি যে, ইংরাজগণ ভারতবর্ষে অনুরূপ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন না।

"আমাকে অতি সাধারণ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতে দিন। যে দেশের লোক নিরস্ত্র, যাহাদিগকে জাতীয় অর্থভাণ্ডারের পাঁচ ভাগের চারি ভাগের অধিক অর্থের উপর কর্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, যাহাদিগকে তাহাদের নিজেদের বৈদেশিক ব্যাপারে কিছু করিতে অনুমতি দেওয়া হয় না তাহারা কিরূপে স্বায়ত্তশাসন পাইতে পারে ? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, ইংরাজগণকে যদি তাঁহাদের দেশে এইরূপ কিছুর সহিত সামান্য সামঞ্জস্য সম্পন্ন বা স্বাধীনতা দানের কোন প্রহসনও সহ্য করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের কার্য ঘৃণার চোখে দেখিবেন।......

"আমি ইংরাজগণকে এই সোজা ও সুস্পষ্ট কথাটি জানাইতে চাই যে, যতদিন পর্যন্ত আপনারা আমাদিগকে মুঠার মধ্যে চাপিয়া রাখিবেন ততদিন পর্যন্ত আপনারা আমাদের নিকট হইতে কিছুমাত্র আস্থা বা বন্ধুত্ব আশা করিতে পারেন না।......এই স্থলে আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাম্রাজ্যাধিকার মানুষকে কলুষিত করে এবং সেই জন্য আপনারাও কলুষিত হইয়াছেন।"

উপসংহারে কবি লিখলেন,

"নূতন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি না। ব্যুরোক্র্যাট্ এবং রাজনীতিজ্ঞগণ মিলিয়া যে শাসনতন্ত্র তৈয়ারী করিয়াছেন, সেই রাজনীতিজ্ঞগণ যখন বিনা বিচারে আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে কারাগারে প্রেরণ করিতেছেন, তখন সেই শাসনতন্ত্রে সকল সঙ্কীর্ণতা ও অবিশ্বাসের কার্পণ্য যে বর্তমান তাহা আর বলিতে হয় না।

"তবে এইরূপ কৃত্রিম শাসনতন্ত্রের কাঠামো হইতে আমাদের কোনো মঙ্গল হইতে পারে না। মানুষ মানুষকে, জাতি জাতিকে, যখন শোষণ

করিতেছে, সেই শোষণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পৃথিবীর যেখানে যে শক্তি নিয়োজিত হইতেছে, সেই মানবীয় শক্তির সঙ্গে সম্মিলিত ভারতের শক্তি যোজিত করিতেই ভবিষ্যৎ ভারতের সমূহ মঙ্গল হইবে।"

[যুগান্তর - ৭ই চৈত্র, ১৩৪৪ ॥ ২১শে মার্চ, ১৯৩৮]

বলা বাহুল্য, 'ভারতশাসন আইন' (১৯৩৫) সম্পর্কে কংগ্রেসের মূল দাবীগুলির মর্মকথাটিই ছিল এই।

কবির শরীর তখনও দুর্বল ও অসুস্থ। কিন্তু চীনের দুঃখ ও লাঞ্ছনায় কবি অসুস্থ শরীরেও আর স্থির থাকতে পারলেন না। চীনের সাহায্য-তহবিলে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দেবার উদ্দেশ্যে এই সময় তিনি 'চণ্ডালিকা' গীতি-নাটিকাটি ঘষে-মেজে অভিনয়োপযোগী করে তোলেন। কবি স্বয়ং শান্তিনিকেতনে অভিনয়ের মহড়ার তত্ত্বাবধান করছিলেন। স্থির হয়, বিশ্বভারতীর এই দল কলকাতায় গিয়ে নাট্যাভিনয় ইত্যাদির সাহায্যে অর্থসংগ্রহ করবেন। এই সম্পর্কে ইউনাইটেড প্রেসের সংবাদদাতা 'শান্তিনিকেতন দলের চীনের সাহায্যার্থে অভিনয়ের আয়োজন'—এই শিরোনামায় শান্তিনিকেতন থেকে এক বিবরণীতে লিখছেন (২২শে ফেব্রুয়ারী),

"সঙ্গীত-ভবনের উদ্যোগে শান্তিনিকেতনের শিল্পী ও ছাত্রমণ্ডলী কলিকাতার নাগরিকগণকে অভিনয় প্রদর্শনের আয়োজনে ব্যাপৃত আছেন। আশা করা যায় এই অনুষ্ঠান পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানের সাফল্য অতিক্রম করিবে। রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যরূপে 'চণ্ডালিকা'র নূতন করিয়া রচনা করিয়াছেন। সঙ্গীতে বিষয়বস্তুর অনুরূপ সুর সংযোজিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যকলার সমস্ত সম্পদ এই নাটকে প্রয়োগ করা হইবে। শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী ও শ্রীসুরেন করের সাহায্যে কবি স্বয়ং অভিনয়ের মহড়ার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। আগামী মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নাটকখানি অভিনীত হইবে এবং অভিনয়লব্ধ অর্থের কিয়দংশ বিশ্বভারতীর চীন-সাহায্য-ভাণ্ডারে প্রদত্ত হইবে।"—ইউ. পি.

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ১৩ই ফাল্গুন, ১৩৪৪ ॥ ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮]

১৮ই, ১৯শে, ২০শে মার্চ—পরপর তিন দিন 'ছায়া' চিত্রগৃহে 'চণ্ডালিকা'র অভিনয় হয়। উদ্বোধনের দিন মহাদেব দেশাই ও রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। 'চণ্ডালিকা' দেখার পর সুভাষচন্দ্রের এতখানি ভাল লেগেছিল যে পরদিনও সন্ধ্যায় অভিনয় দেখবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। অসুস্থতার জন্য চিকিৎসকরা কবিকে কলকাতা যাবার ঝুঁকি নিতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু কবি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ১৯শে মার্চ সন্ধ্যায় তিনি কলকাতায় পৌঁছলেন। পরদিন সন্ধ্যায় তিনি স্বয়ং অভিনয়কালে উপস্থিত হলেন।

এদিকে বন্দীমুক্তির প্রচেষ্টায় এর কয়েক দিন আগেই গান্ধীজী কলকাতায় এসেছিলেন (১৬ই মার্চ, '৩৮)। স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে এ-ব্যাপারে তাঁর কয়েকদিনই দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হল। রবীন্দ্রনাথ তার ফলাফল জানবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। ২২শে মার্চ সন্ধ্যায় কবি শরৎ বসুর উড্‌বার্ণ পার্কের বাড়ীতে গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করলেন। বন্দীমুক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে প্রায় কুড়ি মিনিট কাল উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর কবি গান্ধীজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরলেন। অবশ্য বন্দীমুক্তির ব্যাপারে বিশেষ কোন সুরাহা হল না। ২৩শে মার্চ গান্ধীজী দেলাং যাত্রা করেন। স্থির হয় এপ্রিলের প্রথমভাগে কলকাতায় ফিরে পুনরায় তিনি আলাপ-আলোচনা চালাবেন। ২৬শে মার্চ কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। এবার কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলোচনাও হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ২৫শে এপ্রিল কবি কালিম্পঙ যাত্রা করেন।

ইতিমধ্যে চীন-জাপান যুদ্ধের অবস্থার খুবই অবনতি ঘটতে থাকে। শান্টুং ও উত্তর চীনে জাপানীরা প্রবল আক্রমণ করে নৃশংসভাবে বোমা ফেলে সব কিছু বিধ্বস্ত করতে থাকে। এই সময় অধ্যাপক তান্ য়ুন-শানের চীন যাবার কথা হয়। এই সংবাদে সুভাষচন্দ্র অধ্যাপক তান্‌কে এক পত্রে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে চীনাবাসীদের প্রতি ভারতবাসীর পূর্ণনৈতিক সমর্থন জ্ঞাপনের অনুরোধ জানালেন। পত্রটির মর্মার্থ ছিল এই :

"শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক,

আপনার সহিত কখনও সাক্ষাৎ করিবার বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগলাভ আমার হয় নাই। কিন্তু আপনি চীন ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সংস্কৃতিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার ও 'চীন-ভারত-সমিতি'র জন্য যে কাজ করিতেছেন তাহা বরাবরই আমি আগ্রহসহকারে লক্ষ্য করিতেছি। চীনবাসীদের এবং তাহাদের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি আমাদের কতখানি প্রীতি ও শ্রদ্ধা আছে তাহা ত আপনি ভারতে থাকিয়া দেখিতেছেন। আপনি ভারতে—বিশেষভাবে শান্তিনিকেতনে থাকিয়া আমাদের রাজনীতি ও সংস্কৃতির বাহক মহাত্মা গান্ধী, গুরুদেব ঠাকুর, পণ্ডিত নেহেরু এবং অন্যান্য মনীষীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আপনাদের ইতিহাসের এক চরম দুর্দিনে আমরা কত আগ্রহ ও সহানুভূতির সহিত আপনাদের জাতীয় সংগ্রামের গতি লক্ষ্য করিতেছি, তাহা আমাদের দেশের এই সকল শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সংস্পর্শে গিয়া আপনি নিশ্চয়ই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। চীনবাসীদের এই জাতীয় সংগ্রামের প্রতি বাস্তব সহানুভূতি দেখাইবার জন্য আমরা ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি, তৎসম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন।

চীনবাসীদের প্রতি আমাদের গভীর মমতা, তাহাদের সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ এবং তাহাদের বর্তমান সংগ্রামের প্রতি যে আমাদের সহানুভূতি আছে, তাহা চীনবাসীদের জানাইবার জন্য আপনাকে আমি সবিনয় অনুরোধ করিতেছি। যাঁহারা চীনের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য কিছু অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, জগতের কোনো শক্তিই কীর্তিগাথায় পরিপূর্ণ মহাজাতির স্বাধীনতা এবং জীবনকে ধ্বংস করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে, চীন তাহার এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জগতের স্বাধীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে তাহার আপন স্থান অধিকার করিয়া লইবে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা-২১শে বৈশাখ, ১৩৪৫ ॥ ৪ঠা মে, ১৯৩৮]

উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক তান্ য়ুন-শানের চীন যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এক অত্যন্ত আবেগময়ী ভাষায় চীনের জনগণের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন জ্ঞাপন করে একটি বাণী পাঠান। কবির বাণীর মর্মার্থ ছিল এই ঃ

"সংস্কৃতির সম্পদে সম্পদশালী করিয়াছেন বলিয়া আপনাদের প্রতিবেশী যে জাতি আপনাদের নিকট বিশেষভাবে ঋণী নিজেদের মঙ্গলের জন্যই যাহাদের কর্তব্য ছিল আপনাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা, তাহারা হঠাৎ আজ পশ্চিম হইতে আমদানী করা সাম্রাজ্যলুব্ধতায় প্রলুব্ধ হইয়া প্রাচ্যের অদৃষ্টকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তোলার বিরাট সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছে। তাহাদের মদমত্ত তর্জনগর্জন নির্মম এবং নির্বিচার নরমেধ, শিক্ষাকেন্দ্রসমূহকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা, মানব সভ্যতার সাধারণ নিয়মের প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা এশিয়ার নূতন ভাবধারাকে কলঙ্কিত করিয়াছে। এশিয়া আজ নূতন যুগের অগ্রদূত হইবার জন্য যত্নবান। আরও দুঃখের বিষয়, পশ্চিমের কোন কোন গর্বিত জাতি স্ফীত-সম্পত্তির চাপে পতনোন্মুখ হইয়া তাহাদের অতি বিখ্যাত সভ্যতার বাহকদের রক্তকলঙ্কিত রাজনীতিকে অতি ভয়ে ভয়ে নিন্দা করিতেছে। মানুষের বহু পবিত্র অধিকার যেখানে বহুদিন হইতে নিরাপদ ছিল তাহাকে ধ্বংস করার কলঙ্কময় সাফল্যের নিকট তাহারা নম্রভাবে নতজানু হইতেছে। আজিকার এই গুরুতর নৈতিক বিশৃঙ্খলার দিনে আমাদের পক্ষে একমাত্র ইহাই আশা করা স্বাভাবিক যে, মানুষের এই ঐতিহাসিক কালের মধ্যে যে মহাদেশ বুদ্ধ এবং যীশুখ্রীষ্টের মতো দুইজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই মহাদেশ বিজ্ঞ মানুষের বৈজ্ঞানিক ঔদ্ধত্যের মধ্যেও চরিত্রের নির্মল বিকাশ সম্পর্কে তাহার দায়িত্ব পালন করিবে। বহু শতাব্দীর অবজ্ঞার ইতিহাসের মধ্যে গান্ধীর আবির্ভাব কি আমাদের সেই আশার প্রথম উজ্জ্বল পূর্ণতা নয়? যাহাই হউক, জাপান তাহার ভবিষ্যৎকে হেলায় নষ্ট করিয়াছে।

"জাপান তাহার 'বুসিদোর' ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে। তাহাদের নিন্দনীয় অভিযান যে-ভাবে আমাদের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে তাহা বড়ই পীড়াদায়ক। জাপানের আপাততঃ যে সমস্ত ক্ষেত্রে জয় হইয়াছে, তাহা মারাত্মক পরাজয়ের মধ্যে ধূলায় বিলীন হইতে বাধ্য।

"আমরা একমাত্র এই আশায় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি যে, হিংসা প্রণোদিত যে স্বেচ্ছা আক্রমণ আপনাদের দেশের উপর চলিয়াছে তাহাতে জনগণ বীরত্বের সহিত দুঃখকে বরণ করিয়া লইবে এবং সেই দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়া জাতির নূতন জীবন লাভের সম্ভাবনা আছে। আপনারাই পৃথিবীর একমাত্র মহান জাতি, যাঁহারা সামরিক শক্তিকে কোনদিন জাতির গৌরবময় বৈশিষ্ট্য বলিয়া প্রশংসা করেন নাই। সেই সামরিক পশুশক্তি উহার ঘৃণ্য প্রতিপত্তিতে আজ যখন আপনাদের দেশ দখল করিতেছে তখন ইহাই আমাদের একমাত্র আন্তরিক প্রার্থনা যে, আপনারা এই শক্তি পরীক্ষায় জয়ী হন এবং আর একবার ইহাই প্রমাণ করুন যে, দুর্বল পৃথিবী তহার উচ্চ আদর্শকে যেখানে বিসর্জন দিতেছে, সেখানে আপনারা শ্রেষ্ঠ মানবতার প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্বে আস্থাবান। যদি আপনারা এক্ষণেই বাহ্যত জয়লাভ নাও করিতে পারেন তথাপি আপনাদের নৈতিক জয় মলিন হইবে না। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়া যে জয়ের বীজ আপনাদের গভীরতম অন্তরে ছড়াইয়া পড়িবে তাহা পুনঃপুনঃ অমর বলিয়া প্রমাণিত হইবে।" – ইউ, পি.

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৫ ॥ ২৮শে জুন, ১৯৩৮]

শুধু চীনে জাপানী-ফ্যাসিস্তদের আক্রমণই নয়,—সমগ্র ইউরোপে তখন মহাযুদ্ধের করাল ছায়া আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আসছে। ১২ই মার্চ হিটলারের নাৎসী বাহিনী অস্ট্রিয়া দখল করে নেয়। হিটলার ও মুসোলিনীর তখন ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ ও কূটনীতিক আঁতাত চলেছে। অস্ট্রিয়া গ্রাসের পর সুদেতন নিয়ে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে বিরোধ শুরু করে দেয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন কালিম্পঙে। শরীর খুবই দুর্বল। কিন্তু অসুস্থ শরীরেও সংবাদপত্রযোগে গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে বিশ্বপরিস্থিতির এই দ্রুত অবনতির গতিপ্রকৃতিটি তিনি অনুধাবন করে চলেছিলেন। তাঁর এই মানসিক উদ্বেগ ও যন্ত্রণা প্রকাশ পায় তাঁর এই সময়কার লেখা 'জন্মদিন' কবিতায়,

শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।

তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে-অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, ব'লে যাব, 'এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।'
ব'লে যাব, 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।'

কবিতাটি ২৫শে বৈশাখ কবি কালিম্পঙ থেকে রেডিওর জন্য পাঠ করেন ;—টেলিফোনযোগে কলকাতা বেতার কেন্দ্রে প্রেরিত হলে পরে তা সর্বত্র প্রচারিত হয়। এই জন্মদিন উপলক্ষে কবি তাঁর অপর একটি বাণীতে বললেন,

"মানবের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যাহা কিছু মহান তাহার প্রতি এই কুৎসিত ব্যঙ্গ আজ দানবীয় ভ্রূকুটিতে পৃথিবীর প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। এই প্রেতচ্ছায়া ধ্বংসের মশাল আন্দোলিত করিয়া আমার চক্ষুর সম্মুখে বিভীষিকা সঞ্চার করিতেছে ; জীবন সায়াহ্নে এই দৃশ্য দেখিয়া কি আমায় জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে ?"—ইউ. পি.

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২৯শে বৈশাখ, ১৩৪৫ ॥ ১২ই মে, ১৯৩৮]

কবির মানসিক যন্ত্রণা যে কি অসহ্য হয়ে উঠেছিল এর থেকেই তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

এই সময় সাম্প্রদায়িক সমস্যার আপোষ-মীমাংসার জন্য বোম্বাইয়ে জিন্না-সুভাষ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। ৮ই মে রাত্রে সুভাষচন্দ্র বোম্বাই যাত্রা করেন। ১১ই মে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনার পর জিন্নার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। দীর্ঘ চার দিন আলোচনার

পরও কোন মীমাংসা হল না। স্থির হয়, পরে এ-সম্পর্কে আরও আলোচনা হবে। তার কয়েকদিন পরেই ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হয়। ২৪শে মে ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনায় চীন সম্পর্কে এক প্রস্তাবে স্থির হয় যে, অতঃপর চীনের সাহায্যে অর্থ না-পাঠিয়ে তার পরিবর্তে সেখানে কংগ্রেসের পক্ষে একটি মেডিকেল মিশন ও এম্বুলেন্স বাহিনী পাঠান হবে। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র এই উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্যের জন্য দেশবাসীর কাছে এক মর্মস্পর্শী আবেদন জানালেন।

২রা জুন জওহরলাল ইউরোপ যাত্রা করেন। তার কয়েকদিন পরেই —১২ই জুন দেশের প্রায় সর্বত্র চীনের সাহায্যে আর্থিক ও নৈতিক সহানুভূতি জানিয়ে 'চীন-দিবস' পালন করা হয়। এই সময় খবর এল, অধ্যাপক তান্-এর মারফত রবীন্দ্রনাথ চীনবাসীদের উদ্দেশে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন, মার্শাল চিয়াং-এর নির্দেশে বেতারযোগে তা চীনের সর্বত্র প্রচারিত হয়। এর ফলে চীনের সর্বত্রই বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

এদিকে সুভাষচন্দ্র চীনা কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে চীনে মেডিকেল মিশন প্রেরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনার পরেই সুভাষচন্দ্র দেশবাসীকে ৭ই, ৮ই ও ৯ই জুলাই চীন সাহায্য তহবিলে-অকাতরে সাহায্য করবার আবেদন জানিয়ে এক বিবৃতি দেন। সেটি ছিল এই ঃ

"ভারতের চীনা কন্সাল জেনারেল আমাকে জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি চীনে যে এম্বুলেন্স বাহিনী প্রেরণের প্রস্তাব করিয়াছেন চীন সরকার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগকে যথাসম্ভব সত্বর এম্বুলেন্স বাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১২ই জুন তারিখ ভারতে সাফল্যমণ্ডিতভাবে 'চীন-দিবস' উদ্‌যাপিত হইয়াছে, ঐ জন্য আমি দেশবাসীকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু ঐ দিন অর্থসংগ্রহ আশানুরূপ হয় নাই বলিয়া অনেকে জুলাই মাসে ঐ জন্য এক বা একাধিক দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই প্রস্তাব সানন্দে অনুমোদন করিয়া আমি ৭ই, ৮ই, ও ৯ই জুলাইকে 'চীনা-অর্থ-সংগ্রহ দিবস' বলিয়া ধার্য করিতেছি। চীনাদের দিক হইতে ৭ই ও ৯ই জুলাই তারিখের

যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। এই তিন দিন অর্থসংগ্রহ কার্যে বিশেষভাবে যত্নবান থাকিবার জন্য আমি সমুদয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করিতেছি। সংগৃহীত সমুদয় অর্থ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অফিসে পাঠাইতে হইবে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ সময়ের মধ্যে আমাদিগকে বাইশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে।

"এই উপলক্ষে ক্ষুদ্রাকৃতি চীনা-পতাকা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে অর্থসংগ্রহেরও সুবিধা হইবে। চীনের প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করাও হইবে, বড় বড় সহরে এই ব্যবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক হইবে বলিয়া মনে হয়। যেখানে সম্ভব আমি এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এই তিন দিনকে 'চীন' পতাকা-দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

"যে যে স্থানে চীনা সাব-কমিটির সদস্য আছেন ঐ-সব স্থানে তাঁহারা স্থানীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সহিত পরামর্শ করিয়া অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

"বোম্বাইয়ে চীনা সাব-কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুত হাতি সিং বোম্বাই কংগ্রেস কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। আমি আশা করি যে, আমাদের প্রেরিত চিকিৎসক বাহিনী এক বৎসর কাল কাজ চালাইতে পারিবে, ঐরূপ পর্যাপ্ত অর্থ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব।

"আমি এতৎ সম্পর্কে জনসাধারণকে জানাইয়া রাখিতেছি যে, ইতিমধ্যেই পূর্ণ সরঞ্জামসহ একখানি এম্বুলেন্সের অর্ডার দেওয়া হইয়া গিয়াছে। এম্বুলেন্সখানি সোজা হংকং-এ প্রেরিত হইবে। চীনের ঘোর দুর্দিনে ভারতের এম্বুলেন্স বাহিনী চীনের প্রতি ভারতের অন্তরের সহানুভূতি ও শুভ ইচ্ছারই পরিচায়ক হইবে। আমি আশা করি জনসাধারণ যথোচিত সাড়া দিয়া কংগ্রেস ও জাতির মর্যাদা রক্ষা করিবেন।"—ইউ, পি.

[আনন্দবাজার পত্রিকা-১৩ই আষাঢ়, ১৩৪৫ ॥ ২৮শে জুন, ১৯৩৮]

সুভাষচন্দ্রের এই আবেদনে সারা দেশে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। ৭ই, ৮ই ও ৯ই জুলাই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে

'চীন-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের তীব্র নিন্দা করা হয়। সেই সঙ্গে জাপানী পণ্যদ্রব্য বয়কট আন্দোলনও প্রবল হয়ে ওঠে।

এই সময় প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে বিলেতে স্যার ফ্রেডারিক হোয়াইটের একটি মন্তব্যকে উপলক্ষ্য করে সত্যমূর্তি ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে এক বিতর্ক শুরু হয়। এক শ্রেণীর কংগ্রেস নেতা প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণের জন্য তলেতলে চেষ্টা শুরু করেছেন, এমন আভাস পাওয়া গিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস কর্মীদের এ-সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে তাঁর বিবৃতিতে বললেন,

"জোর করিয়া যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা আমাদের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টার ফলাফল কি হইবে, তৎসম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, যদিও কংগ্রেসের পক্ষে পূর্ব সিদ্ধান্ত বর্জন করা অচিন্তনীয়, তথাপি যদিই কোন অবস্থায় তেমন ঘটে, তবে তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা সকলেরই জানিয়া রাখা ভাল। কংগ্রেসের বর্তমান মনোভাব হইতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে তবে কংগ্রেসের মধ্যে গুরুতর বিরোধের সৃষ্টি হইবে। ব্যবহারিক রাজনীতি ক্ষেত্রে যদি আমাদের বিন্দুমাত্রও অভিজ্ঞতা থাকে তবে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন হইয়া, আমরা যেন এমন আশা না করি যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাহা গ্রহণ করিলেই বিরুদ্ধ মতাবলম্বী সংখ্যালঘিষ্ঠ দল নির্বিবাদে তাহা মানিয়া লইবে।"...

[আনন্দবাজার পত্রিকা-৩০শে আষাঢ়, ১৩৪৫ ॥ ১৫ই জুলাই, ১৯৩৮]

সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতির ফলে সারা দেশের বিভিন্ন বামপন্থী মহল তাঁকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়ে সুবিধাবাদী ও আপোষপন্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ও নিন্দাবাদ শুরু করেন। দেশের মনোভাব স্পষ্ট বুঝতে পেরে সুবিধাবাদী ও আপোষকামী নেতৃত্ব সাময়িকভাবে পিছু হটে যান।

এই সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, এই সময়ই সুভাষচন্দ্র কলকাতায় একটি 'কংগ্রেস ভবন'-এর (পরবর্তীকালে কবি কর্তৃক নামকরণ —'মহাজাতি সদন') কিছু জমির জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে

কানুনমাফিক আবেদন জানান (২৫শে জুলাই, ১৯৩৮)। ৩রা আগস্ট তা কর্পোরেশনের সভায় মঞ্জুর হয়। কর্পোরেশন নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে ঐ জমিটি (মোট ১ বিঘা ১৮ কাঠা) বাৎসরিক এক টাকা নামমাত্র খাজনায় নিরানব্বই বৎসরের জন্যে লিজ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্র স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ইতিমধ্যে চীন সাহায্য-তহবিলের জন্য অর্থ-সংগ্রহ অভিযান সমানে চলেছিল। এই সময় চীনের শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তা তাই সি-তাও (Tai-Chi-Tao) কলকাতায় এসেছিলেন। ১২ই আগস্ট (১৯৩৮) ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের পাঠচক্রের উদ্যোগে ইন্‌স্টিটিউট ভবনে তাঁর জন্য এক সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন,

"ভারতবাসী কিরূপ আগ্রহ ও সহানুভূতির সহিত চীনের সংগ্রামের পরিণতি লক্ষ্য করিতেছে, আমার বিশ্বাস অধ্যাপক তাউ ও তাঁহার দেশবাসী সবিশেষ তাহা অবগত আছেন। বস্তুতঃ চীনের আজ বড় দুর্দিন; চীনের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এমন ঘোর দুর্দিন খুবই কম দেখা দিয়াছে। বর্তমানে আমরা ও জগদ্বাসী চীনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যাহাই মনে করিনা-কেন, পরিশেষে চীন যে জয়ী হইবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।......

"চীনের যেরূপ আজ দুরবস্থা ভারতবাসীও আজ সেইরূপ নানা দুর্দশার ভিতর দিয়া দিনপাত করিতেছে। চীনের এই বর্তমান দুর্দিনে যে আমরা প্রকৃতপক্ষে চীনকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারি না, তাহা যতই বেদনাদায়ক হউক না কেন, আমরা ভালভাবেই জানি। কিন্তু চীনবাসীর প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি রহিয়াছে। সেই সহানুভূতির নিদর্শন-স্বরূপই আমরা ছোটখাট একটি 'মেডিকেল ইউনিট' চীনে প্রেরণ করিতেছি। ভারতবাসীর পক্ষে উহা একটি সামান্য দান। এই 'মেডিকেল ইউনিট' প্রকৃত প্রস্তাবে কতদূর কার্যকরী হইবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। কিন্তু নীতির দিক দিয়া উহার একটা মূল্য আছে। কারণ উহা চীনবাসীর প্রতি ভারতবাসীর আন্তরিক সহানুভূতির নিদর্শনস্বরূপ।

"এই অবস্থায় অধ্যাপক তাউ-কে পাওয়া বড়ই একটা সৌভাগ্যের বিষয়। আমি তাঁহাকে চীনের বর্তমান অবস্থা এবং সংগ্রামরত চীনবাসীর মনোভাব সম্পর্কে কিছু বলিতে আহ্বান করিতেছি।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪৫ ॥ ১৩ই আগষ্ট, ১৯৩৮]

প্রত্যুত্তরে অধ্যাপক তাউ চীনা সৈন্য বাহিনীর ও জনগণের দুর্জয় প্রতিরোধ-সংগ্রামের একটি চিত্র উপস্থাপিত করে ভারতবাসীকে জাপানী পণ্যদ্রব্য বয়কট করার আবেদন জানান।

১৪ই আগষ্ট রাত্রে ডাঃ রণেন্দ্রনাথ সেন ও ডাঃ দেবেশ মুখার্জী চীনা মেডিকেল মিশন-এ যোগদানের জন্য বোম্বাই যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্বে এক মনোরম অনুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্র এক আবেগপূর্ণ ভাষণে তাঁদের সাফল্য কামনা করে বিদায়-সম্বর্ধনা জানান। স্থির হয় ১লা সেপ্টেম্বর বোম্বাই থেকে মেডিকেল ইউনিটটি জাহাজে করে চীন যাত্রা করবেন। যাত্রাকালে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন।

উল্লেখযোগ্য, ঠিক এই সময়ই জাপানের সম্রাজ্যবাদী কবি নোগুচির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক পত্র বা মসীযুদ্ধ শুরু হয়। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকে ভৎর্সনা করে রবীন্দ্রনাথ এবং জওহরলাল-সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা চীনকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার জন্য যে-ভূমিকা গ্রহণ করেন, সেইটাই ছিল নোগুচির (এবং সেই সঙ্গে জাপান-প্রবাসী রাসবিহারী বসুর) উষ্মা ও ক্ষোভের কারণ। নোগুচি রবীন্দ্রনাথকে পত্র পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকলেন না ;—সমস্ত সৌজন্য ও শালীনতা বিসর্জন দিয়ে কবির অনুমতির অপেক্ষা না-রেখেই এই পত্রের কপি বাংলাদেশের 'আনন্দবাজার' ও *Amrita Bazar* পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। নোগুচির পত্রটি (২৩শে জুলাই, '৩৮-এ লেখা) ২৮শে আগষ্ট এদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাতে চীনে জাপ-আক্রমণের যুক্তি ও সাফাই গেয়ে তিনি লিখেছিলেন,

"কিন্তু আপনি যদি মনে করিয়া থাকেন যে, বর্তমান চীন-যুদ্ধ পাশ্চাত্য আদর্শের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের ফল, তবে আপনি

ভুল করিয়াছেন। আমার মতে এই যুদ্ধ তো উন্মত্ত কসাইবৃত্তি নয়ই, বরং ইহা বিরাট এশিয়া মহাদেশে এমন এক জগৎ রচনার একমাত্র উপায়,—ভয়ঙ্কর হইলেও একমাত্র উপায়—যে জগতে নিজে বাঁচিয়া থাকা ও অপরকে বাঁচিয়া থাকিতে দেওয়ার নীতি কার্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে। আমার কথা বিশ্বাস করুন, এশিয়া যাহাতে এশিয়াবাসীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে, তজ্জন্যই এই যুদ্ধ। ধর্মযোদ্ধার দৃঢ়তা ও শহীদের আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে।"

নোগুচির এই সীমাহীন ধৃষ্টতায় কবি যারপরনাই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হন। চীনে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের এই নির্লজ্জ ওকালতীর তীব্র সমালোচনা করে কবি তাঁর জবাবে এক জায়গায় লিখলেন (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮),

"মানবতার বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সমাজের নৈতিক কাঠামোয় বিশ্বাস করিয়াছে। সুতরাং আপনি যখন 'এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একটি নূতন জগৎ প্রতিষ্ঠার জন্য ভীষণ হইলেও অবিনার্য উপায়ের' কথা, যাহার অর্থ আমার মনে হয় যে, এশিয়ার জন্য চীনকে রক্ষা করার উপায়স্বরূপে চীনা নারী ও শিশুদের উপর বোমাবর্ষণ এবং প্রাচীন মন্দির ও বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ ধ্বংসের কথা বলেন, তখন আপনি মানবতার উপর এমন একটি জীবনধারা আরোপ করেন, যাহা প্রাণীদের মধ্যেও অনিবার্য নহে এবং মধ্যে মধ্যে নীতি হইতে স্খলিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাচ্যে তাহা নিশ্চয়ই প্রযোজ্য হইবে না। আপনি এমন একটি এশিয়ার কল্পনা করিতেছেন, যাহা নরকপালের স্তম্ভের উপর রচিত হইবে। আমি এশিয়ার বাণীতে বিশ্বাসবান, ইহা আপনি ঠিকই বলিয়াছেন; কিন্তু যে বীভৎস নরহত্যার কার্যে তৈমুরলঙ্গের হৃদয়ে আনন্দ জন্মিত, সেই কার্যের সাহিত এই বাণী এক শ্রেণীভুক্ত করিবার চিন্তা আমি কখনও করি নাই।...'এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য' এই নীতি আপনি আপনার পত্রে যে-ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে উহা রাজনৈতিক লুণ্ঠনের অস্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। ইহার মধ্যে য়ুরোপের নিন্দনীয় অনুকরণ রহিয়াছে।"...ইত্যাদি।

কবি ১লা সেপ্টেম্বর নোগুচির পত্রের জবাব দেন। ঐ দিনই রাত্রে

বোম্বাই থেকে ডাঃ এম. অটলের নেতৃত্বে কংগ্রেস মেডিকেল মিশনের চীন যাত্রার কথা। এই মেডিকেল মিশনের অপর চারজন ডাক্তার ছিলেন—ডাঃ এম. বি. চোলকার, ডাঃ ডি. এন. কোটনিস, ডাঃ দেবেশ মুখার্জী, ডাঃ বি. কে. বসু।

৩১শে আগষ্ট বোম্বাইয়ে 'জিন্না হল'-এ এক বিশাল জনসভায় এই মেডিকেল মিশনের সভ্যদের বিদায়-সম্বর্ধনা জানান হয়। সুভাষচন্দ্র অবশ্য এই সভায় উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি মিশনের সাফল্য ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে একটি বাণী পাঠান। সেটি ছিল এই ঃ

"কংগ্রেসের উদ্যোগে সংগঠিত মেডিকেল মিশনের চীন যাত্রা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বহু প্রাচীন কালে যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জাতিক সংযোগ ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, এই ঘটনায় স্বভাবতঃই সেই অতীত দিনের কথা মনে পড়ে। চীনের সহিত আমাদের সম্পর্ক বরাবরই ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক। এই উভয় জাতিই শান্তিপ্রিয় এবং উভয়ের কৃষ্টিগত ও দার্শনিক মনোভাবের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য বর্তমান। পুরাকালের ভারতীয় পরিব্রাজকদের ন্যায় আমাদের চিকিৎসকরা সেবা, শুভেচ্ছা এবং প্রেমের দূত হইয়া চীনে যাইতেছেন। অবশ্য চীনের বর্তমান সঙ্কটকালে আমাদের দান যে অতি অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে, একথা আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি এবং সেজন্য আমরা দুঃখিত বটে। কিন্তু এই সামান্য দানের সহিত সমগ্র ভারতের অন্তরের যোগ রহিয়াছে। তাই আজ আমি যে বাণী তারযোগে মেডিকেল মিশনের সদস্যদের নিকট পাঠাইতেছি, তাহা শুধু আমারই নহে, উহা সমগ্র দেশের বাণী। আজ যে ভারত আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে সাম্রাজ্যবাদ, স্বৈরাচার এবং ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা উপেক্ষা করিবার মতো ব্যাপার নহে। আসুন, আমরা আমাদের বেসরকারী দূতদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, নির্বিঘ্নে চীনে পৌঁছান এবং তাঁহাদের মহান কর্তব্য পালন করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুন—এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা-১৫ই ভাদ্র, ১৩৪৫ ॥ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮]

তাছাড়াও সুভাষচন্দ্র মিঃ হাতি সিং-এর বাড়ীর ঠিকানায় ডাঃ অটলের নামে স্বতন্ত্রভাবে তারযোগে আর একটি বাণী পাঠান। সেটি ছিল এই :

"চীনের ইতিহাসে এই সন্ধিক্ষণে যখন সে জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে, তখন জাতীয় কংগ্রেস মহান চীন জাতির প্রতি শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি জানাইবার জন্য আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীদিগকে চীনে পাঠাইতেছেন। নানা অসুবিধা সহ্য করিয়া এবং নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া আপনারা আগামী কল্য এই সেবা ও প্রেমের ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য যাত্রা করিবেন। আপনাদের এই সেবা ও প্রেমের কথায় প্রাচীনকালের ভারতীয় প্রাচীন পরিব্রাজকদের কথা মনে পড়ে। আপনারা নিজেদের কার্যদ্বারা স্বদেশের মর্যাদা ও গৌরববৃদ্ধি করিবেন এবং অপর একটি নির্যাতিত দেশের সহিত তাহার সংযোগ সাধনে সহায়তা করিবেন, আমি সর্বান্তঃকরণে এই আশা ও প্রার্থনা করি। আপনাদের জয়যাত্রা সার্থক ও গৌরবমণ্ডিত হউক।" [ঐ]

১লা সেপ্টেম্বর মধ্য রাত্রে বোম্বাই থেকে 'রাজপুতানা' জাহাজে ডাঃ অটলের নেতৃত্বে মেডিকেল মিশনটি চীন যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্বে ডাঃ অটল রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ভিক্ষা করে কবির কাছে নিম্নলিখিত তারবার্তাটি পাঠান :

"We shall leave to-night for China per 'Rajputana'. I and my colleagues have ventured to send you our salutations. 'Bande Mataram'—Atal. Leader Congress Medical Mission to China."

কবি এই তারবার্তা পেয়েই ইউনাইটেড প্রেসের মাধ্যমে ডাঃ অটল ও মেডিকেল মিশনের উদ্দেশে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে নিম্নলিখিত বাণীটি প্রচার করেন। সেটি এই :

"I am happy that the Congress help to China in her hour of need has taken the form of a Medical Mission. This work of helping with which India is properly associated, will cotinue to unite the peoples (of) the East in fellowship

long after the memory of bleeding humanity is banished from our mind."—U.P.

[*Amrita Bazar Patrika* - 3rd September, 1938.]

এর অল্পকাল পরেই কংগ্রেসের আপোষকামী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে কংগ্রেসের বামপন্থী ও অন্যান্য প্রগতিশীল দলের বিরোধ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতাকে উপলক্ষ করেই বামপন্থী ও প্রগতিশীল মহল পরোক্ষভাবে এই সংগ্রাম শুরু করেন। আসন্ন ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনই ছিল তাঁদের আশু লক্ষ্য। সুভাষচন্দ্রের জয়লাভ হলে তাতে করে বামপন্থী ও প্রগতিশীল দলগুলির শক্তিবৃদ্ধি ও সংহতি লাভ করবে, একথা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে বাংলা দেশে এই অন্দোলন ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে ১৮ই আগস্ট বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত বামপন্থী দল ও গোষ্ঠী 'যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী দিবস' পালনের আহ্বান জানালেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিশাল জনসভায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভা বঙ্গীয় প্রাদেশিক লেবার পার্টি, ষ্টুডেণ্টস্ ফেডারেশন, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ,—প্রভৃতি দল ও সঙ্ঘের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বক্তা যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করে তার প্রতিরোধের জন্য দেশবাসীকে এক দুর্বার গণ-আন্দোলনের আহ্বান জানালেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ

"যেহেতু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের উপর প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা চাপাইতে চেষ্টা করিতেছেন ও তাহা দ্বারা প্রতিষ্ঠান, আন্দোলন ও কথা বলিবার স্বাধীনতা হরণ করিয়া সম্রাজ্যবাদী শাসন দৃঢ় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেই জন্য এই সভা উক্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত করিতে জনসাধারণকে আহ্বান করিতেছে। এই সভা আরও অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার নীতির

ভিত্তিতে গঠিত কনস্টিট্যুয়েন্ট এসেম্বলী কর্তৃক স্বাধীন ভারতের জন্য যে রাষ্ট্রতন্ত্র গঠিত হইবে, তাহাই ভারতবাসী গ্রহণ করিবে।”

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ৩রা আশ্বিন, ১৩৪৫ ॥ ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮]

ঠিক এই সময়ই সুদেতেন নিয়ে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার উদ্দেশে প্রচণ্ড হুমকী ও ভীতিপ্রদর্শন করতে থাকে। চেক-সুদেতন সমস্যাকে উপলক্ষ করে ইউরোপের রাজনীতিক সঙ্কট অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে উঠল। চেম্বারলেন হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এলেন হিটলারকে ঠাণ্ডা করার জন্য। তারপর মিউনিকে চতুঃশক্তি সম্মেলন শুরু হল। ২৯শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে স্বাক্ষরিত হল কুখ্যাত ঐতিহাসিক ‘মিউনিক চুক্তি’। তাতে হিটলারের প্রায় সমস্ত দাবীই ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স মেনে নিল। ফলে সুদেতন নাৎসী-হাঙ্গরের পেটে তলিয়ে গেল। ইতিহাসে এতবড় জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার নজির আর নেই।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। চেকোশ্লোভাকিয়ার এই সংকট কালে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্রের খবরে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত হন। মিউনিক সম্মেলনের আলোচনার দিকে দৃষ্টি রেখেই কবি চেক্ প্রেসিডেন্ট বেনেসের কাছে তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে একটি তারবার্তা পাঠান (২৪শে সেপ্টম্বর)। সেটি এই ঃ

“বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্তে আপনার দেশ নিঃসঙ্গ ও একক হইয়া পড়িয়াছে। এই শোচনীয় ঘটনায় ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে এবং নিজের পক্ষ হইতে গভীর দুঃখ ও বিক্ষোভ জানাইতেছি। আমি আশা করি এই আঘাত আপনার জাতির অন্তরে নবজীবনের সঞ্চার করিবে এবং ইহার ফলে সে নৈতিক জয় ও পূর্ণ আত্মোপলব্ধির অবাধ সুযোগ অর্জন করিবে।”—এ. পি.

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ৮ই আশ্বিন, ১৩৪৫ ॥ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮]

দিল্লীতে তখন ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন চলেছে। গান্ধীজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতারা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে মিউনিক আলোচনার

ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে সাময়িকভাবে সঙ্কটের অবসান হলেও ওয়ার্কিং কমিটি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। মিউনিক চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে গান্ধীজী 'হরিজন'-এ লিখলেন,

"সাতদিনের পার্থিব অস্তিত্বের জন্য ইউরোপ তাহার বিবেক বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। মিউনিকে ইউরোপ যে শক্তি লাভ করিয়াছে, তাহা হিংসার জয়। উহাকে পরাজয় বলা যায়। যদি ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স নিজেদের জয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ থাকিতেন, তবে তাঁহারা চেকোশ্লোভাকিয়াকে রক্ষা করিবার কর্তব্য অবশ্য পালন করিতেন বা সেই কর্তব্য পালন করিতে যাইয়া মৃত্যুবরণ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা জার্মানী এবং ইটালীর সম্মিলিত শক্তির সমক্ষে কম্পিত হইলেন।"......

এই সময় আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সূচনা হয়। ২রা ও ৩রা অক্টোবর দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের এক সম্মেলন হয়। কংগ্রেসের শিল্পমন্ত্রীরা ছাড়াও এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া, জে. বি. কৃপালানি, জি. ডি. বিড়লা, শঙ্করলাল দেও এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আধুনিক শিল্পায়নের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে বললেন,

"No industrial advancement was possible until they passed through the throes of an industrial revolution. If industrial revolution was an evil, it was a necessary evil. They could only try their best to mitigate the ills that had attended its advent in other countries. Further more, they had to determine whether this revolution would be a comparatively gradual one as in Great Britain or a forced march as in Soviet Russia. I am afraid that it has to be a forced march in this country. In the world as it is constituted to-day a community which resists

industrialisation has little chance of surviving international competition."

[*Hindusthan Standard* - 6th October, 1938]

এই সম্মেলনেই সারা ভারতবর্ষব্যাপী আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পায়ণের জন্য অবিলম্বে একটি 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন' (National Planning Commission) গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এর কয়েকদিন পরেই সুভাষচন্দ্র বোম্বাই থেকে কলকাতা যাবার পথে 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি'র সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন (১৬ই অক্টোবর)। কমিটির সদস্যরা ছিলেন : (১) স্যর এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া, (২) ডঃ মেঘনাদ সাহা, (৩) স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, (৪) অম্বালাল সারাভাই, (৫) অধ্যাপক কে. টি. সাহা, (৬) বোম্বাইয়ের কটন্ রিসার্চ ল্যাবরেটারির নাজির আমেদ, (৭) মিঃ এ. ডি. শ্রফ, (৮) সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের অধীনে নিযুক্ত ভূতপূর্ব ইঞ্জিনিয়ার এ. কে. সাহা, (৯) হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ডি. এস. দুবে। তাছাড়া কমিটিকে আরও সদস্য গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

জওহরলাল তখন ইউরোপে। সুভাষচন্দ্র এই সব খবর জানিয়ে তাঁকে 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি'র সভাপতির পদ গ্রহণের অনুরোধ জানান। কলকাতা যাত্রার পূর্বে সুভাষচন্দ্র কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করে তাঁর বিবৃতিতে বললেন, "জাতীয় শিল্প পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি পদ গ্রহণ করিবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং আমি তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছি।......আমি আশা করি যে কমিটি যাহাতে শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করিতে পারে তজ্জন্য এই কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রদেশসমূহ অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।"—ইউ. পি

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ১লা কার্তিক, ১৩৪৫ ॥ ১৭ই অক্টোবর, '৩৮]

যাই-ই হোক, যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরোধিতা, 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং

কমিশন', এবং কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল সংগ্রামী শক্তিগুলির সংহতির স্বার্থেই যে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন একান্ত প্রয়োজন, দেশের বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলি একথা স্পষ্টই উপলব্ধি করে তাঁদের ঐ দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। উল্লেখযোগ্য, বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'ভারতের কমিউনিষ্ট' পার্টির তৎকালীন মুখপত্র *National Front*-ই সর্বপ্রথম সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের দাবীতে যুক্তি দিয়ে তাঁদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখলেন (১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৮),

"At a time when the greatest need of our movement is national unity, but when a section of our leadership is threatening civil war within the Congress, Mr. Subhas Chandra Bose, the President of the Congress, is the living link uniting the two wings of our movement. We must whole heartedly campaign for the re-election of Mr. Subhas Chandra Bose as the next Rashtrapati.……Mr. Subhas Bose along with Pandit Nehru has done more than any other single leader to modernise the out look of Congress-men, radicalise our movement so as to fit in more with the realities behind the basic problems facing us. Against British Imperialism which seeks to forcibly impose Federa-on, Mr. Bose is our strong anti-Federation President."

[দ্রঃ *Hindusthan Standard* - 17th October, 1938]

১৭ই অক্টোবর সাজ্জাদ জাহির, জেড্. এ. আমেদ, সোহন সিং যশ, ভগৎ সিং, রাম মূর্তি, পি. সুন্দারাইয়া ও ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ প্রমুখ 'কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির' (বলা বাহুল্য পরবর্তী কালে এঁদের অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন) নেতারা এক বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন দাবী করেন। ২২শে অক্টোবর হুমায়ুন কবীর, নবাবজাদা সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী, মোয়াজ্জেম আলী চৌধুরী, আবু

হোসেন সরকার, আবুল মনসুর আমেদ, এ. রসিদ খাঁ প্রমুখ বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতারা এক বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন দাবী করলেন। এই ভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এই দাবী উঠতে লাগল। উল্লেখযোগ্য, এর কয়েকদিন পর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র স্বয়ং এক বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন দাবী করে বললেন (৭ই নভেম্বর),

…"বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া এবং দেশের ও বিদেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্যকরূপে বিবেচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, সুভাষচন্দ্র বসুই বর্তমানে কংগ্রেস সভাপতি হইবার যোগ্যতম ব্যক্তি। আর এক বৎসরের জন্য সুভাষচন্দ্রকেই সভাপতিপদে রাখা উচিৎ কিনা, তাহা আমি মহাত্মা গান্ধী এবং উচ্চতর কংগ্রেস পরিষদকে বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।"……

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২২শে কার্তিক, ১৩৪৫ ॥ ৮ই নভেম্বর, ১৯৩৮]

ঠিক এই সময়েই ডঃ মেঘনাদ সাহা রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হলেন, যাতে তিনি এই ব্যাপারে গান্ধীজী ও জওহরলালকে সুপারিশ বা অনুরোধ করে কিছু লেখেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এ-সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত আলোচনা করব।

সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন : ডঃ মেঘনাদ ও রবীন্দ্রনাথ

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্পাদিত *'A Bunch of Old Letters'* প্রকাশিত হলে (১৯৫৮) সাধারণ লোকে আভাস পায়, রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারে সুপারিশ করে গান্ধীজী ও জওহরলালকে পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু এই পত্র লেখার ব্যাপারে ডঃ মেঘনাদ সাহা-ই যে কবিকে প্রভাবিত করেছিলেন, এ খবর অনেকেরই জানা নেই। তা ছাড়া ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশনের ব্যাপারেও তিনিই বুঝিয়ে-শুনিয়ে কবিকে এতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিলেন।

উল্লেখযোগ্য, 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন' গঠনের ব্যাপারে সেই সময় যাঁরা প্রধান উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, ডঃ সাহা তাঁদের অন্যতম। শুধু তা-ই নয়, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগে আমাদের দেশে যুক্তিবাদী ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তনের জন্য যাঁরা দৃঢ় সংগ্রাম করেছিলেন, ডঃ সাহা ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

ছাত্রজীবন শেষ করে ডঃ সাহা যখন তাঁর গবেষণা ও অধ্যাপনাবৃত্তি শুরু করেন, ভারতবর্ষে তখন 'গান্ধী-যুগের' প্লাবন শুরু হয়েছে। চরকা ও অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবনে দেশ ভেসে যাচ্ছে। অসহযোগ আন্দোলনের সূচনাতেই গান্ধীজীর বিখ্যাত *Hind Swaraj* পুস্তিকার পুনর্মুদ্রণ হয় (১৯২১ জানুয়ারী)। গান্ধীজী তার ভূমিকায় লিখলেন,

......"I withdraw nothing except one word of it, and that in deference to a lady friend.

"The booklet is a severe condemnation of 'modern civilization'. It was written in 1908. My conviction is deeper to-day than ever, I feel that if India will discard 'modern civilization,' she can only gain by doing so." [***Hind Swaraj***—**pp. 16-17**]

সেই জাতীয় উন্মাদনার যুগে হিন্দ স্বরাজ-এর আর্থনীতিক জীবনদর্শন দেশের অধিকাংশ মানুষকেই আচ্ছন্ন করেছিল। দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই তখন গান্ধীজীর অনুকরণে চিন্তা করছেন ও কথা বলছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত বৈজ্ঞানিকও চরকা-দর্শনের মহিমা প্রচার করছেন। স্মরণ রাখা দরকার, সেদিন রবীন্দ্রনাথই এই অসহযোগ তত্ত্ব ও হিন্দ স্বরাজের জীবনদর্শনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তার জন্য তিনি দেশবাসীর কাছ থেকে—এমন কি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছ থেকে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। (অবশ্য এর কয়েক বৎসর পরেই আচার্য রায় আধুনিক যন্ত্রশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলবার চেষ্টা করেন)। উল্লেখযোগ্য, তরুণ বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহাও সেদিন চরকা-দর্শনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা দরকার। ১৯২২ সালের শেষভাগে সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে বঙ্গীয় যুবক সম্মেলনের অধিবেশনে মেঘনাদ আমন্ত্রিত হন। এই সম্মেলনে সেদিন 'জাতীয় উন্নতির উপায়' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি 'হিন্দ স্বরাজ'-এর জীবনদর্শনের সমালোচনা করে তাঁর ভাষণে বলেন, (নব্য ভারত - ৩৪ খণ্ড॥ অগ্রহায়ণ ১৩২৯), "বর্তমান সভ্যতার মূলমন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞান। আমি পূর্বেই বলেছি যে, বেঁচে থাকতে হলে আমাদের প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে হবে এবং প্রকৃতির সাথে সংগ্রামে জয়ী হতে হলে আমাদের বিজ্ঞানের সেবা করতে হবে। এ বিষয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বহু স্থলে বলেছেন। আজকাল Back to nature রব উঠেছে; কলকারখানা সব তুলে দাও, দৌলত (Capital) ও মেহনত (Labour)-কে একই পর্যায়ে আন। অনেকেরই বিশ্বাস যে, বলশেভিক রাশিয়াতে সমস্ত কলকারখানা তুলে দেওয়া হয়েছে। এ কথা ঠিক নয়—রাশিয়াতে বরং বেশী উৎসাহে দেশময় কলকারখানা স্থাপন করা হচ্ছে।...

"রাশিয়ার প্রায় অধিকাংশ রেলপথ তাড়িতশক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এবং লেনিনের জীবনে মস্ত একটা আকাঙ্ক্ষা যে, দেশের সমস্ত কাজ— কলকারখানা, বা খনির কাজ, এমন কি চাষবাস পর্যন্ত তাড়িতশক্তিতে চালান।

বলশেভিকগণ শুধু যান্ত্রিক সভ্যতার অপব্যবহারকে—ধনী ও দরিদ্রের তারতম্য —উঠাইয়া দিয়াছেন। যান্ত্রিক সভ্যতার অপব্যবহারকে বিজ্ঞানচর্চার ফল বলে ধরে নেওয়া একটা মস্ত ভুল।..."

উপসংহারে তিনি বলেন, "দেশের দারিদ্র্যমোচন করতে হলে শুধু 'ত্যাগ'-এ চলবে না। যে ব্যক্তি সমর্থ, ত্যাগ তাহাকেই সাজে, অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ত্যাগ 'অযোগ্যতা'রই নামান্তর মাত্র। দেশের যুবকদের আদর্শ হবে যে, দেশের দারিদ্রমোচন করতে হবে, দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও সর্বপ্রকার স্বাধীন বৃত্তি যা এখন বিদেশীর হস্তগত তাহাতে ক্রমে ক্রমে ঢুকতে হবে। এই দেশে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাবার জন্য ভবিষ্যতে যে বিরাট আয়োজন হচ্ছে, তার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু এই সংগ্রামের উপযুক্ত হতে হলে নিয়তির উপর নির্ভরতা কমাতে হবে, জীবনব্যাপী সাধনা ও শিক্ষা করতে হবে।..."

[দ্রষ্টব্য মেঘনাদ রচনা সংকলন - পৃঃ ২৪-২৬]

লক্ষ করবার বিষয়, তখন থেকেই সোভিয়েত রাশিয়ার গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের দিকে তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। স্মরণ রাখা দরকার, সোভিয়েত রাশিয়ায় তখনও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হয় নি। কিন্তু সোভিয়েতের গঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টায় লেনিনের মূলনীতির তাৎপর্যটি উপলব্ধি করতে তাঁর সেদিন কোন অসুবিধা হয় নি। বলা বাহুল্য, সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে তখন এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের স্পষ্ট কোন ধারণাই ছিল না।

বস্তুতঃ ১৯২৭-২৮ সাল থেকেই জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রসার ঘটতে থাকে। এই সময় জওহরলাল রাশিয়া পরিদর্শন করে আসার পর সোভিয়েতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বই লিখলেন। ১৯৩০ সালের শেষভাগে 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকলে সোভিয়েতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রবল ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ জন্মাতে থাকে। কিন্তু এই সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন

অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকায় পরিকল্পনা ও আর্থনীতিক পুনর্গঠন নিয়ে চিন্তা করবার কারুর অবকাশ ছিল না। দীর্ঘ চারটি বছর দেশ ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করেছে। ১৯৩৪ সালে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে দেশকর্মীদের গ্রামে ফিরে গিয়ে খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করবার আহ্বান জানান। এই বৎসরই বোম্বাই কংগ্রেসে (১৯৩৪ অক্টোবর) গান্ধীজী কংগ্রেস ত্যাগ করে কংগ্রেস কর্মীদের সম্মুখে 'অখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘ' (All India Village Industries Association) গঠনের প্রস্তাব রাখেন। তাঁর এই প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এর অল্পকাল পরে গান্ধীজীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই সঙ্ঘের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হতে রাজী হন। বলা বাহুল্য, গান্ধীজী ও কুমারাপ্পার এই গঠনমূলক কর্মসূচীতে গ্রামীণ শিল্প পুনর্গঠনের বিস্তারিত পরিকল্পনা থাকলেও বৃহদাকার যন্ত্রশিল্প ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার কোন স্থান ছিল না।

কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর কংগ্রেসকে দেশের বেকার সমস্যা, দারিদ্র্য ও আর্থনীতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। জওহরলাল তখন কংগ্রেস সভাপতি। ১৯৩৭ সালেই আগস্ট মাসে ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে (১৪-১৭ আগস্ট) আর্থনীতিক পুনর্গঠনের প্রশ্নে কংগ্রেস মন্ত্রীদের একটি আন্তর্প্রাদেশিক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। নানা গোলমালে তখন এটি কার্যকরী হতে পারে নি। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন (হরিপুরা কংগ্রেস)। ঐ বৎসরেই মে মাসে তিনি কংগ্রেসের প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীদের এক বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটির উপযুক্ত সিদ্ধান্তটি কার্যকরী করবার আবেদন জানান। ১৯৩৮ সালের ২৫শে জুলাই ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে কংগ্রেসের শিল্পমন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান করে দেশের পরিকল্পনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের ব্যাপারে কংগ্রেস সভাপতির উপর দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়।

বলা বাহুল্য, কংগ্রেস নেতারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবার পূর্বেই

এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞানীরা যন্ত্রশিল্প ও সুপরিকল্পিত আর্থনীতিক পুনর্গঠনের পক্ষে লিখতে থাকেন। এই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও এর স্বপক্ষে প্রবল যুক্তি দিয়ে লিখতে থাকেন। তিনি *Modern Review*-এ বিশেষ পরিকল্পনা সংখ্যা প্রকাশ করলেন (আগস্ট ১৯৩৮)। এতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ এস. এস. ভাটনগর, জি. এল. মেটা, ডি. পি. খৈতান, এ. আর. দালাল, অধ্যাপক সুব্রাহ্মনিয়াম প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা তথ্যপূর্ণ ও মননশীল নিবন্ধ লিখলেন। উল্লেখযোগ্য, এই সংখ্যায় ডঃ মেঘনাদ সাহা "The Philosophy of Industrialisation" এই শিরোনামায় যে নিবন্ধটি লিখেছিলেন তাতে তিনি কংগ্রেস নেতাদের যে জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনো ধারনাই নেই, এই রকম সংশয় প্রকাশ করে তিনি এই সম্পর্কে তাঁদের ঔদাসীন্যের অভিযোগ করেছিলেন। এর অল্পকাল পরেই তিনি গান্ধীজীর 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনার'ও বিরূপ সমালোচনা করলেন। মেঘনাদের এই সব লেখায় বেশ উত্তাপ ছিল, সুতরাং তার সমালোচনা চলতে লাগল। এই বৎসরই আগস্ট মাসে (২১শে) Indian Science News Association-এর পক্ষ থেকে মেঘনাদ সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানান। এই সভায় তিনি সুভাষচন্দ্রকে প্ল্যানিং কমিশন সম্পর্কে কংগ্রেসের পরিকল্পনার বিষয়ে কিছু প্রশ্ন ও আলোচনাদি করে তাঁর সম্পর্কে খুব সন্তুষ্ট হন (দ্রঃ *Crossroads*—pp. 51-55)। এই আলোচনার কিছুকাল পরে, ২রা অক্টোবর দিল্লীতে কংগ্রেসী শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র প্ল্যানিং কমিশনের একটি খসড়া পেশ করেন। এই সম্মেলনে প্ল্যানিং কমিশনের একটি অস্থায়ী কমিটিও গঠিত হয়, পূর্বেই তা উল্লেখ করেছি। এদিকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার পর মেঘনাদ সাহা তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত আশান্বিত হন যে, প্ল্যানিং কমিশনকে সার্থক করে তুলতে হলে কংগ্রেস সভাপতি পদে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন। এই সময় তাঁর রবীন্দ্রনাথের কথা মনে আসে। রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি পূর্বেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর ধারণা হয় যে, রবীন্দ্রনাথকে তিনি যদি তাঁর এই পরিকল্পনার কথাটা বোঝাতে পারেন এবং তিনি

যদি প্ল্যানিং কমিশন ও সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের পক্ষে গান্ধীজী ও জওহরলালকে একটু চাপ দেন তা হলে তাতে আর কোন বাধা থাকবে না। এই রকম একটা উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা নিয়ে তিনি কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা এবং শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করে তাঁকে এক পত্র দেন (৭ই নভেম্বর, ১৯৩৮)। পত্রটি যথাযথ উদ্ধৃত করা হল :

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স
ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিকস্

৯২, আপার সার্কুলার রোড,
৭।১১।৩৮

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার দুর্ভাগ্যক্রমে একাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতন দেখা হয় নাই। যদি অনুমতি করেন, আগামী রবিবার ১৩ই নভেম্বর শান্তিনিকেতন আসিতে চাই। আপনার সময়ের হয়ত একটু অপব্যবহার হইবে। পত্রোত্তরে দুই লাইন লিখিলে সুখী হইব।

ইতি প্রণত
(স্বাঃ) শ্রীমেঘনাদ সাহা

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই মেঘনাদ সাহার চিন্তা ও বক্তব্য সম্পর্কে কিছু কিছু শুনেছিলেন। পত্র পাওয়ার কয়েক দিন পরই তিনি ডঃ সাহাকে তাঁর পরিকল্পনা ও বক্তব্য বিষয় বুঝিয়ে বলবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কবির পত্রটি ছিল এই :

ডঃ মেঘনাদ সাহা
৯২, আপার সার্কুলার রোড : কলিকাতা

শান্তিনিকেতন

ওঁ

পরম কল্যাণীয়েষু,

তুমি আমাদের আশ্রমে আসবার সংকল্প করেছ এই সংবাদে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আশা করি কোনো বাধা ঘটবে না। এই সম্বন্ধে শ্রীমান

অনিলকুমার তোমাকে পূর্বেই আমার প্রস্তাব জানিয়েছে। গ্রাম-সংস্কার সম্বন্ধে এখানে যাঁরা কর্মী তাঁরা তোমার মুখ থেকে পরামর্শ শোনবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে আছেন।

ইতি ১১।১১।৩৮

তোমার গুণগ্রাহী

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির এই পত্র পাওয়ার পর ১৩ই নভেম্বর (১৯৩৮) মেঘনাদ শান্তিনিকেতন যাত্রা করেন। ঐদিনই শান্তিনিকেতনে 'সিংহ সদন'-এ এক সম্বর্ধনা-সভায় কবি স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এই সভায় মেঘনাদ 'একটি নূতন জীবনদর্শন' প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে তাঁর ভাষণে বলেন,

"কিন্তু এই জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য অনেকে বলেন যে আমাদিগকে শহর হইতে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া কুটীর ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই এই সমস্ত যুক্তির অসারতা বুঝা যায়। বৈজ্ঞানিক স্বভাব সর্বদা সংখ্যার সাহয্যে চিন্তা করা। আমাদের দেশে একজন সাধারণ লোক যে পরিমাণ কার্য করে, তাহার সহিত য়ুরোপ ও আমেরিকার সাধারণ লোকের কৃত কার্যের তুলনা করা যাউক। অনায়াসে প্রমাণ করা যায় (এবং অন্যত্র আমি প্রমাণ করিয়াছি) যে, আমরা ভারতবর্ষে জনপিছু পাশ্চাত্ত্যের কুড়ি ভাগের এক ভাগ মাত্র কার্য করি। তাহার কারণ, পাশ্চাত্ত্য দেশে যত প্রাকৃতিক শক্তি আছে—যেমন জলধারার শক্তি, কয়লা পোড়াইয়া তজ্জাত শক্তি—তাহার অধিকাংশই কার্যে লাগান হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একটা ঘোড়া মানুষের দশ গুণ কার্য করিতে সমর্থ এবং য়ুরোপ ও আমেরিকায় যন্ত্রযোগে যে শক্তি উৎপাদন করা হয় তাহা বৎসরে মাথাপিছু একটা ঘোড়ার ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ৩৬৫ দিনের কার্যের সমান। আমাদের দেশে শক্তির অভাব নাই, কিন্তু মাত্র শতকরা দুই ভাগ কার্যে লাগান হইয়াছে। অধিকাংশ কার্যই হস্তে সম্পন্ন হয়, অতএব মোটের উপর

এ দেশে লোকে মাথাপিছু ২০ গুণ কার্য কম করে। তজ্জন্য আমরা য়ুরোপ ও আমেরিকা ইত্যাদি উন্নত দেশের তুলনায় ২০ গুণ বেশী গরীব। দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যে লাগাইতে হইবে এবং সেই ভিত্তির উপর যান্ত্রিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

"গ্রামজীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে আমি কোনও অলীক আশা পোষণ করি না। আমি মনে করি না যে, গ্রামগুলি বসতির দিক হইতে আদর্শ স্থানীয়। যদি শহরবাসী লোক জীবিকানির্বাহের জন্য গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তাহা হইলে তাহারা কেবল গ্রামের যাবতীয় সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিবে। গ্রামে ফিরিয়া গেলেই জীবিকানির্বাহের জন্য গ্রামবাসী-দিগের সহিত আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিবে, গ্রামবাসীরা আমাদের ভাল চোখে দেখিবে না। গ্রামবাসীগণ কি চায়? তাহারা চায় ভাল ঘরবাড়ি, পর্যাপ্ত খাদ্য ও বস্ত্র এবং জীবনে অপেক্ষাকৃত প্রচুর অবকাশ ও প্রাচুর্য। যদি দেশে প্রচুর কার্যের সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। প্রচুর পরিমাণ কার্যের সৃষ্টি করিলে দেশের যে কেবল দুঃখ ও দারিদ্র্যের সমাধান হয় তাহা নহে, আমাদিগের আত্মরক্ষার খাতিরেও কার্য সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক হইতেই বৈদেশিক আক্রমণের মহা আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। যদি কোনও দিন এই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয় এবং যদি আমরা পুনর্বার বিদেশীয়গণের পদানত হইবার ইচ্ছা না করি—তবে আমাদিগকে য়ুরোপ ও আমেরিকার মত যান্ত্রিক সভ্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হইবে। ভারতের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন, তাঁহারা বলেন যে ভারতবর্ষের পক্ষে চিরকাল কৃষিপ্রধান হইয়া থাকা উচিত। এই মত অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া মনে করি। যদি আমরা সকলেই গ্রাম্যজীবনে 'ফিরিয়া যাই তাহা হইলে মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীদের পক্ষে শোষণ ,করা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্ত্য দেশে যাবতীয় 'চাবি-শিল্পে'—যেমন শক্তি উৎপাদন, যন্ত্রপাতি তৈয়ার, যাতায়াত ও রাস্তাঘাট সম্বন্ধীয় শিল্প ইত্যাদি—সমস্তই রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন এবং কখনও কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের খাতিরে এই সমস্ত শিল্পকে

রাষ্ট্রের ক্ষমতা-বহির্ভূত হইতে দেওয়া হয় না। এ দেশেও এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে যেমন ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে চীনের উদ্ধারকর্তা Dr. San yat-Sen চীনের জন্য পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এইরূপে দেশকে শিল্পপ্রধান করিতে হইবে, রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে মূলধন তুলিয়া দেশে নানাবিধ নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই আমাদের দেশ য়ুরোপ ও আমেরিকার ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে।"

[ভারতবর্ষ - ২৬ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬]

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে এ সব কিছু নূতন কথা নয়। বস্তুতঃ মেঘনাদ কবির অন্তরের কথাটাই বলেন—এর মূল কথাটাই কবি বহুকাল ধরে বিভিন্ন ভাবে ও ভাষায় বলে আসছিলেন। এরপর কবি বাংলায় মেঘনাদের এই ভাষণের সংক্ষিপ্তসার করে যা বলেন, তার মর্মার্থ ছিল এই, "ডঃ সাহার বক্তৃতার দুটি জিনিস আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে। প্রাচীন কালের অনাবশ্যক অর্থহীন প্রথা ও ঐতিহ্যকে অন্ধভাবে মেনে চলার প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছেন তিনি এবং তার জায়গায় জাতির সম্মুখে এক নূতন জীবনদর্শন তুলে ধরবার পক্ষে তিনি শক্তিশালী যুক্তি দিয়েছেন—যা আমাদের রাজনৈতিক সামাজিক এবং শিল্প-উন্নয়নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। শিল্প-উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি তথ্যাদি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এর মূল চাবিকাঠি রয়েছে রাষ্ট্রের সমন্বিত প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক শক্তি সম্পদকে শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ ও তাকে সহজলভ্য করে তুলতে পারার উপর। আমাদের তথাকথিত হিতৈষী বন্ধুদের মন্ত্রণাকে অন্ধভাবে মেন নিয়ে তাদেরকে তাদের স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে আর আমাদের শক্তিসম্পদকে শোষণ করতে দিতে পারি না। যুগের অগ্রগতির তালে তাল রেখে আমাদের চলতে হবে—বিশেষ করে আমাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। অধ্যাত্মবাদের নামে দারিদ্র্য ও প্লেগ্‌কে বরণ করে নেবার দিনকাল চিরতরে শেষ হয়েছে এবং এ কথা আমাদের অতি অবশ্য উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের সভ্যতা যত বড় ও মহানই হোক না কেন তা ভেঙে ধূলায় গুঁড়িয়ে যাবে

যদি না তাকে রক্ষা করার মত উপযুক্ত শক্তি বা ক্ষমতা আমরা অর্জন করতে পারি।"

[*Visva Bharati News* - November, 1938—pp. 44-46.]

সম্ভবতঃ মেঘনাদ প্রথমেই সরাসরি কবিকে তাঁর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার কথাটা বলতে সাহস পান নি। এই ব্যাপারে তিনি প্রথমে কবির সেক্রেটারী শ্রীঅনিল চন্দর সঙ্গে সব কথা খুলে আলোচনা করেন। এই আলোচনার পর স্থির হয় যে অনিলবাবু সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যটি কবিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই ব্যাপারে গান্ধীজী ও জওহরলালকে চিঠি লেখাতে চেষ্টা করবেন। কিন্তু কলকাতায় ফিরে গিয়ে মেঘনাদ স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। পরদিনই তিনি অনিল চন্দ মহাশয়কে ইংরেজীতে এক পত্রে যা লিখলেন (১৫ নভেম্বর, ১৯৩৮) তার মর্মার্থ ছিল এই ঃ

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স
ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিকস্
১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ চন্দ,

আমার শান্তিনিকেতন পরিদর্শনকালে আমার প্রতি যে আতিথেয়তা দেখানো হয়েছিল, তার জন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনার নির্দেশমত সমস্ত জিনিসটা আমি এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসকে পাঠিয়ে দিয়েছি। অনুগ্রহ করে কবিকে আমার পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন।

আমাদের দুজনের মধ্যে আলোচনাক্রমে যে দুটি বিষয়ে আমরা ঐক্যমত হয়েছিলাম, আশা করি আপনি কবিকে সেই মত বুঝিয়ে মহাত্মাজীকে ও জওহরলালকে দুটি চিঠি লেখাতে সক্ষম হয়েছেন। আর তা পাঠিয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে আমাকে তার কপি পাঠিয়ে দেবেন। Philosophy of Industrialisation নামে আমার প্রবন্ধটি সম্পর্কে কবি আগ্রহ প্রকাশ

করেছিলেন। সেই জন্য এই প্রবন্ধটির দুই কপি এবং Indian National Institute-এর বিগত অধিবেশনে আমার দুটি বক্তৃতার কপিও এই সাথে আপনাকে পাঠালাম। আপনি এই প্যামফ্লেটগুলির 'পরে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরে খুবই বাধিত হব। তিনি যদি তাঁর শক্তিশালী লেখনী আমার মতের স্বপক্ষে ধারণ করেন—যা নাকি আমার মতে দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষেরই প্রসারিত করে দেওয়া উচিত—তাহলে আমি খুবই আনন্দিত হব।

আপনার বিশ্বস্ত

(স্বাঃ) এম. এন. সাহা

অনিলকুমার চন্দ

সেক্রেটারী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

উল্লেখযোগ্য, অনিল চন্দ মহাশয় এ-ব্যাপারে সফল হয়েছিলেন। ১৯শে নভেম্বর (১৯৩৮) রবীন্দ্রনাথ জওহরলালকে যে পত্রটি লেখেন সেটি '*A Bunch of Old Letters*'-এ সংকলিত হয়েছে। স্মরণ রাখা দরকার, জওহরলাল তখন সবে ইউরোপ থেকে ফিরেছেন। কবির পত্রটির মর্মার্থ ছিল এই ঃ

"প্রিয় জওহরলাল—এই মাত্র কাগজে তোমার দেশে প্রত্যাবর্তনের কথা পড়লাম। সারা দেশের স্বাগত ধ্বনির সঙ্গে ত্বরান্বিত হয়ে আমার স্বর মিলিয়ে দিচ্ছি।

তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আমি বড়ই উৎসুক। তোমার সূচীতে যদি শান্তিনিকেতন ভ্রমণের কথাটা রাখ, আমি সুখী হব।

এই সেদিন ভারতীয় শ্রমশিল্পের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা নিয়ে ডঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দীর্ঘ এবং চমৎকার এক আলোচনা হল। আমি এর গুরুত্ব সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয়। তুমি কংগ্রেস পরিচালনার জন্য সুভাষ-গঠিত কমিটির সভাপতি হতে রাজী হয়েছ বলে এ-সম্পর্কে তোমার অভিমত জানতে চাই।"...

অনিল চন্দ মশায় এই পত্রের কপি মেঘনাদকে ঐদিনই পাঠিয়ে এক পত্রে (ইংরেজীতে) তাঁকে লিখলেন (১৯।১১।৩৮),

১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় ডঃ সাহা,

অনিবার্য কারণে আপনার চিঠির জবাব দিতে দেরি হল, আশা করি তার জন্য ক্ষমা করবেন। আপনার প্রবন্ধগুলিও পেয়েছি। কবি সেগুলি মহা আগ্রহের সঙ্গে পড়ছেন।

দেখবেন এই সাথে জওহরলালকে লেখা কবির পত্রটি পাঠালাম। আশা করি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে এই-ই যথেষ্ট হবে। আর অপর বিষয়টির ব্যাপারে মহাত্মাজীকে চিঠি লেখাটা ঠিক হবে কিনা, এ বিষয়ে কবি নিশ্চিত হতে পারছেন না। তিনি ভাবছেন, মহাত্মাজীকে তাতে সংকটে ফেলবেন যদি গুরুতর রাজনীতিক সংকটের অবস্থার জন্য অন্য কোন সভাপতির অন্বেষণ আবশ্যক হয়ে থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় না, কবি এ বিষয়ে চূড়ান্ত কিছু ঠিক করে ফেলেছেন।

এর পূর্বেই একদিন *Moscow News*-এর—আমরা যা নিয়মিত পেয়ে থাকি—এক কপি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম। আপনি এতে আগ্রহ অনুভব করলে অনুগ্রহ করে আমাকে তা জানাবেন। সোভিয়েত পুস্তকের তালিকাগুলি আমি দেখেছি, কিন্তু আমি দুঃখিত যে, এর মধ্যে আপনার আগ্রহ থাকার মতো একটাও বই নেই ;—সেগুলি সাধারণ শিল্প-সাহিত্যের বই।

বিনীত শ্রদ্ধান্তে

আপনার বিশ্বস্ত

(স্বাঃ) এ. কে. সি

এই পত্রের জবাবে মেঘনাদ অনিল চন্দকে পুনরায় তাঁর বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করে লিখলেন (২২শে নভেম্বর, ১৯৩৮),*

* ডঃ সাহা ও অনিল চন্দের মধ্যে ইংরেজিতে যে-সব পত্রবিনিময় হয় এখানে তার বাংলা মর্মার্থ দেবার চেষ্টা করা হল।

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স
ডিপার্টমেণ্ট অব ফিজিক্স্
২২শে নভেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ চন্দ,

আপনার ১৯শে নভেম্বর তারিখের অনুগ্রহলিপির জন্য খুবই ধন্যবাদ। ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করার জন্য কবি যে জওহরলালকে লিখছেন এজন্য বাস্তবিকই আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

অপর বিষয়টির ব্যাপারেও কবি যদি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হন তা হলে আনন্দিতই হব। আর এ বিষয়ে আমার যুক্তিগুলি পুনরুল্লেখ করছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাকে নিশ্চিত জানাই, কোন ব্যক্তি-বিশেষের জন্য আমার কিছু ওকালতি নাই। এই 'ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং'-এর ব্যাপারটা আমার হৃদয়ের সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে এবং আমি চাই যে, আমাদের পরিশ্রমটা যেন শুধুমাত্র পণ্ডিতী বা 'অ্যাকাডেমিক' ব্যাপার হিসাবে দেখা না হয়, পরন্তু এটি যেন জাতীয় কংগ্রেসের দ্বারা কার্যকরী করা হয়। নেতাদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতাটা তাদের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। কলকাতায় আমি শ্রীযুক্ত বসুর সঙ্গে কয়েকদিনই এ বিষয়ে আলোচনা করে তাঁকে আমার স্বমতে আনতে সক্ষম হয়েছি। তাই, যদি তিনি সভাপতি-পদে বহাল থেকেই যান, তা হলে তিনি আপনা-আপনিই Industrial Planning Commission-এর চেয়ারম্যান হয়ে যাবেন—যাঁর কাজ হবে কমিশনের সুপারিশগুলি বাস্তবে রূপ দেওয়া। সুতরাং শ্রীযুক্ত বসু যদি ওতে বহাল থেকেই যান, তা হলে তাঁকে উৎসাহিত করার জন্য আমাকে তাগাদা দিতে হবে না। তিনি আপন প্রেরণাতেই কাজ করবেন। কিন্তু অন্য কেউ যদি কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট হন তা হলে আমাকে এই প্রচেষ্টা পুনরায় শুরু করতে হবে। তাঁকে আমার মতে আনতে হবে এবং এমন কি তাতে করেও কংগ্রেসের বর্তমান নেতাদের মধ্যে এমন লোক খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে—অবশ্য পণ্ডিত জওহরলাল ও সুভাষ বসু ছাড়া—যাঁরা এই কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন। আপনি

বলতে পারেন, কংগ্রেস প্রেসিডেন্টই বা প্ল্যানিং-কমিশনের সভাপতিত্ব করবেন কেন ?—এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই, কেননা, এ. আই. সি. সি-র মিটিংএ এইটাই স্থির হয়েছে। আপনি যদি আমার এই মত কবির কাছে রাখতে পারেন এবং এই ব্যাপারে যদি তাঁর মহান কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় তা হলে আমি আনন্দিত হব।

আপনার প্রেরিত *Moscow News*-গুলিতে আমার গভীর আগ্রহ রয়েছে। আপনারা যদি ওগুলি সংরক্ষণ না করেন, অনুগ্রহ করে ওগুলি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমার মনে হয় 'লেফট বুক ক্লাব' কর্তৃক প্রকাশিত মূল্যবান সোভিয়েট পুস্তকগুলি ভারতে আমদানি করতে দেওয়া হয় না। আপনি বলেছিলেন, ইউসুফ মেহের আলির এই সব বইয়ের পূর্ণ সংকলন আছে। অনুগ্রহ করে আপনি কি তাঁর সাথে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন ?

অনুগ্রহ করে কবিকে আমার প্রণাম জানাবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

(স্বাঃ) এম. এন. সাহা

পুনঃ

আমার শান্তিনিকেতন ভ্রমণে যে কী আনন্দ পেয়েছি তার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। আমার ইচ্ছা, কিছুকাল পরে আবার সেখানে যাই এবং আরও অধিককাল সেখানে থাকি। বোলপুরে আমার বক্তৃতাটি নিয়ে কাগজে আমার উপর ভয়ানক আক্রমণ শুরু হয়েছে। আমার বিশ্বাস আমি ভীমরুলের চাকে হাত দিয়েছি।"

কিন্তু কবি ইতিমধ্যেই তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তাঁর বিশেষ দূত হিসাবে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর মারফত গান্ধীজীকে এক পত্র দেন। এই পত্রে কবি অত্যন্ত বিনীতভাবে বাংলার বিশেষ সংকটজনক অবস্থার প্রিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের কথাটা বিবেচনা করে দেখবার জন্য গান্ধীজীকে অনুরোধ জানান। অবশ্য কবির এই পত্রটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। তবে

এই পত্র পাবার পর গান্ধীজী কবির পত্রটি সহ জওহরলালকে যে পত্রটি লেখেন (২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৮) তাতে এর মর্মকথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গান্ধীজীর এই পত্রটি *A Bunch of Old Letters*-এ স্থান পেলেও রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান পত্রটি যে কেন স্থান পেল না, বোঝা যায় না। এই পত্রের এক জায়গায় গান্ধীজী জওহরলালকে লেখেন, "এই পত্রখানি দূত মারফত গুরুদেবের কাছ থেকে এসেছে। আমি ব্যক্তিগত মত জানিয়ে উত্তর দিয়েছি যে, বাংলার দূষিত আবহাওয়া দূর করতে হলে সভাপতিত্বের কাজ থেকে তাঁকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। আমার সন্দেহ নেই যে, গুরুদেব তোমাকে সোজাসুজি চিঠি লিখবেন, নয়ত তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন। তুমি তোমার নিজের মত জানাবে।"

[পত্রগুচ্ছ—পত্র নং ২৩৭ ॥ পৃঃ ২৭০-৭১]

অবশ্য এই খবর অনিল চন্দ মেঘনাদকে জানিয়ে দিতে কসুর করলেন না (২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৮)। মেঘনাদ তার জবাবে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখলেন (১লা ডিসেম্বর),

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স ঃ ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিকস্

১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ চন্দ,

আপনার সাম্প্রতিক চিঠির জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদ।

কবি যে আমার ইচ্ছা বা মতে সম্মতি দিয়েছেন এর জন্য অনুগ্রহ করে তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন।

আশা করি আপনি কুশলেই আছেন

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ) এম. এন সাহা

পুনঃ

আপনার প্রেরিত *Moscow News* পেয়েছি এবং অপরিসীম আনন্দের সঙ্গে পড়ছি। এই রকম পত্রিকা আরও পেলে আনন্দিতই হব।"

ইতিমধ্যেই অনিল চন্দ জওহরলালের জবাবী-পত্র পান। তিনি এই পত্রের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করে দিয়ে মেঘনাদকে লিখলেন,

৩০শে নভেম্বর

প্রিয় মিঃ সাহা,

গত পরশু আমি সুভাষবাবুর সম্পর্কে আপনাকে লিখেছিলাম, আশা করি আপনি তা যথাসময়েই পেয়েছিলেন।

দু'দিন পূর্বে আমি জওহরলালের কাছ থেকে পত্র পেয়েছি। এতে তিনি লিখেছেন—'এমন কি বিশেষ ব্যাপারে গুরুদেব আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান, জানতে পারলে সুখী হব। তিনি প্ল্যানিং-এর বিষয় উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত আগ্রহ আছে এবং অন্ততঃ কিছু সময়ও আমি এতে দিতে চাই। এতে কি পরিমাণ সময় দিতে পারব তা চূড়ান্তভাবে স্থির করবার পূর্বেই এর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নির্ণয় করে নিতে হবে। এর যে কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে তা খুবই মিশ্র ধরনের সংস্থা। তাঁদের মধ্যে সাহার মত কয়েকজন ভাল লোকই আছেন, অন্যরা ততখানি সম্ভাবনাপূর্ণ (promising) ন'ন। প্ল্যানিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু আমাকে আরও প্রধান একটি বিষয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে—আমাদের রাজনৈতিক জীবনের ক্রমবর্ধমান বিভেদ-অনৈক্য…'

গতকাল আমি এই ব্যাপারে গুরুদেবের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার কথা সবই তাঁকে এক দীর্ঘ চিঠিতে লিখেছি। ইতিমধ্যে পণ্ডিতজী যদি আসতে পারেন তা হলে গুরুদেবও নিশ্চয় এই পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁকে তাঁর প্রভাববল আরোপ করার জন্য অনুরোধ জানাবেন।

ইউসুফ মেহের আলি এখনও ইউরোপ থেকে ফেরেননি। তিনি ফিরে আসলে পরই আপনার সাথে তাঁর যোগাযোগ করে দেব।

Moscow News-এর আরও এক কপি আপনার ঠিকানায় পাঠান হয়েছে। আমি কবিকে দিয়ে তাঁদের লেখাব যাতে তাঁরা আপনাকে নিয়মিত-ভাবে তাঁদের কিছু সাহিত্যপত্র পাঠান।

শ্রদ্ধা নিবেদনান্তে
ইতি আপনার
(স্বাঃ) এ. কে. সি

অনিল চন্দ মশায় জওহরলালকে যে চিঠিটি লেখেন (২৮শে নভেম্বর) সেটি হল এই :

শান্তিনিকেতন, বাংলা
২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় পণ্ডিতজী,

আজ আবার গুরুদেব আপনাকে চিঠি লিখেছেন। এটা আমাকে লেখা আপনার চিঠির মোটামুটি জবাব বলা যায়, কিন্তু তাঁর চিঠিতে আপনি যে খুব বেশি কিছু জানতে পারবেন, আমি সে সম্পর্কে নিশ্চিত নই।

তিনি ডাক্তার সাহার যুক্তিযুক্ত পরিকল্পনার দ্বারা আকৃষ্ট এবং কমিটির কাছ থেকে অনেক আশা করছেন। আপনি অন্য কাজ নেবার আগেই তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, পাছে ঘটনার তাগিদে আপনি পরিকল্পনা কমিটির কাজ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এইটেই তাঁর আপনার সঙ্গে দেখা করার ব্যাকুলতার প্রধান কারণ।

সামনের বছরে তিনি একজন 'আধুনিকবাদী' কংগ্রেসী রাষ্ট্রপতি চান, যাতে করে বিবরণী শেষ হলে অখিল ভারত কংগ্রেস দ্বারা সেটি সাগ্রহে স্বীকৃত হবে, শুধুমাত্র শিকেয় তোলা থাকবে না। তাঁর এবং আমাদের সকলের মতে—আপনি এবং সুভাষবাবু—মাত্র দুটি খাঁটি আধুনিকবাদী উচ্চ অধিনায়কদের মধ্যে আছেন। আপনি পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি হওয়ায় আপনার সক্রিয় সহযোগিতা এরই মধ্যে পাওয়া গেছে, তাই তিনি সুভাষবাবুকে আবার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত দেখতে চান। আশা করি

আমি আমার বিশ্বাসভঙ্গ করছিনে এবং আপনি হয়ত এরই মধ্যে জেনে গেছেন, বা শীঘ্রই নিশ্চিত জানতে পারবেন যে, তিনি এই সেদিন এ-সম্পর্কে গান্ধীজীকে চিঠি লিখেছেন। এবং যদি আপনার দেখা পান, খুব সম্ভবতঃ সুভাষবাবুকে পুনঃ নির্বাচিত করায় সাহায্য চাইবেন। এইটে দোসরা নম্বর কারণ। কিন্তু এ সব ছাড়াও, আপনার সঙ্গে তিনি শুধু সাক্ষাৎকারের আনন্দেই দেখা করতে চান, আপনার সঙ্গে আলাপ করাও তাঁর বাসনা। কারণ আপনি তাঁর খুবই প্রিয়" ইত্যাদি ইত্যাদি।

[দ্রষ্টব্য *A Bunch of Old Letters* ॥ পত্র নং ২৩৯]

এই পত্র পাওয়ার পর মেঘনাদ অনিল চন্দকে লিখলেন (৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৮),

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স ঃ ডিপার্টমেন্ট অব ফিজিকস্

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৮

প্রিয় মিঃ চন্দ,

আপনার ৩০শে নভেম্বর তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ! কবি যে পণ্ডিত জওহরলালকে লিখেছেন এর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি তাঁর চিঠির যে অংশ উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে তিনি ব্যাপারটিতে গুরুত্ব দিচ্ছেন। এটা উৎসাহব্যঞ্জক। যদি তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন তা হলে আপনি তাঁকে বলতে পারেন যে, কমিটির ব্যক্তিদের সম্পর্কে তার যে সংশয় সেটা সম্ভবতঃ অতিরঞ্জিত বা বাড়িয়ে দেখার জন্যে (exaggerated)। আমি ব্যক্তিগতভাবে ডঃ জে. সি. ঘোষ ও মি: এ. কে. সাহার সম্পর্কে বলতে পারি, তাঁরা খুবই সহায়ক হবেন এবং এই নীতির অন্তর্নিহিত আদর্শের দিক থেকেও তাঁরা উপযুক্ত লোক হবেন। ডঃ জে. সি. ঘোষ একজন খুবই চিন্তাশীল ও উপযুক্ত ব্যক্তি এবং প্ল্যানিং-এর ব্যাপারে প্রচুর চিন্তা করছেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক, স্যর এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া খুবই সহায়ক হবেন এবং তাঁর এই ৮০ বছর বয়সেও যে তিনি দিল্লিতে Industrial Conference-এ অংশ

গ্রহণের জন্য ছুটে এসেছিলেন, এর থেকেই বাস্তবিকই প্রমাণ হয় এ বিষয়ে তাঁর কী বিপুল উদ্যম-উৎসাহ। বোম্বাইয়ের সদস্যদের ব্যাপারে আমি অল্পই জানি। তবে আমার ধারণা, তাঁরাও কাজের হবেন। পণ্ডিতজীর আরও সদস্য 'কো-অপট্' করবার জন্য চাপ দেবার সর্বদাই সেই অবাধ অধিকার থাকছে যাঁদের উপর তাঁর আরও অধিক আস্থা আছে। ভারত সরকার কিছু ভালো লোককে এই কমিটিতে যোগদান করতে বাধা দিচ্ছেন। সম্ভবতঃ আপনি কাগজে দেখে থাকবেন, ভারত সরকার আগামী জানুয়ারীর মধ্যভাগে বোম্বাইয়ে বিভিন্ন প্রদেশের 'ডাইরেক্টর অব ইণ্ডাস্ট্রিজ'-দের এক সভা আহ্বান করছেন। এতে দেখা যাচ্ছে, ভারত সরকারও পিছিয়ে থাকতে চাইছে না। এই সমস্ত কারণে প্ল্যানিং-এর ব্যাপারে কংগ্রেসকে অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। পণ্ডিত জওহরলাল যদি বোলপুরে আসেন, আশা করি আপনি তা আমাকে জানাবেন, তা হলে তৎক্ষনাৎ আমি সেখানে গিয়ে পড়ব।

আশা করি আপনি ভালই আছেন।

আপনার বিশ্বস্ত

(স্বাঃ) এম. এন. সাহা

অনিলকুমার চন্দ

সেক্রেটারী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

পুনঃ—দয়া করে কবিকে আমার প্রণাম জানাবেন।

এম এন এস

ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের পত্রালাপ শুরু হয়। কবি তাঁকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানান। এর পরবর্তী ঘটনা যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

ডঃ মেঘনাদ সাহা শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার পরই সম্ভবতঃ সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার পরামর্শ দেন। এর পর সুভাষচন্দ্র কবির সাক্ষাৎ প্রর্থনা এবং শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের ইচ্ছা ব্যক্ত করে তাঁকে পত্র দেন। সুভাষচন্দ্রের এই পত্র পাওয়ার পরই কবি তাঁকে শান্তিনিকেতনে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দেন (২০শে নভেম্বর, ১৯৩৮)।

পত্রটি ছিল এই ঃ

ওঁ

শান্তিনিকেতন

সুভাষচন্দ্র বসু

কল্যাণীয়েষু,

তোমাকে আমার নিমন্ত্রণপত্র পাঠাবার উদ্যোগ করেছিলুম ঠিক এমন সময়ে তোমার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। কখন তোমার এখানে আসবার সুবিধা হবে আমাকে জানিয়ো—তোমার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হব। তোমার সঙ্গে আলোচনার বিষয় অনেক আছে। তোমার শুভকামনায় স্বদেশের সঙ্গে আমিও যোগ দিই।

ইতি ২০।১১।৩৮

তোমাদের

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখন নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্তপ্রদেশ পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরছিলেন। এই কারণেই সম্ভবতঃ কবির

পত্রটি যথাসময়ে তাঁর হস্তগত হয়নি। কিছুদিন পর—৮ই ডিসেম্বর (১৯৩৮) প্রাতে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ঐদিনই অপরাহ্ণে তিনি কলকাতায় শ্রীনিকেতন শিল্পবিপণি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর ভাষণের শুরুতেই বলেন,

......"প্রায় ২৪ বৎসর পূর্বে আমরা কয়েকজন ছাত্র কবিগুরুর নিকট যাই তাঁহার নিকট হইতে কিছু উপদেশ লইতে।......তিনি আমাদের পল্লীসংগঠনের কথা বলেন। তখন বুঝিতে পারি নাই......পরে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই বুঝিতে পারিলাম তাহার মূল্য কতখানি।......"

এই অনুষ্ঠানে কবি একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতনের সাধনা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করে কবি যে-সব কথা বলেছিলেন সে-সম্পর্কে আলোচনা করে সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেন, "তিনি এই বলিয়া আর একটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনকে বাঁচান দায় হইবে। তাঁহার এই অভিযোগের উত্তরে আমি বলিব যে, তাঁহার এইরূপ আশঙ্কা মিথ্যা, এতবড় মিথ্যা কথা আর হইতে পারে না। কবির সৃষ্টি অমর। শান্তিনিকেতন বা শ্রীনিকেতনের ভিত্তি যদি শাশ্বত হইয়া থাকে তবে তাহার মৃত্যু হইতে পারে না। যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি বিশ্বের বা ভারতের এক কোণে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন, সেই শিক্ষার আদর্শ যদি বিশ্বমানবের মনে স্থান লাভ করিতে পারে তবে বীরভূম জেলার একটি প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা কোথায়? তখন বীরভূম জেলার গণ্ডি ভেদ করিয়া সমগ্র বিশ্বে শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হইবে। যে আদর্শ প্রচারের জন্য এই প্রচেষ্টা তা যখন আমরা গ্রহণ করিব তখন বীরভূম জেলার একটি শ্রীনিকেতন থাকুক বা না-থাকুক কিছুই যায় আসে না।

"এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা আমি প্রয়োজন মনে করি। অনেকে বলেন যে, গৃহশিল্পকে গড়িয়া তোলা ও কলকারখানা স্থাপনের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সম্পর্কে আমার মত এই যে, গৃহশিল্প চিরকাল থাকিবে, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পের ন্যায় গৃহশিল্পও চিরকাল থাকিবে। বড় জোর তাহার গণ্ডি একটু সংকীর্ণ হইতে পারে।

ইউরোপ ও জাপানে যেখানে কলকারখানার আধিক্য, সেখান হইতেও গৃহশিল্প নির্বাসিত হয় নাই।"

[যুগান্তর - ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ ॥ ৯ই ডিসেম্বর, ১৩৩৮]

কিন্তু ১১ই ডিসেম্বর (১৯৩৮) ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের কথা। সুতরাং কলকাতায় দুদিন থেকেই সুভাষচন্দ্র ওয়ার্ধা যাত্রা করেন। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার—৭ই ডিসেম্বর মেঘনাদ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় মেডিকেল কলেজে তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়। ১৬ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির প্রথম উদ্বোধনী সভার কথা। সুভাষচন্দ্র কলকাতায় মেঘনাদের সঙ্গে এসব বিষয়ে পরামর্শ ও আলোচনা করে যান বলেই অনুমিত হয়।

১১ই ডিসেম্বর ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শুরু হয় এবং এই সভাতেই ত্রিপুরী কংগ্রেসের দিন ধার্য হয় (১০ - ১৩ই মার্চ, ১৯৩৯)। এই সময় রবীন্দ্রনাথের পত্রের জবাবে সুভাষচন্দ্র তাঁকে ওয়ার্ধা থেকে এক পত্র লিখে (১৪ই ডিসেম্বর) জানান, তিনি আগামী জানুয়ারীর মাঝামাঝি নাগাদ শান্তিনিকেতন যেতে চান। পত্রটি যথাযথ উদ্ধৃত করা হল ঃ

All India Congress Committee

ওয়ার্ধা

১৪।১২।৩৮

শ্রীচরণেষু,

আপনার অনুগ্রহলিপির উত্তর দিতে বিলম্ব হইল বলিয়া ক্ষমা চাহিতেছি। আমি জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি নাগাদ 'শান্তিনিকেতনে' আসিতে ইচ্ছা করি। ঠিক তারিখ আমি যথাসময়ে আপনাকে জানাইব এবং আপনার সুবিধামতই দিন স্থির করিব।

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি

বিনীত

(স্বাঃ) শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

সুভাষচন্দ্রের এই পত্রের জবাবে কবি তাঁকে লিখলেন (২০শে ডিসেম্বর, '৩৮),

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

জানুয়ারির মাঝামাঝি তোমার আসার প্রতীক্ষা করে রইলুম। ডিসেম্বর মাসটা আমাদের এখানে লোকের ভিড়ে কাজের ভিড়ে সমস্ত অবকাশটা নিরেট ঠাসা, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেও তার জের চলে। সেই গোলমালের সময়টা তুমি এড়িয়ে আসছ শুনে খুশি হলুম।

ইতি ২০।১২।৩৮

তোমাদের

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'পৌষ-উৎসব' এসে পড়ায় কবি শান্তিনিকেতনে খুবই ব্যস্ত থাকলেন। বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্রও ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন নিয়ে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বস্তুতঃ এতদিন পর্যন্ত গান্ধীজীর মনোনীত ব্যক্তিই সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত হতেন। কিন্তু এবার বেশ কিছুদিন হতেই সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের পক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি ও নেতাদের কাছ থেকে প্রস্তাব আসতে লাগল। সুভাষচন্দ্রও নীতিগত প্রশ্নে সভাপতিপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলেন। দেশের সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিশীল দলগুলিই এজন্য সুভাষচন্দ্রের উপর চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী এবং তাঁর অনুগামীরা সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন চাইছিলেন না। তাঁরা এবার মৌলানা আজাদকে সভাপতি করতে চাইলেন। ১৫ই জানুয়ারী (১৯৩৯) কংগ্রেস সভাপতি মনোনয়নের দিন ধার্য ছিল। ঐদিন আসামের গোপীনাথ বরদলৈ, ফকরুদ্দিন আলি, বিষ্ণু মেধী,

সিদ্ধিনাথ শর্মা এবং জে. সি. গুপ্তের নেতৃত্বে বাংলার কংগ্রেস প্রতিনিধিদের দশ জন সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাব করলেন। অপরদিকে গান্ধীজীর অনুগামীরা মৌলানা আজাদের এবং পট্টভি সীতারামীয়ার নাম প্রস্তাব করেন। পরদিন ১৬ই জানুয়ারী কংগ্রেস সেক্রেটারি ঘোষণা করে দিলেন যে, 'আগামী ২৫শে জানুয়ারীর মধ্যে এলাহাবাদে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিসে কাহারও কাছ থেকে যদি প্রার্থীপদ প্রত্যাহারপত্র না পাওয়া যায়, তাহলে ২৯শে জানুয়ারী সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিদের ভোট গ্রহণ করা হবে।'

ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতেই রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে 'দেশনায়ক'-রূপে বরণ করে নেবার সংকল্প জানিয়ে পত্র দেন (১৪ই জানুয়ারি, ১৯৩৯)। স্মরণ রাখা দরকার, সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনে যে গান্ধীজীর সম্মতি বা অনুমোদন নেই একথা তিনি পরিষ্কার কবিকে লিখে জানিয়েছিলেন এবং সে-কথা জেনেও কবি প্রকাশ্যেই সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাতে চাইলেন। কবির পত্রটি ছিল ঃ

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

ফেব্রুয়ারির আরম্ভে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। সংগীতভবনের সাহায্যকল্পে সেখানে আমাদের অভিনয়ের পালা আছে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি অভিনয়ের প্রথম দিন। সেই দিন আমি তোমাকে রঙ্গশালায় প্রকাশ্য অভিনন্দন দিতে চাই। যদি অবকাশ করতে পারো আমি খুবই খুশি হব। কিছুদিন থেকে আমার মনে এই ইচ্ছা জেগেছে। আশা করি বাধা হবে না।

ইতি ১৪।১।৩৯

তোমাদের

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসু কলকাতায় ফিরলেন। সুভাষচন্দ্র কলকাতায় পৌঁছেই শান্তিনিকেতনে যাবার ইচ্ছা জানিয়ে কবিকে লিখলেন। কবি পুনরায় তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে পত্র দিলেন (১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৯)।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই বিশ্বমানবের কথাই চিন্তা করেছেন। বিশ্বের সকল দেশের সমস্ত মানুষের জন্যই তাঁর সমান অনুভূতি ছিল। জাতীয়তা বা প্রাদেশিকতার কোন সংকীর্ণ গণ্ডিতেই তিনি বাঁধা পড়েননি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতির অবস্থা সম্পর্কে তিনি উদাসীন ছিলেন। বিশেষ করে বাংলা দেশের কথা, বাঙালি জাতিকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার কথা শেষ জীবনে তাঁর মনে জেগেছিল। স্মরণ রাখা দরকার, সাম্প্রদায়িক দলাদলি, দাঙ্গা এবং কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলিতে বাংলার রাজনীতিক আবহাওয়া তখন খুবই দূষিত হয়ে উঠেছিল। বাংলার এই অবস্থা কবিকে গভীরভাবে পীড়িত ও বিচলিত করেছিল। কবি মনে প্রাণে চাইছিলেন বাংলার এই দুর্দিনে এমন কোন মহান নেতার আবির্ভাব ঘটুক যিনি বাঙালি জাতিকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেবেন। রবীন্দ্রনাথ যে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে শুধু কংগ্রেস সভাপতি বা সারা দেশের ভাবী নায়ককে দেখতে চাইছিলেন তা নয়; —সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আবার বাঙালি জাতি তার সমস্ত দুর্বলতা কাটিয়ে বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করবে, এই বাসনাই তিনি এতদিন সংগোপনে অন্তরে লালন করে এসেছিলেন। সেই কথাই তিনি সুভাষচন্দ্রকে পত্রে বিস্তারিত জানিয়ে লিখলেন:

ওঁ

শান্তিনিকেতন
উত্তরায়ণ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
কল্যাণীয়েষু,

আগামী কনগ্রেসে তোমাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রকাশ্য সমর্থন করবার

জন্যে আমার কাছে উপরোধ এসে পৌঁচেছে। অমার বক্তব্য তোমাকেই জানিয়ে রাখচি। এ সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে পূর্বেই আমি মহাত্মাজী ও জওহরলালকে চিঠি লিখেছিলেম বোধ হয় জানো। তারপরে তার ফলের হিসাব রাখা আমার কাজ নয়। যাঁরা কংগ্রেসের চালক তাঁরা বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্তব্য স্থির করেন—আমি রাষ্ট্রিক সম্প্রদায়ের বহির্ভূক্ত মানুষ, সে উদ্দেশ্য আমার অগোচর, সুতরাং অব্যবসায়ীর ইচ্ছাজ্ঞাপনের বেশি আর কিছু করার অধিকার আমার নেই।

দ্বিতীয় কথা, বাংলা দেশের ভাগ্যপরিচালনার কাজে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি—পরস্পর একটা আনাগোনা চলচে। কেউ যদি মনে করে এই ঘনিষ্ঠতার উপলক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কোনো একটা সুযোগ ঘটানো চলচে তাতে তোমার অনিষ্টই ঘটবে। আমি চাই অসংকোচে তোমার সঙ্গে যেন যোগ স্থাপন করতে পারি।

আজ বাংলাদেশ দুর্বল। আমার ইচ্ছা কোনো যোগ্য লোককে বাংলা প্রদেশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে নির্বিচারে তার চারদিকে সমস্ত বাঙালিকে সম্মিলিত করা হয়। সেই মিলনে বললাভ করে আর একবার বাংলা আপন শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করতে পারবে। নাট্যশালায় তোমাকে সম্বর্ধনার যে সংকল্প করেছি তার মূল কথাটি এই। কন্‌গ্রেসের ভিতর দিয়ে যে ইচ্ছা আকার নেবে এ ইচ্ছা তার চেয়ে গভীর এবং আকৃত্রিম। এর পরিচয় পেয়েছিলুম বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে—তখন বাংলা নিজের অভিপ্রায়কে যে রকম সম্পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশ করেছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে তেমন আর কখনো ঘটেনি। সেই উপলব্ধিকে আর একবার জাগানো চাই, এবং এই প্রচেষ্টায় তোমাকেই আশ্রয় করব। আর সকল পথ ছেড়ে এই পথেই প্রবৃত্ত হতে ইচ্ছা করি—এই আমার মনের কথা তোমাকে বললুম।

তুমি এখানে আসতে চেয়েচ জেনে খুব খুশি হলুম।

ইতি ১৯।১।৩৯

তোমাদের

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরদিন মৌলানা আজাদ এক প্রেস বিবৃতিতে (২০।১।৩৯) কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নেন। ফলে আরও জটিলতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ২১শে জানুয়ারী শনিবার প্রাতে সুভাষচন্দ্র নরেশনাথ মুখার্জী সহ শান্তিনিকেতন যান। যাত্রার পূর্বে এক প্রেস বিবৃতিতে দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, 'মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং এই সম্পর্কে তিনি যে বিবৃতি দিয়াছেন উক্ত বিবৃতি পাঠ করিয়া আসন্ন রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন সম্পর্কে আমারও কিছু বলিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত ব্যাপার নহে বলিয়া এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কালে সৌজন্যের ভুয়া অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠার ফলে নূতন ভাবধারা আদর্শবাদ এবং কর্ম তালিকার সমস্যা দেখা দিয়াছে।

অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত ভারতে রাষ্ট্রপতিদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলে কোনও বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে নির্দেশ পাওয়া যাইবে এবং জনগণ কি চাহে তাহা পরিষ্কার নির্দেশ পাওয়া যাইবে। এবং জনগণ কি চাহে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। এই সকল কারণে জনগণ ভারতের রাষ্ট্রপতিপদের নির্বাচন ও নির্দিষ্ট সমস্যা এবং কর্মতালিকার ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া সংগত বলিয়া বিবেচনা করেন। এই দিক হইতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবাঞ্ছনীয়ও নহে।"...ইউ. পি.

[আনন্দবাজার পত্রিকা—৮ই মাঘ, ১৩৪৫ ॥ ২২শে জানুয়ারী, ১৯৩৯]

শান্তিনিকেতনে সুভাষচন্দ্রকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হয়। ওই দিনই অপরাহ্ণে শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে কবি স্বয়ং সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে তাঁর ভাষণে বললেন,

"কল্যাণীয় সুভাষচন্দ্র! আমাদের যা বলবার কথা, হাজার বছর পূর্বে আমাদের ঋষিরা তা বলে গেছেন। যে আগমনী মন্ত্র এখানে শুনলেন, পৃথিবী যাঁদের আগমন প্রতীক্ষা করে তাদের জন্য তার অভ্যর্থনাবাণী

কতদিন হ'ল তারা বলে গেছেন। সে পুরাতন হবে না। সমস্ত দেশে যে অভ্যর্থনার ভিতর দিয়ে তুমি এসেছ, আমাদের দেশ তোমাকে যে আসন দিয়েছে, সেই আসনের বার্তা রয়েছে ঋষিদের সেই পবিত্র বাণীর ভিতরে। তাঁদের বাণীতে তুমি পেয়েছ তোমার আসন। আমার খুশি হবার একটা কারণ হচ্ছে এই—এই সুযোগে তুমি আমার পরিচয় পাবে। এ কথা শুনে হাসতে পার, তুমি বলতে পার আমার পরিচয় তোমার জানা আছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ প্রকৃত কথা নয়। কেননা আমার পরিচয় জানবার গুরুতর বাধা আমাদের দেশে ছিল। আমার আধখানি পরিচয় নিয়ে আমি বাংলা দেশে এসেছি। আমাকে জানে আমি বাণীর সাধক। এখানেই থেমে গেছে। তারপর যে আমার আর কোন সাধনায় দেশ আমাকে আহ্বান করছে সে খবর পৌঁছতে বিলম্ব হল, সেটা মনের ভিতর গ্রহণ করতে বাধা হওয়ার কথা। দোষ দিই না। আমাদের কবি কালিদাস ব'লে গেছেন —বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ—বাক্য এবং অর্থ দুই-ই একসঙ্গে সংযুক্ত। বাক্যের সঙ্গে অর্থের পরস্পর যোগ রয়েছে। যে অংশে আমি বাণীর চরণে আমার অর্ঘ এনে দিয়েছি সেখানে দীর্ঘকাল তোমরা আমাকে পেয়েছ, দেখেছ, হয়ত আনন্দও পেয়ে থাকবে—কখন কখন হয়ত আঘাতও পেয়েছ। কিন্তু অর্থের যে সাধনা, যে অর্থ নিজের জন্য নয়, দান করবার জন্য, সে অর্থের সাধক যে আমি এটা তোমাকে জানতে হবে, নইলে আমার সম্পূর্ণ পরিচয় হবে না। বাক্ এবং অর্থ দুই-ই এক জায়গায় যদি দেখ তাহলে বুঝবে আমার মধ্যে উভয়ের সম্মিলন শুভোদয়ের জন্য হয়েছে। আমার সৌভাগ্য, বাণীর আহ্বানের সঙ্গে অর্থের আহ্বান আমাকে আকর্ষণ করেছিল জীবনের কোন এক সময়ে। যৌবনের প্রান্তভাগে একদিন আহ্বান পেয়ে এখানে এসেছি। তারপর দীর্ঘকাল এই সাধনা করেছি লোকচক্ষুর অন্তরালে। সেটা দেখবার কারো দরকার ছিল না। দেখে নি। চোখে না-পড়বার কারণ এই—অত্যন্ত অস্পষ্ট করে আমাকে দেখেছে। অস্পষ্ট আমার পরিচয়, আমি অর্থের সাধক। সে সাধনায় সিদ্ধি হয়েছে কিনা সে অপর কথা। বাণীর সাধনায় আমার সিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছ। যাঁরা আমাকে ভালবাসেন তাঁরা বলেন, আমি একটা কিছু প্রতিষ্ঠালাভ করেছি বাক্ দেবতার কল্যাণে।

কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে পড়বে—তুমি যদি এসে দেখ, এই কর্মক্ষেত্রে আমার পরিচয়, তোমার দৃষ্টিতে এই জন্য পড়বে, তোমার সহৃদয়তার জন্য শুধু নয়, তোমার অভিজ্ঞতা সর্বদেশব্যাপী। তুমি দেখেছ,—য়ুরোপে যারা অর্থের সাধক, তাদের সাধনার পীঠস্থান তুমি দেখেছ,—তারা কি রকম করে ত্যাগে কর্মে বড় হয়ে উঠেছে, কি রকম অর্ঘ্য দিয়েছে জীবনে, নানা বিচিত্র দিক থেকে তুমি দেখেছ। তার মধ্যে একটা পরিচয়—মানুষের মানবত্ব—সে পরিচয় যদি এখানে জাগ্রত হয়ে থাকে, ত্যাগের ক্ষেত্র. সাধনার ক্ষেত্র যদি এখানে খুলে থাকে, তাহলে তুমি আনন্দিত হবে আমি জানি। আর সে পরিচয় আমি গর্বের সঙ্গে তোমাকে দিতে চাই, এই কারণে দিতে চাই তুমি এখানে দেশের কর্ণধাররূপে এসেছ, দেশ তোমাকে স্বীকার করেছে। এখানে দেশের যে সাধনা সে তোমাকে জানতে হবে, স্বীকার করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। যদি তুমি স্বীকার কর তাহলে এ চিরকালের জন্য সার্থক হবে। এখানে অনেক দৈন্য আছে, দুঃখ অনেক পেয়েছি, আমার দুঃখ অপরিসীম। চল্লিশ বৎসরের মধ্যে কত শোক, কত দুঃখ, কত দৈন্য, কত ঋণজালে জড়িত বিড়ম্বনা, কত নিন্দা, কত অন্যায় উক্তি, কত নিরাশার কারণ—এর ভিতর দিয়ে এসেছি। আমার সৌভাগ্য আজ তোমাকে আহ্বান করে এনেছি আমাদের এই কর্ম-ক্ষেত্রে— আর কিছুর জন্য নয়, তুমি আমাকে জানবে।

"তোমাকে আমি রাষ্ট্রনেতারূপ স্বীকার করেছি মনে মনে। আমার সংকল্প আছে, জনতার মধ্যে আমার সেই বাণী আমি প্রকাশ করব। তুমি বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় অধিপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, অন্য দেশকে আমি জানি না, সেখানে আমার জোর খাটবে না, আমি বাঙালি, বাংলাকে জানি—বাংলার প্রয়োজন অসীম। সেই জন্য তোমাকে যদি আহ্বান করি, স্বীকার করতে হবে—আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আমি তোমাকে আহ্বান করব রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ নিয়ে। এখানে তুমি আমাদের বন্ধু। আমাদিকে দেখে আমাদের কার্যভার যদি লাঘব করতে পার কর। অবসর হলে আসতে যেতে হবে। আজকে আমার আনন্দ এই জন্য, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তুমি আশ্রমে ঢুকনি—সে খুব বড় কথা। এই সীমানার মধ্যে এরূপ অন্য রকম।"

এরপর কবি শান্তিনিকেতনের শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন,

"দেশে যারা অপমানিত তাদের সম্মান দেবার জন্য আয়োজন করেছি এখানে। ছেলেরা, যারা বাল্যকাল থেকে শিক্ষার বিড়ম্বনায় পীড়িত, যারা বিদ্যালয়ে ভোগ করে সহস্র কারাদণ্ড, শান্তি নাই, সৌন্দর্য নাই, মুক্তি নাই, কিছু নাই,—কেবল আছে পড়া মুখস্ত করা। যতগুলি ছেলেমেয়েকে পেরেছি কারাগার থেকে মুক্ত করবার সাধনা করেছি—তার আনন্দ তুমি বুঝবে, তুমি কারাবাস ভোগ করেছ। এই কারাবাস আমাদের প্রত্যেক শিশু ভোগ করছে—কি দুঃখ, কি পীড়ন আমি জানি। যে-সময় শিশুদের মন সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে একান্ত অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত থাকবে, যখন তারা গাছপালা পশু-পাখীর সঙ্গে মিলনের আনন্দে মগ্ন থাকবে, সে-সময় তাদেরকে জাঁতাকলে ঠেলা হয়—কি শিক্ষা শেখান হয় তার নমুনা আমরা দেখেছি। পড়াপাখী, বুলিবলা পাখীর মত গতানুগতিক দল সৃষ্টি করি; তারা হয় বিদেশের বুলি মুখস্ত করা খাঁচার পাখী। পারিনি। চেয়েছি করতে, পারি না-পারি চেষ্টা করেছি আনন্দ দিতে, মুক্তির স্বাদ দিতে। এখানকার হাওয়াতে এখানকার ছেলেমেয়েদের যে আনন্দ, তাতে তাদের দাবী আছে, এই জন্য তারা জন্মেছে। তা নইলে কেন ফুল ফোটে, দিনান্তে কেন পাখী ডাকে যদি তারা ক্লাস ঘরে ঢুকে দাগ-কাটা passage মুখস্ত করে জীবনের সুন্দর সময় নষ্ট করে। কি দুর্ভাগ্য, মানুষ সৌন্দর্যবোধ থেকে বঞ্চিত থাকবে! এই জন্য এখানে আরম্ভ করেছিলাম। পারিনি—এত ভার কি একলা বইতে পারা যায়। অনেক রকম দুঃখের ভিতর দিয়ে চলেছি। একেবারে কিছু ফল হয়নি বলতে পারি না। মনের মত হয়নি।

"অন্য দেশের যারা দেখেছে, বলেছে ভাল। শুধু বলেনি, অনুকরণ করেছে। এ তুমি বোধ হয় দেখে থাকবে। ওরা বুঝতে পেরেছে, শিক্ষাটা সমগ্র জীবনের সঙ্গে জড়িত। শিক্ষাকে যারা বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তারা তাকে পীড়িত করে রাখে। মানুষের মনকে তারা কেটে কেটে বাঁচাবার চেষ্টা করে। এখানে শিক্ষাকে সমগ্র জীবনের সঙ্গে যুক্ত ক'রে—আনন্দের সঙ্গে, উৎসবের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে, চিত্রকলার সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত

ক'রে—আহ্বান করেছি। মুক্তি এবং আনন্দের স্বাদ দিতে চেষ্টা করেছি। এখানে নূতনত্ব আছে। দেশের লোক জিজ্ঞাসা করে—কি তোমার সিলেবাস্, কি বই ·পড়, ব্যাকরণ কি পরিমাণ হয়, সে-গুলি মুখস্ত করতে পেরেছ কিনা এবং কয়টা বাড়ীঘর আছে;—সরস্বতীকে টেনে এনে কারারুদ্ধ করবার আয়োজন বিশেষ লোকের ভাল লাগে। এখানে তা দেখতে না পেয়ে তারা দুঃখ করেছে। আমি বলেছি—দেশের অন্তরে যে রত্ন আছে সাধনা আছে তা তারা শূন্য করে ফেলেছে। কাজ যা করবার তা সম্পূর্ণ হয়নি এখানে। সেটা ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারিনি, সামর্থ নাই। রাষ্ট্রীয় দিক থেকে তুমি আমার কর্মের পরিচয় নিয়ে যদি তাকে স্বীকার করতে পার সুখী হব।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ৯ই মাঘ, ১৩৪৫ ॥ ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৯]

পূর্বেই বলেছি, কিছুদিন হতেই কবির মনে আশঙ্কা জাগে, তাঁর অবর্তমানে হয়ত তাঁর শান্তিনিকেতনের জন্য আর কেউ এগিয়ে আসবে না। সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় কবি গভীর আশায়-আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর আশা,—সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আবার বাঙালি জাতির নব-অভ্যুত্থান ঘটবে। তাঁর অন্তরে আরও একটি গোপন আশা ও কামনা এই, সুভাষচন্দ্র তাঁর শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনার কথা সহজেই বুঝতে পারবেন এবং তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন আর তাঁর অবর্তমানেও সুভাষচন্দ্রই হবেন তার প্রধান রক্ষক,—ধারক ও বাহক।

সুভাষচন্দ্র কবির মনের এই গভীর দুঃখ ও আক্ষেপের কথাটি বুঝতে পেরে, কবিকে আশ্বাস দিতে গিয়ে তাঁর ভাষণে বলেন,

"গুরুদেব,—এবার এখানে আমার নতুন করে আসা। ইতিপূর্বে কয়েকবার আমি এখানে এসেছি, বোধ হয় দুইবার। কিন্তু আজকের আসার মধ্যে একটা নূতনত্ব আছে। প্রধানতঃ দুই কারণে এখানে এসেছি। এক কারণ, আপনি ডেকেছেন। আর এক কারণ, নিজের মন থেকে আসবার ইচ্ছা এবং প্রেরণা অনুভব করেছি।

"আপনার যে অখণ্ড সাধনা, সেটা সাধারণ মানুষ বা সাধারণ ভারতবাসী যে

উপলব্ধি করবে—অন্ততপক্ষে সহজে উপলব্ধি করবে এটা আশা করা অন্যায়। আমিও সেই সাধারণের মধ্যে একজন। সুতরাং আমি যে আপনার অখণ্ড সাধনার মহত্ত্ব ও গৌরব উপলব্ধি করতে পারব সে দুরাকাঙ্ক্ষা আমি করি না, সে উপলব্ধি যখন আসে একদিনে আসে না। সে উপলব্ধি হচ্ছে ক্রমিক এবং সারা জীবনব্যাপী। তবে আমার মনে হয় যদি আমরা চলার পথে চলতে থাকি তা হলে সে উপলব্ধি ক্রমশ প্রসারলাভ করবে।

"আপনার প্রাণের মধ্যে একটা বেদনা, একটা অভিমান আছে—হয়ত আছে—যে, আপনার দেশবাসী আপনাকে জানল না, আপনার সাধনা বুঝল না। কিন্তু তার জন্য কি দেশবাসীকে আপনার দোষ দেওয়া উচিত। যদি তারা এত সহজে বুঝতে পারত, তাহলে তারা ত আপনার সমান হয়ে পড়ত। দ্রষ্টার সম্মুখে যে সত্য প্রতিভাত হয় সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা উপলব্ধি করা যেমন কঠিন তেমনি সময়সাপেক্ষ। আমরা এইটুকু বলতে পারি, আমরা চলার পথে চলেছি, চলবার চেষ্টা করছি। দ্রষ্টার সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আপনার সাধনাকে বুঝবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তাহলে দেশবাসীকে অপরাধী করতে পারবেন না। এটা সর্বদেশে সর্বজীবে (লোকে ?) দেখতে পাওয়া যায় —যাঁরা নূতন পথ দেখান, মানুষকে যাঁরা নূতন সত্যের উপলব্ধি করাবার চেষ্টা করেন, তাঁদের মহত্ত্ব, তাঁদের মূল্য সাধারণ লোকে বুঝে না। বরং সেই সত্যদ্রষ্টা ও সাধকদের শূলে চড়াবার চেষ্টা করে। সুতরাং আপনার দেশবাসীর যে বিশিষ্টতা আপনি দেখেছেন ও উপলব্ধি করেছেন সেটা শুধু আমাদের দেশের লোকের ধর্ম নয়, বোধ হয় মানবজাতির ধর্ম। মানুষের অন্তরে যত দৈন্যই থাকুক না কেন, আমরা যারা আশাবাদী, আমাদের মনে হয়, এই দৈন্য নীচতা ও মলিনতার অন্তরালে একটা দেবত্ব নিহিত আছে এবং যে সত্য সাধনা আজ দেশবাসী বুঝছে না, একদিন সে তা বুঝবে, বুঝবার চেষ্টা করবে।

"মধ্যে মধ্যে একথা উঠে এবং আমাদের মধ্যে আলোচিত হয়, হয়ত আপনার মনেও উঠেছে—আপনি উপস্থিত না-থাকলে আপনার সাধনার কি হবে। সেদিন কলকাতায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।

আমি বলতে চাই—কোন বস্তু বা সাধনা মরতে পারে না যতদিন তার সার্থকতা আছে। আপনি যে-জিনিষটা দেশবাসীকে ও মানব জাতিকে বুঝাবার ও শিখাবার চেষ্টা করছেন, যতদিন সেটা তারা না শিখবে, না বুঝবে ততদিন পর্যন্ত আপনার এই প্রত্যক্ষ বাস্তব সাধনা মরতে পারে না। যে সত্য ও সাধনা নিয়ে আপনার সমস্ত জীবন দাঁড়িয়ে রয়েছে যেদিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে সেটা প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন শান্তিনিকেতন বাঁচুক বা মরুক তাতে কিছু আসবে যাবে না। যতদিন পর্যন্ত সে সত্য ও সাধনা জাতির প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না-হবে ততদিন পর্যন্ত আপনার শান্তিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা থাকবেই থাকবে। শুধু তাই নয়, এ রকম সাধনা ভারতের দিকে দিকে স্থানে স্থানে গড়ে উঠবে।

"আমরা যারা রাষ্ট্রীয় জীবনে বেশী সময় ও শক্তি ব্যয় করি, আমরা মর্মে-মর্মে আমাদের অন্তরের দৈন্য অনুভব করি। প্রাণের দিক দিয়ে যে-সম্পদ না পেলে মানুষ বা জাতি বড় হ'তে পারে না, সেই সম্পদ, সেই প্রেরণা আমরা চাই। কারণ আমরা জানি, সে প্রেরণা, সত্যের সেই আভাস যদি প্রাণের মধ্যে পাই তাহলে আমাদের কর্মজীবনের ও বহির্জীবনের সাধনা সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক হবে। আপনার কাছ থেকে সে প্রেরণা আমরা চাই।"

এরপর সুভাষচন্দ্র জাতির মুক্তি সাধনায় কবিগুরু নির্দেশিত মহান আদর্শের পথ অনুসরণ করে চলবার প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়ে তাঁর ভাষণে বললেন,

"আমরা হয়ত আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের আদর্শ বড়। আমরা চাই মানুষের ও জাতির পরিপূর্ণ জীবন। আমরা চাই আমাদের দেশে প্রত্যেক নর-নারী, আমাদের অখণ্ড জাতি সব দিক দিয়ে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। এই যাত্রার পথে, এই সাধনার পথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একটা সোপান মাত্র। আমাদের সম্মুখে যে আদর্শ রয়েছে, যে স্বপ্ন আমাদিগকে বিভোর করে রেখেছে সে অতি উচ্চ। সেই স্বপ্নকে ও আদর্শকে আমরা কতটা বাস্তব জীবনে মূর্ত ক'রে তুলতে পারব জানি

না। তার জন্য কতটুকু শক্তি আছে নিজেরাই জানি না। ব্যক্তিগত শক্তি ও যোগ্যতা যতটা থাকুক না কেন আমরা মস্ত আদর্শ (সামনে) রেখে চলতে চেষ্টা করছি। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাস আছে, আমাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা যতটুকু হউক না কেন, আমরা যে-পথে চলেছি সেটা সত্যের পথ। আমাদের পরে যারা আসবে তারা আমাদের চেয়ে বেশী শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতার অধিকারী হবে। আমাদের যে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে তা তারা শোধরাতে পারবে, সেই বিশ্বাস নিয়ে আমরা কাজ করবার চেষ্টা করছি। আপনি জাতিকে—শুধু জাতিকে কেন, সমগ্র মানব সমাজকে আদর্শের পথ দেখিয়েছেন,—শুধু দেখিয়েছেন তা নয়, মানুষকে সেই পথে চালাবার চেষ্টা করে এসেছেন। তাই বাণীর বা সাহিত্যের সাধনায় আপনার চেষ্টা পর্যবসিত হয় নাই, শুধু ভগবানের উপাসনায় আপনার সাধনা পর্যবসিত হয় নাই, অন্তরের আদর্শকে আপনি বহির্জীবনে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছেন। আমরা এইটুকু আপনার চরণে নিবেদন করতে চাই—এই আদর্শ আমাদেরও জীবনের আদর্শ, কারণ এটা আমাদের জাতির আদর্শ। আমরা আমাদের জীবনে তা সফল করতে পারি বা না পারি সেই আদর্শকে আমরা অন্তরে রেখেছি, বাহিরে রেখেছি এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করতে চেষ্টা করছি, ভবিষ্যতেও করব।

"আমরা যারা সামান্যভাবে কাজ করতে চেষ্টা করছি আপনার কাছে যে আপরিসীম স্নেহ উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি ও পেয়ে থাকি এতে আমাদের জীবন বাস্তবিক ধন্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, যখন আমাদের জীবনে নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন বিপদ-আপদ এসেছে, যখন আমাদিগকে কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, যখন আমাদের মন নিরুৎসাহে নির্জীব হয়ে পড়েছে তখন দেশবাসীর কাছ থেকে এবং যারা দেশের শ্রেষ্ঠ নেতা ও স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক তাঁদের কাছে কী অপরিসীম স্নেহ ও প্রেরণা পেয়েছি তা স্মরণ করলে মনে হয় আমাদের জীবন ধন্য, সাময়িক বিপদে-আপদে আমাদের কিছু আসে যায় না।"

উপসংহারে সুভাষচন্দ্র বলেন, "ত্যাগ বলতে একটা ভুল ধারণা আমরা করি। মনে হয় যেন তার মধ্যে বেদনা আছে, কষ্ট আছে। যেখানে

প্রকৃত ত্যাগ সেখানে কষ্ট নেই। বেদনার অনুভূতি থাকলে মানুষ ত্যাগ করতে পারে না। ত্যাগে যে অনাবিল আনন্দ আছে সে আনন্দ আপনার জীবনে জমাটরূপ ধারণ করেছে। সে আনন্দ আমাদের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করুক, অনুপ্রাণিত করুক, এই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা। আপনার কাছ থেকে আমরা জীবনের প্রতি মুহূর্তে আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। কারণ আমরা জানি আপনার আশীর্বাদ আমরা যতদিন পাব, ততদিন বুঝব আমরা ঠিক পথে চলছি। আপনার আশীর্বাদ আমাদের যাত্রাপথে পরম পাথেয় বলে আমরা সকলে মনে করি।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ৯ই মাঘ, ১৩৪৫]

সন্ধ্যায় 'সিংহ-সদন'-এর সম্মুখস্থ ময়দানে ছাত্রদের এক সভায় সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শ ও জাতীয় আন্দোলনে ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে এক ভাষণ দেন।

পরদিন প্রাতে তিনি শ্রীনিকেতনের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। অনিলকুমার চন্দ, তারকচন্দ্র ধর, কালীমোহন ঘোষ ও সুকুমার চ্যাটার্জী প্রমুখ বিশ্বভারতীর কর্মকর্তারা শ্রীনিকেতনের কৃষি শিল্প ও পল্লীউন্নয়ন বিভাগের বিভিন্ন কর্মসূচীর কথাটা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন। এরপর বাঁধ-গোড়ায় একটি স্কুলের উদ্বোধন করে সুভাষচন্দ্র বল্লভপুরে রাজবন্দীদের প্রতিষ্ঠিত 'আমার কুটির' শিল্প কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। রাত্রিতে বোলপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা করে পরদিন তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসার পরদিনই বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্য এক বিবৃতিতে জানালেন যে, মৌলানা আজাদ ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে আলোচনাক্রমেই পট্টভি সীতারামীয়াকেই এবার সভাপতিপদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। ২৪শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র কলকাতা থেকে এর প্রতিবাদে এক বিবৃতিতে বলেন যে ওয়ার্কিং কমিটিতে এ রকম কোনো আলোচনার কথা তিনি বা আরও কেউ কেউ জানেন না। তিনি আরও বলেন,

"সভাপতি নির্বাচনের প্রকৃত নির্বাচন-নীতি পালন করিতে হইলে

কাহারও উপর কোন প্রকার নৈতিক চাপ না দিয়া স্বাধীনভাবে ভোট দিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু এই বিবৃতি দ্বারা কি ভোটদাতাদের উপর নৈতিক চাপ দেওয়া হইতেছে না?...প্রতিনিধিদের ভোট দিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইলে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না, নহিলে সভাপতি নির্বাচনের প্রথা তুলিয়া দিয়া ওয়ার্কিং কমিটি সভাপতি মনোনয়নের নিয়ম প্রবর্তন করিলেই পারেন।

......"আমি এ কথাও বলিতে চাহি না যে, নীতি এবং কর্মতালিকার প্রশ্ন মোটেই অবান্তর নহে। ১৯৩৪ সালের পর হইতে দক্ষিণ ও বাম —উভয়পক্ষের সম্মতি ও সমর্থনক্রমে একজন বামপন্থীই বরাবর কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হইয়া আসিতেছেন বলিয়াই ঐ প্রশ্ন উঠে নাই; নতুবা বহু পূর্বেই ঐ প্রশ্ন উঠিত। এই বৎসরে যে উক্ত প্রথার পরিবর্তন হইতেছে এবং একজন দক্ষিণপন্থী প্রার্থীকে সভাপতির পদে নির্বাচিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা নিতান্ত নিরর্থক নহে। অনেকেই মনে করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সহিত বৃটিশ গভর্ণমেন্টের একটা আপোষ-রফার যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার প্রতিবাদ করা হইতেছে। কাজেই দক্ষিণপন্থীরা একজন বামপন্থীর কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়া পছন্দ করে না—কেন না তিনি এই আপোষ-রফার অন্তরায় হইতে পারেন এবং আলোচনার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারেন। জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলে এবং তাহাদের সহিত আলোচনা করিলেই বোঝা যায় যে, এই বিশ্বাস অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় এমন একজন কংগ্রেস সভাপতির প্রয়োজন যিনি মনে প্রাণে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ১১ই মাঘ, ১৩৪৫ ॥ ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৩৯]

ঐদিন বরদৌলি থেকে সর্দার প্যাটেল, কৃপালানি, ভুলাভাই দেশাই, জয়রামদাস দৌলতরাম, শঙ্করাও দেও, রাজাজী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে বিবৃতি দেন তার এক জায়গায় বলা হয়ঃ

"মৌলানা সাহেব এই নির্বাচনের প্রতিযোগিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে

বাধ্য হইয়াছেন দেখিয়া আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু তিনি যখন প্রতিযোগিতা না করিবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি আমাদের মধ্যে কয়েকজনের পরামর্শ করিয়াই ডঃ পট্টভির নির্বাচন সমর্থন করিয়াছেন। যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরা মনে করি যে, খুব গুরুতর কারণ না ঘটিলে বিদায়ী সভাপতিকে পুনরায় নির্বাচন না করার নীতিই অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত।" ইত্যাদি।

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৩৯]

এরপর সুভাষচন্দ্র এবং সর্দার প্যাটেল, ডঃ পট্টভি ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে বিবৃতি ও পাল্টা-বিবৃতি দেওয়া শুরু হয়। ২৬শে জানুয়ারী কুমায়ুন পর্বত থেকে জওহরলালও একটি বিবৃতি দিলেন।

সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ('ন্যাশনাল ফ্রন্ট' পন্থী), কংগ্রেস সোস্যালিস্ট, লেবার পার্টি, 'রায় পন্থী'রা প্রচার অভিযান শুরু করলেন। উল্লেখযোগ্য, নির্বাচনের কয়েকদিন আগেই ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের মুখপত্র *'National Front'*-এর সম্পাদক পি. সি. যোশী নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতিতে বললেন,

"ভারতীয় কমিউনিস্টরাই প্রথম রাষ্ট্রপতি বসুর পুনর্নির্বাচন দাবী করিয়াছিল। আমরা বহু খাঁটি কংগ্রেসসেবীর মনের কথাই বলিয়াছিলাম। আমরা প্রত্যেক প্রদেশেই ঐ দাবীর কথা জানাইতেছি। রাষ্ট্রপতি বসু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া আমরা আনন্দিত। প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীর স্মরণ রাখা দরকার যে, ইহার সহিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত। যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তলে তলে বুঝাপড়ার চেষ্টা চলিয়াছে।

"দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগকে নিঃসহায়ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলী জনগণের স্বার্থের জন্য নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি পালন না-করিয়া গণ আন্দোলনের দমন করিতেছেন। কংগ্রেসের নীতিকে কার্যকরী করা সহজ নয়। কংগ্রেস হইতে বামপন্থীদিগকে বিতাড়নের চেষ্টা চলিয়াছে। কংগ্রেস সভ্যদিগকে ইহা বন্ধ করিতে হইবে।

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিজমের দোসর হইয়াছে এবং ক্রমশ শক্তিতে খর্ব হইয়া আসিতেছে। আমাদের জনগণ আন্দোলন করিতেছে। আমাদের আন্দোলন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আমরা যদি আন্দোলনের ঐক্য বজায় রাখিতে পারি এবং সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারি, আমাদের জয় সুনিশ্চিত। রাষ্ট্রপতি বসু কংগ্রেসের ঐক্য এবং দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করিতে পারিবেন। সম্প্রতি তিনি যে সমস্ত বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি বর্তমানের পথভ্রষ্ট হওয়ার নীতি ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক। প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীর নিকট ইহা প্রথম কর্তব্য। তাহা হইলে ত্রিপুরীতে আমরা যুদ্ধযাত্রার আদেশ পাইব এবং সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের পরিষ্কার আদেশ পাইব।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ১৩ই মাঘ, ১৩৪৫ ॥ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৯]

এর থেকেই বুঝা যায় কমিউনিষ্টরা ও অন্যান্য বামপন্থীরা সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনকে কি চোখে দেখছিলেন। ক্রমে সভাপতি নির্বাচন উপলক্ষে কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও প্রচারযুদ্ধ শুরু হয়।

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই এতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও মর্মাহত হন। এদিকে ৩রা ফেব্রুয়ারী কলকাতায় সুভাষচন্দ্রকে প্রকাশ্যে অভিনন্দন জানাবার কথা। কিন্তু এই নির্বাচন উপলক্ষে যে বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাতে করে কবির হিতৈষী বন্ধুরা হয়ত ওই কার্য থেকে তাঁকে সাময়িকভাবে বিরত থাকার পরামর্শ দেন বলেই মনে হয়। কবি নিজেও তার পরিণাম ও প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে হয়ত আশঙ্কিত হয়ে ওঠেন, যদিও আন্তরিকভাবে তিনি সুভাষচন্দ্রের জয়লাভ কামনা করছিলেন। তাই সুভাষচন্দ্র যাতে তাঁকে ভুল না বোঝেন তার জন্য তিনি সুধাকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে সমস্ত ব্যাপারটি খুলে বলবার নির্দেশ দেন। ২৭শে জানুয়ারী (১৯৩৯) কবি এক পত্রে সুভাষচন্দ্রকে লিখলেন,

ওঁ

উত্তরায়ণ

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

কল্যাণীয়েষু,

সম্পূর্ণ অনিবার্য কারণে এবং শারীরিক দুর্বলতাবৃদ্ধি হওয়াতে আপাতত তোমার অভিনন্দন সভা বন্ধ রাখতে বাধ্য হতে হোলো। সুরেন এবং সুধাকান্তর কাছ থেকে সমস্ত বিবরণ শুনতে পাবে।

তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও স্নেহ অক্ষুন্ন আছে এ সম্বন্ধে সংশয়মাত্র কোরো না। ইতি ১৭-১-৩৯

তোমাদের

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই সুভাষচন্দ্রের জন্য অভিনন্দনপত্রটি রচনা করে রেখেছিলেন। শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রসদন'-এ 'দেশনায়ক' নামে এই অভিনন্দনপত্রটির সম্পর্কে এইরকম নোট দেওয়া আছে ঃ

(১) 'দেশনায়ক' বাংলা অপরের হস্তাক্ষরে গুরুদেব কৃত সংশোধন

(২) ঐ ইংরেজি গুরুদেব লিখিত (কিছু কিছু অপরের হস্তে সংশোধিত)

(৩) ঐ ইংরেজি টাইপ করা কপি Final version, 28।1।39

সন্দেহমাত্র নেই গুরুদেব সুভাষচন্দ্রকে উপরোক্ত পত্র লেখার আগেই অভিনন্দনপত্রটি রচনা করেছিলেন।

২৯শে জানুয়ারী সভাপতি নির্বাচনের জন্য সারা দেশের কংগ্রেস প্রতিনিধিদের ভোট গ্রহণ করা হয়। বলা বাহুল্য এই নির্বাচনযুদ্ধে সুভাষচন্দ্র বেশ কিছু ভোটের ব্যবধানে সীতারমীয়াকে পরাজিত (সুভাষচন্দ্র পান—১৫৭৫ ভোট ঃ সীতারমীয়া—১৩৭৬) করেন।

জয়লাভের পরই সুভাষচন্দ্র নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বললেন,

"ভারতের স্বাধীনতা লাভের শত্রুরা হয়ত এই ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়াছেন যে, এই নির্বাচন-দ্বন্দ্বের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি সূচিত হইতেছে!

As Bengal's poet, I invite you to the honoured seat of the leader of the people. We have the sacred assurance of Gita that from time to time the Divine champion of the good arises to challenge the reign of the evil. When misfortunes from all directions swarm to attack, the living spirit of the nation, its anguished cry calls forth from its own being the liberator to its rescue. [illegible]

[illegible]

Suffering from the scarring effect of the prolonged punishment inflicted upon her

কবি-সংকল্পিত সুভাষ-সম্বর্ধনা-ভাষণ 'দেশনায়ক'-এর পাণ্ডুলিপি

কিন্তু আমি সুস্পষ্টভাবে সকলকে জানাইয়া দিতেছি যে, কংগ্রেস পূর্বের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ রহিয়াছে—কোনো দলাদলি ঘটিতে পারে নাই। কোন কোন বিষয়ে কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাহারা সকলেই একমত। দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিবর্গের ঐক্য ও সংহতি বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রয়োজনীয়। যাহাতে এই ঐক্য ও সংহতি পরোক্ষভাবেও ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এমন কোন কাজ করা বা কথা বলা আমাদের কোন ক্রমেই উচিত নহে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ১৭ই মাঘ, ১৩৪৫ ॥ ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৯]

বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্রের এই আবেদন ব্যর্থ হয়। অচিরেই এই নির্বাচনের জয়লাভ উপলক্ষেই কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র অন্তর্বিরোধ ও দলাদলির সৃষ্টি হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তার বিস্তারিত আলোচনা করব।

সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ ও রবীন্দ্রনাথ

৩১শে জানুয়ারী (১৯৩৯) প্রভাতী সংবাদপত্রে বড়ো বড়ো হরফে সুভাষচন্দ্রের জয়লাভের খবর প্রকাশিত হয়। সারা দেশের বামপন্থী ও প্রগতিশীল মহলে সে কী বিপুল উন্মাদনা ও বিজয়োল্লাস! বিশেষ করে—সারা বাংলাদেশই যেন উচ্ছ্বাসে ও আনন্দে ফেটে পড়বার উপক্রম হয়। এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথও যে অত্যন্ত আনন্দিত হন, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের এই জয়লাভ উপলক্ষেই যে কংগ্রেসের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ-বিদ্বেষ ও বিশ্রী কলহের সৃষ্টি হতে পারে এ কথা কবি তখনও পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারেননি।

ঐদিনই—৩১শে জানুয়ারী শান্তিনিকেতনে 'হিন্দী ভবন'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান। ঐদিন প্রাতে জওহরলাল কন্যা ইন্দিরাসহ শান্তিনিকেতনে এলেন। শান্তিনিকেতনে পৌঁছবার পরই তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেইদিনই অপরাহ্ণে তিনি 'হিন্দী ভবন-এর উদ্বোধন করেন। পরদিন—১লা ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্রে সুভাষচন্দ্রের জয়লাভ সম্পর্কে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়।

(বরদৌলী—৩১ জানুয়ারী)ঃ

"মিঃ সুভাষ বসু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডঃ পট্টভি সীতারামীয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুস্পষ্টরূপেই জয়লাভ করিয়াছেন। আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, গোড়া হইতেই আমি তাঁহার পুনর্নির্বাচনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম। ইহার কারণ এ স্থলে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। নির্বাচনী প্রচারপত্রে তিনি যে সকল তথ্য ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমি সমর্থন করি না। আমি মনে করি যে, সহকর্মীদের কথা তিনি যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে অযৌক্তিক ও অশোভন হইয়াছে। তথাপি তাঁহার জয়

লাভে আমি আনন্দিত। মৌলানা সাহেব তাঁহার নাম প্রত্যাহার করিবার পর আমার চেষ্টাতেই ডঃ পট্টভি নির্বাচন হইতে সরিয়া দাঁড়ান নাই। অতএব এই পরাজয় তাঁহার অপেক্ষা আমারই অধিক। আমি যদি সম্পূর্ণ নীতি ও কর্মপদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে না পারি, তবে আমার কোনই মূল্য নাই। অতএব আমার নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে, আমি যে নীতি ও কার্য-পদ্ধতির পরিপোষক, ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাহা সমর্থন করেন না। এই পরাজয়ে আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।"

এই দীর্ঘ বিবৃতির উপসংহারে তিনি বলেন,

"হাজার হোক, সুভাষবাবু ত আর দেশের শত্রু নন। তিনি দেশের জন্য নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার কার্যক্রম এবং নীতিকেই তিনি সর্বাপেক্ষা প্রগতিমূলক মনে করেন। যাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ তাঁহারা কেবল-মাত্র উহার সাফল্য কামনা করিতে পারেন। তাঁহারা যদি উহার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই কংগ্রেসের বাহিরে চলিয়া আসিতে হইবে। তাঁহারা যদি তাল রাখিয়া চলিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন। সংখ্যালঘিষ্ঠদের কোনক্রমেই বাধা সৃষ্টি করা উচিত হইবে না। যখন তাঁহারা সহযোগিতা করিতে অসমর্থ হইবেন, তখন তাঁহারা সহযোগিতা হইতে বিরত থাকিবেন। কংগ্রেসসেবীদিগকে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যাঁহারা কংগ্রেসী হইয়াও স্বেচ্ছায় কংগ্রেসের বাহিরে থাকেন তাঁহারাই কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। সুতরাং যাঁহারা কংগ্রেসে থাকা অস্বস্তিকর মনে করিবেন তাঁহারা বাহিরে চলিয়া আসিতে পারেন। তাঁহারা কোনপ্রকার বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া বাহির হইবেন না; কার্যকরীভাবে দেশের অধিকতর সেবা করার উদ্দেশ্য লইয়াই তাঁহারা বাহিরে আসিবেন।"—এ. পি.

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ১৮ই মাঘ, ১৩৪৫ ॥ ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯]

এই বিবৃতি পাঠ করে সমগ্র দেশ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। এই নির্বাচন যুদ্ধে সীতারামীয়া ও সুভাষচন্দ্রের মাঝখানে গান্ধীজী এসে পড়লেন কখন এবং কি করে একথা সাধারণ লোকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না।

ফলে দেশের প্রগতিশীল ও যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়।

এই বিবৃতি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের মনে যে কি প্রতিক্রিয়া হয় তা অনুমান করা শক্ত নয়। জওহরলাল তখনও শান্তিনিকেতনে। সন্দেহ নেই, কবি এবিষয়ে জওহরলালের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। কিন্তু তার কোন নোট বা বিবরণ পাওয়া যায় না। ১লা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা এক ঘরোয়া বৈঠকে জওহরলালকে গান্ধীজীর ঐ বিবৃতির তাৎপর্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবার অনুরোধ জানালে পর তিনি যা বলেন তা খুবই অস্পষ্ট ও ভাসা-ভাসা ধরনের। এই সম্পর্কে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি বিবরণী দিয়ে লিখলেন (শান্তিনিকেতন, ২রা ফেব্রুয়ারী),

"গতকল্য সন্ধ্যায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বর্তমান সময়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সহিত এক ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী যে বিবৃতি দিয়াছেন তৎসম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, এই সময়ে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কার্যাবলী সম্পর্কে কোন কথা বলা সঙ্গত হইবে না। তিনি বলেন যে, গান্ধীজী যাহা বলিয়াছেন তাহা কোন নূতন কথা নয়। কয়েক মাস পূর্বে অন্য এক অবস্থায় তিনি এই প্রকার মন্তব্যই করিয়াছিলেন। কংগ্রেস সভাপতির পদ একটু অদ্ভুত রকমের। তাহার নির্বাচনের উপর বহু বিষয়ের প্রভাব থাকিতে পারে। কিন্তু যদি নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং কোন সুনির্দিষ্ট নীতি বা কার্যক্রম ওই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়বস্তু হয় তাহা হইলে নির্বাচনের ফলে কোন একটি বিশেষ নীতি সমর্থিত হইল বলা যায়। কিন্তু সাধারণত প্রতিদ্বন্দিতা হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়বস্তু পরিষ্কার থাকে না। অবশ্য কংগ্রেস অধিবেশনে সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর ভোট দিতে হয়। কাজেই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অতীতে যেমন ঘটিয়াছে তেমন ইহাও হইতে পারে যে এই নির্বাচকমণ্ডলী (অর্থাৎ প্রতিনিধিমণ্ডলী) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একপ্রকার এবং পরে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ঠিক তাহার বিপরীত সমর্থন করিতে পারেন। নির্বাচিত সভাপতি যে নির্বাচকমণ্ডলীর সাধারণ ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঠিক সেই

নির্বাচকমণ্ডলী যদি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা হইলে সেই শেষ সিদ্ধান্তটিই বলবৎ থাকে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২১শে মাঘ, ১৩৪৫ ॥ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯]

আসন্ন ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরিপ্রেক্ষিতে জওহরলালের এই মন্তব্য বা উক্তি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ত্রিপুরী কংগ্রেসের ফলাফল সম্পর্কে এ যেন তাঁর ভবিষ্যৎবাণী। গান্ধীজীর ঐ বিবৃতির পর ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরিণাম যে কি হবে তা অনুমান করে নিতে তীক্ষ্ণধী জওহরলালের পক্ষে কোন অসুবিধা হয়নি।

পরদিন প্রাতে (২রা ফেব্রুয়ারী) সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে এলেন। সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে এসেই জওহরলালের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন। দুঃখের বিষয় এই আলোচনার আজও পর্যন্ত কোন নোট বা বিবরণ পাওয়া যায়নি। এই সম্পর্কে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি লিখেছেন,

"শ্রীযুক্ত বসু আসিয়াই পণ্ডিত জওহরলালের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সহিত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুর দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথের সহিতও অল্প সময়ের জন্য সাক্ষাৎ করিবার পর রাষ্ট্রপতি আবার পণ্ডিত নেহরুর সহিত আলোচনা করেন। আলোচনার প্রকৃতি জানা যায় নাই। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় রাষ্ট্রপতি মোটর যোগে কলিকাতা যাত্রা করেন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯]

অবশ্য এর দুদিন পর—৪ঠা ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্রকে লেখা জওহরলালের চিঠিতে এই আলোচনার কিছুটা আভাষ পাওয়া যায় (দ্রঃ *A Bunch of Old Letters* ॥ পত্র নং ২৪৯)। যাই হোক রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলাল উভয়েই সুভাষচন্দ্রকে অবিলম্বে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবিষয়ে তাঁর নির্দেশ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

কলকাতায় পৌঁছে পরদিনই সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর বিবৃতির জবাবে এক প্রেস বিবৃতিতে বিষয়টি পরিষ্কার করবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন,

"ভোটদাতা অর্থাৎ প্রতিনিধিগণকে মহাত্মার পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতেও বলা হয় নাই, কাজেই আমার ও দেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা ব্যক্তিগত-ভাবে মহাত্মার সহিত সভাপতি নির্বাচন প্রশ্নের কোনই সংস্রব নাই।" তিনি আরও বলেন,—"আমি ঐকান্তিকভাবে এই আশাই অন্তরে পোষণ করিতেছি যে, কংগ্রেসের তথাকথিত সংখ্যালঘিষ্ঠদের পক্ষে তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের সহিত অসহযোগিতা করিবার কোন ক্ষেত্রই উপস্থিত হইবে না। কংগ্রেসের মধ্যে কখনও কোন বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিলে আমিই সর্বান্তঃকরণে যে তাহা নিবারণে প্রয়াস পাইব তাহা বলাই বাহুল্য।" এই বিবৃতির উপসংহারে তিনি গান্ধীজীর সমর্থন ও আশীর্বাদ লাভের আবেদন জানিয়ে বলেন,

"মহাত্মার সহিত কোন কোন বিষয়ে কচিৎ আমার মতভেদ ঘটিয়া থাকিলেও মহাত্মার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কাহারো অপেক্ষা আমি কম শ্রদ্ধাবান নহি। আমার সম্বন্ধে মহাত্মাজী কি অভিমত পোষণ করেন তাহা আমি জানি না তবে তিনি আমার সম্বন্ধে যে অভিমতই পোষণ করুন না কেন তাঁহার বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হইবার জন্য আমি সর্বদাই যত্নবান থাকিব কেননা সকলের বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হইয়াও আমি যদি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের আস্থাভাজন না হইতে পারি তাহা হইলে তাহা অতিশয় মর্মন্তুদ হইবে।

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২১শে মাঘ, ১৩৪৫ ॥ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯]

এই বিবৃতিদানের কয়েকদিন পরই সুভাষচন্দ্র এলাহাবাদে পুনরায় জওহরলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (১৩ই ফেব্রুয়ারী)। ঐদিনই তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য ওয়ার্ধা যাত্রা করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি সেবাগ্রামে গিয়ে গান্ধীজীর পরামর্শ ও নির্দেশ ভিক্ষা করেন। কিন্তু এ আলোচনায় কোন ফল হল না। গান্ধীজী তাঁকে বলেন যে, সর্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যরা একই কমিটিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করবেন না। জবাবে সুভাষচন্দ্র তাকে বলেন যে, তাঁদের সঙ্গে ২২শে ফেব্রুয়ারী যখন দেখা হবে তখন তিনি এবিষয়ে আলাপ করে তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা লাভ করতে চেষ্টা করবেন। ব্যর্থমনোরথ হয়ে সুভাষচন্দ্র জ্বর গায়েই কলকাতায় ফিরে আসেন (১৭ই ফেব্রুয়ারী)।

এরপর সুভাষচন্দ্র খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের কথা। ডঃ নীলরতন প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা তাঁকে কোনমতেই ওয়ার্ধা যাবার অনুমতি দিলেন না। সুভাষচন্দ্র সমস্ত অবস্থাটা জানিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক স্থগিত রাখবার আবেদন জানিয়ে সদস্যদের তার করলেন। কিন্তু কোনই ফল হল না। নির্ধারিত সময়ে সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে সর্দার প্যাটেল প্রমুখ ওয়ার্কিং কমিটির বার জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করে বিবৃতি দিলেন। জওহরলাল অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে পদত্যাগ করে বিবৃতি দেন। এর ফলে সুভাষচন্দ্রের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তা অনুমান করা শক্ত নয়।

৭ই মার্চ ত্রিপুরী কংগ্রেস শুরু হবার কথা। সুভাষচন্দ্র তখনও অসুস্থ। ডাক্তারদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অসুস্থ শরীরেই তিনি, ত্রিপুরী যাত্রা করেন। ৬ই মার্চ ১০৩ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে তিনি জব্বলপুরে পৌঁছান। এদিকে রাজকোটে দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলনে সংকট সৃষ্টি হলে ৪ঠা মার্চ থেকে গান্ধীজী অনশন শুরু করেন। ৭ই মার্চ বড়লাটের কাছ থেকে রাজকোট সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসার আশ্বাস পেয়ে গান্ধীজী অনশন ত্যাগ করেন। ঐদিনই ত্রিপুরীতে 'এ. আই. সি. সি'র বৈঠক শুরু হয়। জ্বর বৃদ্ধি পাওয়ায় সুভাষচন্দ্র এতে উপস্থিত থাকতে পারেননি। পরদিন ৮ই মার্চ বিষয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠকে সুভাষচন্দ্রকে অসুস্থ অবস্থায় স্ট্রেচারে করে আনা হয়। ঐদিনই গোবিন্দবল্লভ পন্থ গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও তাঁর অনুসৃত নীতির প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে তাঁর ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সুভাষচন্দ্র আপোষ-আলোচনার দ্বারা প্রস্তাবটিকে সর্বজনগ্রাহ্য করবার অনুরোধ জানান। কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। দুদিন আলোচনার পর—১০ই মার্চ বিষয়-নির্বাচনী সমিতির সভায় পণ্ডিত পন্থের ঐ প্রস্তাবটি ২১৮—১৩৫ ভোটে গৃহীত হয়। সুভাষচন্দ্র অবশ্য ঐদিন উপস্থিত হতে পারেননি। সেই ঐদিনই ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন শুরু হয়। সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে শরৎচন্দ্র বসু সভাপতির অভিভাষণটি পাঠ করেন।

পরদিন সমস্ত পত্র-পত্রিকায় এই খবর ফলাও করে ছাপা হয়। সমস্ত

বাংলা দেশের মানুষই সেদিন পরাজয়ের অপমানে ক্ষোভে ও ক্রোধে যেন ফেটে পড়বার উপক্রম হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। সংবাদপত্র যোগে এই সব খবর অধীর আগ্রহে তিনি পাঠ করছিলেন। ত্রিপুরী কংগ্রেসের এই হৃদয়বিদারক পরিস্থিতির মধ্যেও সুভাষচন্দ্র যে অসুস্থতাজনিত সমস্ত শারীরিক ক্লেশকে অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত মাথা উঁচু করে লড়াই করেছিলেন এর জন্য সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর হৃদয় অপরিসীম দরদ ও সহানুভূতিতে ভরে উঠল। এই নিরতিশয় অবমাননা ও দুঃখের মধ্যে সুভাষচন্দ্র যাতে ভেঙ্গে না পড়েন এর জন্য ঐদিনই তিনি চিঠিতে সুভাষচন্দ্রকে বিশেষভাবে জানিয়ে দিলেন যে, বাংলা দেশের পক্ষ থেকে তিনি তাঁকে যে প্রকাশ্য অভিনন্দন জ্ঞাপনের সংকল্প করেছিলেন তা সফল হতে মোটেই বিলম্ব হবে না। পত্রটি যথাযথ উদ্ধৃত করা হল ঃ

ওঁ

কল্যাণীয়েষু,

অসুস্থ শরীর নিয়ে কন্‌গ্রেসের দুঃসাধ্য কাজে তোমাকে পীড়িত করেছিল সে জন্য আমরা সকলেই উৎকণ্ঠিত ছিলেম, এখনো উৎকণ্ঠার কারণ আছে। আশা করি উপযুক্ত শুশ্রূষায় ও বিশ্রামে তুমি আরোগ্যের পথে চলেছ; এবং বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে সম্মানদানের যে সংকল্প আমার মনে আছে তা সফল হতে বিলম্ব হবে না। ইতি—

তোমাদের

১১।৩।৩৯ (স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবশ্য এই চিঠি শেষ পর্যন্ত পাঠান হয়নি।

এই চিঠি সম্পর্কে সুধাকান্ত রায়চৌধুরী লিখেছেন,—"...আমি সেটা (চিঠিটি) সুভাষচন্দ্রকে দিতে পারিনি, কেননা কবি তার পরদিন বললেন,— 'চিঠিটা দিস না। অত সংক্ষেপে চিঠিতে মনের কথা সব পরিষ্কার হয়নি। আরো কিছু আমার বক্তব্য আছে। সুভাষ ভালো করে সুস্থ হয়ে উঠুক, তারপর যা হয় করা যাবে। ও চিঠি এখন দিস না।' সে চিঠি সৌভাগ্য-

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

কল্যাণীয়েষু

অসুস্থশরীর নিয়ে কংগ্রেসের দুঃসাধ্য কাজে তোমাকে স্বীকৃত করেছিল সেজন্য আমরা সকলে উৎকণ্ঠিত ছিলুম, এখনো উৎকণ্ঠার কারণ আছে। আশা করি উপযুক্ত শুশ্রূষায় ও বিশ্রামে তুমি আরোগ্যের পথে চলেছ। এবং বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে সম্মান দেবার যে সংকল্প আমাদের মনে আছে তা সফল হতে বিলম্ব হবে না। ইতি

১৪/৩/৩৯

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্রিপুরী কংগ্রেস চলাকালে সুভাষচন্দ্রকে লেখা
রবীন্দ্রনাথের পত্র

বশতঃ হারায়নি কিম্বা অন্যান্য ঐ রকমের বাতিল করা চিঠির মতন নষ্ট করে ফেলি নি।” [দ্রষ্টব্য দেশ-শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫ ॥ পৃঃ ৪২-৪৩]

১২ই মার্চ রাত্রি ১০॥ টায় ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরদিন ১৩ই মার্চ অপরাহ্নে সুভাষচন্দ্র কলকাতার পথে যাত্রা করেন। পরদিন অপরাহ্নে অসুস্থ অবস্থাতেই তাঁকে ধানবাদ স্টেশনে নামিয়ে জামাডোবায় তাঁর ভ্রাতা সুধীর বসুর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে ইউরোপে মহাযুদ্ধের করাল ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। হিটলারের হিংস্র থাবা তখন চেকোশ্লোভাকিয়ার বুকে। ১৫ই মার্চ নাৎসী বাহিনী প্রাগ্ নগরী অধিকার করে। সেই দিনই সন্ধ্যায় হিটলার প্রাগ্ নগরী অধিকার করে তার পুরাতন প্রাসাদশীর্ষে নাৎসী বিজয়-পতাকা উড়িয়ে দেন। পরদিন তার-বেতারে পত্র-পত্রিকায় সারা পৃথিবীতে এই খবর ফলাও করে ছাপা হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। এই সংবাদে তিনি যে কি পরিমাণ ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হন তা অনুমান করা শক্ত নয়। কবির আরও দুঃখ ও ক্ষোভের কারণ এই যে, ত্রিপুরী কংগ্রেসে হিটলারের এই সাম্রাজ্যলোভী ক্ষুধা ও সর্বগ্রাসী নীতিকে তো নিন্দা করা হলোই না পরন্তু মহাত্মাজীর ভক্ত অনুগামীরা সগৌরবে ভারতবর্ষে তাঁর একচ্ছত্র নেতৃত্বের প্রশংসা করতে গিয়ে হিটলার-মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করেন।

উল্লেখযোগ্য, ১০ই মার্চ সন্ধ্যায় ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের সূচনাতেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দ দাস তাঁর অভিভাষণের সূচনাতেই কংগ্রেসের মধ্যে মহাত্মাজীর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন,

“যদিও ইটালির ফ্যাসিস্ট দল, জার্মেনীর নাৎসী দল এবং রাশিয়ার কমিউনিস্ট দল হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং আমরা অহিংসা নীতি গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি আমাদের কংগ্রেস দল উহাদের সহিত তুল্য হইতে পারে। ইটালীর সমস্ত অধিবাসী ফ্যাসিস্ট নহে, জার্মানীর সমস্ত লোক নাৎসী নহে এবং রাশিয়ার সমস্ত লোক কমিউনিস্ট নহে; তথাপি প্রায় সমস্ত ইটালিয়ান, জার্মান ও রুশীয়দের তাহাদের দলের উপর আস্থা আছে।...... ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনীর, নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের এবং কমিউনিস্টদের

মধ্যে স্ট্যালিনের যে স্থান, কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও সেই স্থান ...কংগ্রেসের লিখিত গঠনতন্ত্রে তাঁহার জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট নাই ইহা সত্য, কিন্তু ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, রাষ্ট্রপতি পদে মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচন করা এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্যপদে মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করা একটা প্রথায় দাঁড়াইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে কংগ্রেসে তিনি সর্বেসর্বা। কিছুকাল পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ইউরোপে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, গান্ধীজী কংগ্রেস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।"..........

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ১১ই মার্চ, ১৯৩৯ ॥ ২৭ শে ফাল্গুন, ১৩৪৫]

বলা বাহুল্য, ত্রিপুরী কংগ্রেসে 'পন্থ প্রস্তাব'এরও মূল সুর (main spirit) এই ছিল। পাঞ্জাবের প্রতিনিধিরা তো "মহাত্মাজী কী জয়! হিন্দুস্থান কী হিটলার কী জয়"—এই বলে জয়ধ্বনি করে বসলেন।

এই সবই সংবাদপত্রযোগে কবির নজরে আসে। কবি বুঝতে পারেন, এই যেখানে কংগ্রেসে মহাত্মাজীর অনুগামীদের দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে স্বাধীন ও অপক্ষপাত বিচারের ক্ষীণ আশাও লুপ্ত হয়ে যায়। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যও যে সুবিচার পায় নি, কবির তাতে সন্দেহ থাকে না। গভীর দুঃখে কবির মনে এই সব নানা চিন্তার আলোড়ন চলতে থাকে। এই সব কথাই নিদারুণ আক্ষেপের সুরে এই সময় অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক খোলা-চিঠিতে প্রকাশ পায় (১৭ই মার্চ, ১৯৩৯)। কবি লিখলেন,

..."ভাটার সময় এল পৃথিবী জুড়ে।... প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা অচলায়তনের প্রাকার—শ্রেণী-আভিজাত্যের গর্বে উদ্ধত হয়ে উঠল।...বুদ্ধি-প্রভাবের বিরুদ্ধে একটা গভীর প্রতিক্রিয়া কাজ করতে লেগে গেছে।... ভালোমন্দের আদর্শের চেয়ে বড়ো হল চোখ বুজে মেনে চলার আদর্শ।...

"এই তামসিক মনোবৃত্তিরই সাংঘাতিক চেহারা দেখা দিল য়ুরোপে। বড়ো বড়ো নেশন বুদ্ধি, বিদ্যা ও বীর্যে যারা অসামান্যতা দেখিয়েছে, যাদের জয়দৃপ্ত ইতিহাসের শিক্ষাকে অনুসরণ ক'রে রাষ্ট্রতন্ত্র ও বুদ্ধি অনুশীলনে স্বাধীন কর্তৃত্বের গৌরবকে আমরা এতকাল একান্ত শ্রদ্ধায় স্বীকার করেছি

তাদের অনেকেই আজ কেউ বা স্বেচ্ছায় কেউ বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডিক্টেটরি মুঠোর সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে নিজেদের নিষ্পিষ্ট করে দিয়ে এক একটা বড়ো বড়ো জড়পিণ্ড পাকিয়ে তুলতে লাগল। এই নিঃসাড় জড়ত্ব সজীব মাংসকে পাথর-করে-তোলা বীভৎস ব্যাধির মতো মানব-জগতের সর্বত্র সঞ্চারিত হতে চলল। দলে দলে পোলিটিকাল গুরুদের ধনুর্ধর চেলারা সম্পূর্ণ হতবুদ্ধির তপস্যায় আজ প্রবৃত্ত। সেই তপস্যায় কৃচ্ছ সাধনের অন্ত নেই। তাতে মস্তিষ্ককে, হৃদয়কে আত্মসম্মানকে স্বকৃত ও পরকৃত পীড়নে দলে দলে করছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। অবশেষে আজ, এমন কি, কন্‌গ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল। ছোঁয়াচ লেগেছে। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট, সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে। মনে হচ্ছে আমি এক জায়গায় লিখেছিলুম—Proud power tries to keep safe in its own exclusive hand with a grip that kills it.

"ডান হাত দিয়ে নেশনের স্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরে বাঁ হাত দিয়ে তাকে স্বাধীনতার ঢোঁক গিলিয়ে দেবার আশ্বাস দেওয়া কেবল ব্যক্তিবিশেষেরই অধিকারায়ত্ত এই সর্বনেশে মত দেশকে খোকা করে রাখবার উপায়।..."

[প্রবাসী - বৈশাখ, ১৩৩৬ ॥ পৃঃ ৭-৯]

ইতিমধ্যে ত্রিপুরী কংগ্রেস 'পন্থ-প্রস্তাব' গ্রহণ উপলক্ষে কলকাতায় ও সারা বাংলা দেশেই তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়। ত্রিপুরীতে দক্ষিণপন্থী নেতাদের আচরণে যে অসহযোগী ও অগণতান্ত্রিক মনোভব প্রকাশ পায় তাতে করে একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে-কোন উপায়ে ও কৌশলে সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করতে বধ্যে করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়ে এসেছিলেন। স্বভাবতঃই বাংলাদেশের সেন্টিমেন্ট এতে প্রবলভাবে আহত হয়। ফলে সুভাষচন্দ্রের পরাজয়কে বাংলাদেশের পরাজয় বলে গ্রহণ করা হয়। কাগজে কাগজে তার তীব্র সমালোচনা চলল। দিনের পর দিন সভা সমিতি ও মিছিলে তার তীব্র নিন্দা ও বিক্ষোভ প্রকাশ চলতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে থেকেও এই সব সংবাদ পান। পরিস্থিতির

গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি গান্ধীজীকে অবিলম্বে এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে বাংলার প্রতি সুবিচার করবার আবেদন জানান (২৯শে মার্চ)। ত্রিপুরী কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী নেতাদের আপোষ-বিরোধী মনোভাব ও কঠোর অনমনীয় জিদের দ্বারাই যে বাংলা দেশকে রূঢ় আঘাত করা হয়েছে তাতে আর কবির কোন সন্দেহ ছিল না। কবির পত্রটি যথাযথ উদ্ধৃত হল :

UTTARAYAN
Santiniketan, Bengal
March 29, 1939.

Dear Mahatmaji,

At the last Congress session some rude hands have deeply hurt Bengal with an ungracious persistence, please apply without delay balm to the wound with your own kind hands and prevent it from festering. With love

Ever yours,
(Sd.) Rabindranath Tagore

Mahatma Gandhi
Birla House, New Delhi.

গান্ধীজী তার জবাবে কবিকে জানালেন যে তিনি সুভাষকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, এছাড়া সংকট বা অচলাবস্থার সমাধানের আর কোন উপায় তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। গান্ধীজীর পত্রটি ছিল এই (২।৪।৩৯) :

New Delhi
2.4.39

Dear Gurudev,

I have your letter full of tenderness. The problem you set before me is difficult. I have made certain suggestions to Subhas. I see no other way out of the impassee,

I do hope you are keeping your strength. Charlie is still in the hospital. With love

Yours,

(Sd.) M. K. Gandhi

গান্ধীজীকে চিঠি লেখার পরদিনই—৩০শে মার্চ কবি কলকাতায় আসেন। কলকতায় বিশ্বভারতী সম্মেলনীর উদ্যোগে বসন্তোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। কবি কলকাতায় কয়েকদিন থেকে বাংলাদেশের উত্তেজনার কথা সবই শুনলেন। কলকাতায় তখন জোর রাজনীতিক জল্পনা-কল্পনা—এরপর বামপন্থীরা ও সুভাষচন্দ্র কি করবেন? হয় 'পন্থ-প্রস্তাব' অনুযায়ী গান্ধীজীর অনুগামী পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের কছে আত্মসমর্পণ করে তাঁদের সব কিছু নির্দেশ মেনে চলতে হবে অথবা তাঁদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে বামপন্থীদের নিয়ে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে। কিন্তু 'পন্থ-প্রস্তাব'টি এমনই সুকৌশলে রচিত হয়েছিল যে, তাতে করে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে আত্মসত্তা বা তাঁর রাজনীতি বিসর্জন দেওয়া অথবা পদত্যাগ করা ছাড়া তাঁর আর কোন গত্যন্তর ছিল না। 'পন্থ-প্রস্থাব'-এ বলা হয়,

…"মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশমত গত কয়েক বৎসর কংগ্রেসের কার্যতালিকা যে মূলগত নীতি ও কার্যক্রম অনুসারে অনুসারিত হইয়া আসিতেছে, এই কমিটি তাহাতে গভীর আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। এবং দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছে যে, ঐ নীতি পরিহার না-করিয়া ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের কার্যক্রম নির্ধারণের উক্ত নীতিই অনুসরণ করা উচিত। গত বৎসরের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কার্যে এই কমিটি আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে এবং উহার সদস্যের উপর দোষারোপ করায় দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

"আগামী বর্ষে সংকটজনক পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এবং ঐরূপ সংকটে মহাত্মা গান্ধীই কংগ্রেস ও দেশবাসীকে পরিচালিত করিতে সমর্থ বলিয়া তাঁহার অবিচলিত আস্থা কংগ্রেসের কার্যপরিচালকগণের

লাভ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া এই কমিটি মনে করে। সেজন্য এই কমিটি সভাপতিকে মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছানুযায়ী আগামী বৎসরের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকে মনোনীত করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৪৫ ॥ ৯ই মার্চ, ১৯৩৯]

কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মৌল আদর্শ ও নীতিগত পার্থক্য এবং বিরোধ ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছিল। তাছাড়া কিছুকাল থেকে—বিশেষ করে ১৯৩৮-এ ইউরোপে মিউনিক-সংকটকাল থেকেই সুভাষচন্দ্র তাঁর বক্তৃতা ও বিবৃতিতে আভাষে-ইঙ্গিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে চরমপত্র বা আলটিমেটাম দেবার কথা বলে আসছিলেন। অথচ গান্ধীজী তা চাইছিলেন না। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র তাঁর সভাপতির অভিভাষণে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে চরমপত্র দেওয়ার কথাটা বিবেচনা করে দেখবার অনুরোধ জানালেন। এই ভাষণের উপসংহারে বলা হয়,

"আমার মনে হয় যে, স্বরাজের প্রশ্ন উত্থাপন এবং চরমপত্রের আকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট আমাদের জাতীয় দাবী দাখিল করিবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। আমাদের উপর যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা চাপাইয়া দেওয়া হউক এবং আমরা নিষ্ক্রিয় মনোভাব অবলম্বন করিয়া থাকিব এরূপ অবস্থা বহুকাল পূর্বেই অতীত হইয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা কখন আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে, তাহা এখন আর সমস্যা নহে। ইউরোপে শান্তিপ্রতিষ্ঠা না-হওয়া পর্যন্ত কয়েক বৎসরের জন্য যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা যদি সুযোগ বুঝিয়া ধামাচাপা দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা কি করিব। চতুঃশক্তি চুক্তিদ্বারা অথবা অন্য কোন উপায়ে ইউরোপে একবার স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রেট ব্রিটেন যে কড়া সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রেট ব্রিটেন প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের বিরুদ্ধে আরবদিগকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে এই কারণে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রেট ব্রিটেন নিজেকে দুর্বল বলিয়া মনে করিতেছে। সেইহেতু আমি বিবেচনা করি যে, উত্তর দিবার নির্দিষ্ট সময় দিয়া চরমপত্রের আকারে আমাদের

জাতীয় দাবী ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট পেশ করা আমাদের উচিত। এই সময়ের মধ্যে যদি কোন উত্তর না পাওয়া যায় বা অসন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় তাহা হইলে আমাদের জাতীয় দাবীসমূহ আদায় করিবার জন্য আমাদের যে সকল উপায় আছে তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। বর্তমানে আমাদের নিকট যে উপায় আছে তাহা হইতেছে ব্যাপক আইন-অমান্য বা সত্যাগ্রহ। দীর্ঘ সময়ের জন্য নিখিল ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহের ন্যায় বড় রকমের একটা সংঘর্ষের সম্মুখীন হইবার মতো অবস্থা আজ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নাই।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ১১ই মার্চ, ১৯৩৯ ॥ ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৪৫]

কিন্তু সবচেয়ে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন নিয়ে। সুভাষচন্দ্র তখনও জামাডোবায় অসুস্থ। তাঁর অসুস্থতার সম্পর্কে বিপক্ষ দল অত্যন্ত হীন কুৎসা ও অপপ্রচার চালাতে থাকেন যে, এ সবই তাঁর বুজরুকী মাত্র। সুভাষচন্দ্র যে তাতে কী মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন তা তাঁর এই সময়কার লেখা My Strange Illness (*Modern Review*—April, 1939) প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হয়েছে। ২৫শে মার্চ তিনি অসুস্থ অবস্থায়েই এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সোজাসুজি অবৈধ ও ক্ষমতা বহির্ভূত হয়েছে ; তবুও তিনি যে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে পারছেন না তা এই 'পন্থ-প্রস্তাব'-এর জন্য ; কেননা তাতে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে মহাত্মাজীর পরামর্শ ও অনুমোদন গ্রহণ করবার সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। ঐদিনই তিনি গান্ধীজীকে এক দীর্ঘ পত্রে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ ও উপদেশ ভিক্ষা করেন। নতুন কমিটি যদি একমতাবলম্বী না-হয়ে বহুমতাবলম্বী হয়, কংগ্রেসের বাম ও দক্ষিণ এই উভয় পক্ষের সমানুপাতিক ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠনের তাঁর অনুমোদন আছে কি না তা জানতে চান। তাছাড়া 'পন্থ-প্রস্তাব' এর মারাত্মক গঠনতান্ত্রিক ত্রুটি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি দেখান যে, এটি কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের ১৫নং অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ বিরোধী হয়েছে—'পন্থ-প্রস্তাব' মানতে হলে ঐ ১৫নং অনুচ্ছেদটি বাতিল করে

দিতে হয়। তিনি জানতে চান 'পন্থ-প্রস্থাব'কে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব বলে তিনি মনে করেন কিনা ?

সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতির পর কলকাতায় দারুণ উত্তেজনা ও জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে—সুভাষচন্দ্র হয়ত 'পন্থ-প্রস্তাব' অমান্য করবেন, না-হলে পদত্যাগ করবেন। কিন্তু বামপন্থীরা—বিশেষ করে সারা বাংলাদেশই তখন এ-ব্যাপারে চূড়ান্ত একটা সংঘর্ষের জন্য চঞ্চল ও উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েন।

রবীন্দ্রনাথ তখনও কলকাতায়। তিনি এ সবই শুনলেন। তাছাড়া নিদারুণ অসুখে ও বিপক্ষদের হীন আক্রমণে সুভাষচন্দ্রের হৃদয় যে জর্জরিত হয়ে উঠেছে একথা হৃদয়ঙ্গম করে কবি অত্যন্ত ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর আশঙ্কা হয়, সুভাষচন্দ্র হয়ত উত্তেজনা ও মানসিক প্রতিক্রিয়ায় পদত্যাগ করে বসতে পারেন। তাই শান্তিনিকেতন যাবার পূর্বে সুভাষচন্দ্রকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য কিছু পরামর্শ দিয়ে তিনি এক পত্র লিখলেন (৩রা এপ্রিল, ১৯৩৯)। পত্রটি যথাযথ উদ্ধৃত হল :

কলিকাতা

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
কল্যাণীয়েষু,

কয়েকদিন কোলকাতায় এসে দেশের লোকের মনের ভাব ভালো করে জানবার সুযোগ পেয়েছি। সমস্ত দেশ তোমার প্রত্যাশায় আছে—এমন অনুকূল অবসর যদি দ্বিধা করে হারাও তাহলে আর কোনো দিন ফিরে পাবে না। বাংলাদেশ থেকে তুমি যে শক্তি পেতে পার তার থেকে বঞ্চিত হবে, অন্য পক্ষও চিরদিন তোমার শক্তি হরণ করতে থাকবে। এত বড়ো ভুল কিছুতেই কোরো না। তোমার জন্য বলছিনে, দেশের জন্য বলছি। মহাত্মাজী যাতে শীঘ্রই তাঁর শেষ বক্তব্য তোমাকে জানান দৃঢ়ভাবে সেই দাবী করবে। যদি তিনি গড়িমশি করেন তাহলে সেই কারণ দেখিয়ে তোমরা পদত্যাগ করতে পারবে। তাঁকে বোলো শীঘ্রই তোমাকে ভবিষ্যতের কর্তব্য স্থির করতে হবে, অতএব আর

বিলম্ব সইবে না। আশা করি তোমার শরীর সুস্থ হবার দিকে চলেছে। আজই শান্তিকিকেতনে ফিরছি।

ইতি

২।৪।৩৯

তোমাদের

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

কবি যে সেই মুহূর্তে কী পরিমাণ উত্তেজিত হয়েছিলেন—সামায়িক-ভাবে তিনি যে আত্মবিস্মৃত হয়ে দলীয় রাজনীতিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন উপরোক্ত পত্রই তার সাক্ষ্য বহন করছে। তার কারণ, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের অন্যায় আচরণ ও আপোষ-বিরোধী মনোভাবের জন্য- তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একত্রে যে তাঁরা কিছুতেই কাজ করবেন না এবং সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার জন্য যে তাঁরা বদ্ধপরিকর হয়েছেন, এ কথা তখন কবির কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কবি ঐদিনই শান্তিনিকেতনে ফিরে যান। সম্ভবতঃ শান্তিনিকেতনে ফিরেই তিনি গান্ধীজীর জবাবী পত্রটি (২।৪।৩৯ তারিখের) পান। গান্ধীজীর এই পত্রে তিনি জনতে পারেন, চিঠিপত্রে সুভাষচন্দ্রকে তিনি কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। বস্তুতঃ এই সময় গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে এই জটিল সমস্যা নিয়ে খুব ঘন ঘন চিঠিপত্র ও তার-বিনিময় হচ্ছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সেগুলি প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং লোকের তাতে উৎকণ্ঠা ও আগ্রহের পরিসীমা ছিল না। ফলে নানা গুজবও চলছিল। ৫ই এপ্রিল সুভাষচন্দ্র জামাডোবা থেকে এক বিবৃতিতে এই সব গুজবের ভিত্তি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি ‘পন্থ-প্রস্তাব’ অমান্য করবেন না। বিবৃতিতে শেষে বলেন,

“সুতরাং নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সভ্য বা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের

*‘রবীন্দ্রসদন’-এ রক্ষিত এই পত্রের অনুলিপিতে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর নোট্ আছে—“চিঠিতে ভুল করে গুরুদেব ৩।৪।৩৯ পরিবর্তে ২।৪।৩৯ তারিখে দিয়েছেন।”

এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই যে আমি পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব মান্য করিব না। আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত যাহাই হউক না কেন, আমি ওই প্রস্তাব মান্য করিব। আমি যদি কোনও কারণবশত উক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি বিধিমত নিজের পথ বাছিয়া লইব। তবে কিনা আমি একথা বলিয়া রাখি যে, আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর মতামতের উপর নির্ভর করিবে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ৬ই এপ্রিল, ১৯৩৯ ॥ ২৩শে চৈত্র, ১৩৪৫]

এই সময় কবির পুরী যাবার কথা হয়। ১৬ই এপ্রিল তিনি কলকাতায় এলেন। কলকাতায় তিনি প্রশান্ত মহলানবিশের বেলঘরিয়ার বাড়িতে উঠেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি তিনি পূর্বেই পাঠ করেছিলেন। সম্ভবতঃ সুভাষচন্দ্রও লোক মারফত কবিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে সব জানিয়েছিলেন। কবি বুঝলেন, একমাত্র গান্ধীজীই এই অচলাবস্থার সমাধান করতে পারেন। কিন্তু এব্যাপারে চিঠিপত্র বা তার-বিনিময়ে কিছু ফল হবে না; একমাত্র গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনাতেই তা সম্ভব। সুভাষচন্দ্র অবশ্য সাক্ষাৎ আলোচনার জন্য গান্ধীজীকে ধানবাদে আসবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী ৭ই এপ্রিল রাত্রে রাজকোটে চলে যান। এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ১৮ই এপ্রিল প্রাতে তিনি কলকাতা থেকে গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রকে যুগপৎ তারবার্তা পাঠিয়ে অবিলম্বে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ আলোচনার অনুরোধ জানালেন। রাজকোটে গান্ধীজীকে তার করলেন—

"I earnestly appeal to you to arrange meeting immediately with Subhas and save the situation from tragic disaster."

অনুরূপ মর্মে সুভাষচন্দ্রকে জামাডোবায় তার করলেন ঃ

"I earnestly appeal to you to arrange meeting with Mahatmaji and save the situation from tragic disaster."

উল্লেখযোগ্য, অনুরূপ মর্মে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রকে তার করলেন। ঐদিনই রাত্রে কবি পুরী যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্বে ইউনাইটেড প্রেসের এক প্রতিনিধি এই সমস্যা-সংকটের সমাধান সম্পর্কে কবির অভিমত জানতে চান। কবি তার উত্তরে এক বিবৃতিতে বলেন,

"বৃথা পরস্পরের দোষারোপে মূল্যবান সময় নষ্ট হইয়াছে ; আমাদিগকে অবিলম্বে পূর্ণ আনুগত্যের সহিত একমাত্র মহাত্মাজীর নেতৃত্বাধীনে আমাদের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া দূরদর্শিতার সহিত বর্তমান বিরাট সুযোগের ব্যবহার করিতে হইবে।"

গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রকে তার করার কথা উল্লেখ করে কবি পরিশেষে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করবার আবেদন জানিয়ে বলেন,

"বর্তমান শোচনীয় অবস্থার কারণ ব্যক্তিগত কিংবা রাজনৈতিক হউক বা না হউক এবং উহা হইতে উদ্ভূত মনোমালিন্য পরিহার্য কিংবা অপরিহার্য হউক বা না হউক কোন পক্ষ হইতেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বা বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ দ্বারা ইহা দূরীভূত হইতে পারে না, এবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। একমাত্র আমাদের নৈতিক জ্ঞানের নিকট আবেদন আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারে যে, যখন আমরা অগ্রসর হইতেছি এবং প্রায় প্রত্যেক উপকরণের অভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছি তখন জাতীয় ঐক্যের স্থায়ী আবশ্যকতার সম্বন্ধে এই মারাত্মক অনবধানতা সমর্থিত হইতে পারে, এরূপ বহু ঘটনা যদি ঘটতে পারে তথাপি আমাদের পক্ষে আমাদের ব্যূহ অক্ষুণ্ণ রাখার শক্তি অপেক্ষা মূল্যবান কিছু নাই এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ অপেক্ষা বিপজ্জনক কিছু নাই। বাংলার তথা সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের নিকট আমার আবেদন এই যে, তাঁহারা যেন মহৎ উদ্দেশ্যের খাতিরে সামান্য সামান্য ব্যাপারে ক্ষমা করেন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা—১৯শে এপ্রিল, ১৯৩৯ ॥ ৫ই বৈশাখ, ১৩৪৬]

কিন্তু গান্ধীজী রাজকোট ছেড়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতে পারেন নি। গান্ধীজীর কাছে রাজকোট সমস্যাটিই অধিক

গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বলে মনে হয়। গান্ধী-সুভাষ পত্রালাপও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। সুভাষচন্দ্র আপোষের যতগুলি প্রস্তাব করেছিলেন গান্ধীজী তা গ্রহণ বা অনুমোদন করতে পারেন নি। তিনি আদর্শ ও নীতিগত পার্থক্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবার পরামর্শ দিয়ে সুভাষচন্দ্রকে পুরানো সদস্যদের বাদ দিয়েই—সম্পূর্ণভাবে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র 'পন্থ-প্রস্তাব'-এর উল্লেখ করে সম্মিলিতভাবে কাজ করবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। শেষে স্থির হয় কলকাতায় আসন্ন 'এ.আই.সি.সি'র বৈঠকের সময় গান্ধীজী কলকাতায় এসে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আরও আলাপ-আলোচনা করবেন।

২১শে এপ্রিল সন্ধ্যায় সুভাষচন্দ্র কলকাতায় এলেন। এর প্রায় সপ্তাহখানেক পরে ২৭শে এপ্রিল গান্ধীজী কলকাতায় এলেন। অন্যান্য কংগ্রেস নেতারাও এলেন। গান্ধীজী সোদপুর আশ্রমে উঠেছিলেন। সেইদিনই ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের সমস্যা নিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে নিভৃতে তাঁর প্রায় চার ঘন্টা আলাপ-আলোচনা হয়। কিন্তু আপোষ-মীমাংসার কোনই সম্ভাবনা দেখা গেল না। পরদিন কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ঐতিহাসিক অধিবেশন শুরু হয়। সুভাষ আপোষ-মীমাংসার শেষ চেষ্টা করে দক্ষিণপন্থী নেতাদের কাছে প্রস্তাব করেন যে, যদি কংগ্রেসর অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন দলের সভ্যদের নিয়ে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে তাঁরা সম্মত না-হন, তবে অন্ততঃ চার জন নতুন বামপন্থী প্রতিনিধিকে ওয়ার্কিং কমিটিতে নেওয়া হোক। কিন্তু দক্ষিনপন্থী নেতারা তাতে রাজী হন না। তাঁরা পুরানো সভ্যদের নিয়েই ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের জন্য কঠিন জিদ ধরে রইলেন। পরদিন ২৯শে এপ্রিল নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন শুরু হলে সুভাষচন্দ্র তাঁর পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন। অত্যন্ত তাড়াহুড়োর মধ্যে সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হয় এবং তাঁর জায়গায় রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভাপতি নির্বাচিত হন।

কলকাতায় সেদিন কী ভয়ঙ্কর উত্তেজনা! বাইরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের চারপাশে অপেক্ষমান বিপুল জনতা ক্রোধ ও উত্তেজনায়

চিৎকার ও গর্জন করে বিক্ষোভ জানাতে থাকে। সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় নেতাদের একে একে উত্তেজিত জনতার মধ্য দিয়ে পথ করে তাঁদের মোটরে উঠিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন পুরীতে। গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে তিনি কলকাতায় 'এ. আই. সি. সি'-অধিবেশনের পরিণতি লক্ষ করছিলেন। সংবাদপত্রযোগে কবি সব খবরই পেলেন। সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের বিবৃতি পাঠ করে কবি খুবই বিচলিত হয়ে উঠলেন। কংগ্রেসের বিভেদপন্থীদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে তিনি ঐক্যের জন্য যে কঠিন ধৈর্য ও সংযত প্রচেষ্টা করেছিলেন তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এক তারবার্তা পাঠান। তার মর্মার্থ ছিল এই :

"অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও তুমি যে ধৈর্য ও মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে তোমার নেতৃত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উদ্রেক হইয়াছে। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বাংলাকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ধীরতা ও ভদ্রতাবোধ অব্যাহত রাখিতে হইবে; তাহা হইলেই আপাতদৃষ্টিতে যাহা তোমার পরাজয় বলিয়া মনে হইতেছে তাহাই চিরন্তন জয়ে পরিণত হইবে।"

ইতিমধ্যে কলকাতায় প্রগতিশীল ও বামপন্থীরা এক ঘরোয়া বৈঠকে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দল গঠনের পরিকল্পনা করেন। ৩রা মে কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিশাল জনসভায় সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানান হয়। এই সভায় সুভাষচন্দ্র প্রকাশ্যে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠনের কথা ঘোষণা করে বলেন যে, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের সংহত এবং সম্মিলিত করাই হবে এই ব্লকের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধ হিসেবে নয়, পরন্তু কংগ্রেসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এই ব্লক কাজ করবে এবং কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র, মূলনীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করবে। তাছাড়া গান্ধীজীর প্রতি যতদূর সম্ভব শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে তাঁর অহিংস অসহযোগ নীতিতে পূর্ণ আস্থা রাখবে। পরিশেষে তিনি ওয়েলিংটন স্কোয়ারের অধিবেশনে বিক্ষোভ প্রকাশের নিন্দা করে বাংলা দেশকে কঠিন সংযম ও শৃঙ্খলার

সঙ্গে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানান। তিনি রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত বাণী পাঠ করে বলেন,

"আমার মত এই যে, বিক্ষোভ প্রকাশ না পাইলেই ভাল হইত। কারণ তাহা সংযমের অভাবই সূচনা করিয়াছে। সংযম হারাইয়া কোন বড় কাজ কখনও করা যায় না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে বাণী পাঠাইয়াছেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কারণ বড় কিছু করিতে হইলে আমাদিগকে আত্মস্থ হইতে হইবে, সংযমী হইতে হইবে। সংযম হারাইলে শক্তিক্ষয় হয়।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২০শে বৈশাখ, ১৩৪৬ ॥ ৪ঠা মে, ১৯৩৯]

রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের মধ্যে এই তীব্র বিরোধ ও ভাঙনের আশঙ্কায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তাই সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের কয়েকদিন পরই কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে অবিলম্বে কংগ্রেসের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানিয়ে নিম্নলিখিত মর্মে এক বাণী পাঠান ঃ

"কংগ্রেসের মধ্যে ভেদসৃষ্টিকারী মনোভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই সংকট সময়ে একজন স্থির মস্তিষ্ক, নিরপেক্ষ ও সহানুভূতিশীল সভাপতির বড়ই আবশ্যক। দুর্ভাগ্যক্রমে সুভাষের পদত্যাগ অপরিহার্য হইয়াছে।

"আমার স্থির বিশ্বাস, কঠোর ও অবিবেচনাপ্রসূত কার্যের ফলে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়াছে, আপনার ব্যক্তিত্বে ওইভাব দূরীভূত হইবে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২২শে বৈশাখ, ১৩৪৬ ॥ ৬ই মে, ১৯৩৯]

"কঠোর ও অবিবেচনাপ্রসূত কার্যের ফলে"...এই কথাগুলির মধ্যে কবির যে তীব্র মনোভাব ও তিরস্কারের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, এটা লক্ষ্য করবার মত।

সুভাষচন্দ্রের যে শেষ পর্যন্তও অসীম ধৈর্য সহকারে আপোষ ও সম্মিলিত

নেতৃত্ব গঠনের চেষ্টা করেছিলেন তাতে আর কবির সন্দেহ ছিল না। কলকাতায় 'এ. আই. সি. সি'-সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র শেষবারের মত আপোস ও সম্মিলিত নেতৃত্বের আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন,

"কিন্তু বর্তমানের ন্যায় জরুরী অবস্থায় কি করা যাইতে পারে? আপনারা জানেন যে, গ্রেট ব্রিটেনের ন্যায় দেশে—যেখানে নির্দিষ্ট মতাবলম্বী রাজনৈতিক দল বিদ্যমান, সেখানে সমরাশঙ্কা কিংবা জাতীয় সঙ্কট সমস্ত রাজনৈতিক বাধা বিঘ্ন সমতল করিয়া সম্মিলিত করিয়া দেয়। বিভিন্ন মতসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংমিশ্রণে এরূপ কমিটি গঠিত হয়, যাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় পরস্পর পরস্পরকে ঘোর শত্রু বলিয়া মনে করে। ফ্রান্স প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্ত্য দেশে জাতীয় সংহতিমূলক মন্ত্রিসভা গঠন একটা সাধারণ জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"আমাদের স্বদেশ হিতৈষণা কি ব্রিটিশ কিংবা ফরাসীদের চেয়ে কম যে তাহারা যাহা করে, আমরা তাহা করিতে পারি না?...

"অপ্রত্যাশিতভাবে সম্মুখে অগ্রসর হইবার মনোভাব সম্পন্ন একটি দৃঢ় ওয়ার্কিং কমিটি যদি আমরা চাই, তাহা হইলে কমিটিতে কংগ্রেসের বিভিন্ন মতাবলম্বী দলের প্রতিনিধিগণকে নিযুক্ত করিতে হইবে এবং যাহারা কংগ্রেসের নীতিকে চালু রাখিবে, তাহাদের সংখ্যাধিক্য কমিটিতে রাখিতে হইবে। যদি আমরা উৎসাহী নবীনগণকে করিতে না দেই তাহা হইলে ওয়ার্কিং কমিটির শক্তি ও ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইবে। ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশে যুদ্ধের সংকটের সময় এক দলীয় মন্ত্রিসভার স্থলে 'জাতীয় মন্ত্রিসভা' নিযুক্ত করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এখানেও কি আমরা সেই একই প্রয়োজন অনুভব করিতেছি না?"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ১৭ই বৈশাখ, ১৩৪৬ ॥ ১লা মে, ১৯৩৯]

রবীন্দ্রনাথ মোটামুটিভাবে সুভাষচন্দ্রের এই নীতিকে সমর্থন করেছিলেন। পূর্বেই বলেছি, দক্ষিণপন্থী নেতাদের অন্যায় জিদ ও আপোস-বিরোধী মনোভাবের জন্য কবি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। অপরদিকে বাংলা দেশের উন্মত্ত বিক্ষোভ আন্দোলনকেও তিনি সমর্থন

করতে পারছিলেন না। পুরী থেকে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক খোলা-চিঠিতে কবি তাঁর মনোবেদনা ব্যক্ত করে লিখলেন (২৪শে বৈশাখ, ১৩৪৬ ॥ ৮ই মে, ১৯৩৯)।

"রাষ্ট্রসম্পদ যাদের অনেক কালের সাধনার জিনিষ এবং যাদের কাছে পরম মূল্যবান তারা দলগত পরস্পর তীব্র বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এর সম্মান বিস্মৃত হয় না। প্রয়োজন বোধ করলে তারা আঘাত লাগায় বাইরের দিকে, গোড়ার দিকে নয়। আজকের দিনে চেম্বারলেনি সংকটে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চেম্বারলেন গায়ে পড়ে ছাতা হাতে ফ্যাসিস্ট ব্যূহের মধ্যে মাথা হেঁট করে ঢুকে পড়লেন, যুদ্ধবিভীষিকায় আতঙ্কিত য়ুরোপে আশু শান্তির আশ্বাস সগর্বে ঘোষণা করে দিলেন, পরক্ষণেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মাভৈঃ বাণীতে আশ্বস্ত চেকোস্লোভাকিয়াকে নাজি নখদন্তে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'তে দেখেও অনায়াসে লজ্জা সম্বরণ করলেন। তবু তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে যে ইংলণ্ড পূর্বে ও পশ্চিমে অপমানিত, সে তো তাঁকে ও তাঁর দলবলকে সমূলে উৎখাত করবার চেষ্টায় ক্ষেপে ওঠে নি। আত্মসম্বরণ ক'রে সকল মতের সকল দলের লোক আজ আশু বিপত্তির সদ্য প্রতিকারের চেষ্টায় সংহত করচে দেশের সমস্ত শক্তি। দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রিক দায়িত্ব সাধনের শিক্ষায় যাদের চরিত্র বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি, তারা এই ক্ষুব্ধ অবস্থায় পরস্পরের প্রতি তীব্র স্বরে দোষারোপ ক'রে কলহ করতে করতে দেশের কর্তব্যবুদ্ধিকে ভেঙে-চুরে বিক্ষিপ্ত করে দিত। ওরা কাজকে সফল করবার জন্যে ভুলতে জানে, রফা নিষ্পত্তি করতে পারে, তর্কবিতর্ক থামিয়ে দিয়ে কোমর বাঁধতে এক মুহূর্তে প্রস্তুত হয়। আজ আমরা স্বরাজ্যের আংশিক অধিকার পেয়েছি, এই অধিকারকে ক্রমশ প্রশস্ত ক'রে পরিপূর্ণতায় হয়তো নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে না। কিন্তু সে জন্যে আবশ্যক সৃষ্টি করবার শক্তি চালনা, যে-শক্তিতে আছে ধৈর্য, আছে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য এবং অবিচলিত শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য বিষয়ের সম্মান রক্ষার প্রতি গভীর দরদ। মূল্যবান সম্পদকে সৃষ্টি ক'রে তোলবার একান্ত উদ্যমে যারা অভ্যস্ত নয় দেশের শুভগ্রহের সেই সকল ত্যাজ্যপুত্রেরা গোড়া থেকেই ছোটো বড়ো সকল বিষয়েই আপন শক্তি প্রকাশ করতে চায় ভেঙে ফেলবার আস্ফালনে।"......

উপসংহারে কবি বাংলা দেশের অস্থির উন্মাদনা ও বিক্ষোভ-প্রবণতার সমালোচনা করে বললেন,

…"বিভ্রান্ত হয়ে চেঁচামেচি করি কেন, হিষ্টীরিয়ার হাত-পা খেঁচুনি লাগে কেন কথায় কথায়? শেষ পর্যন্ত একটু যেন হাসবার শক্তিও রাখতে পারি। বাংলা দেশের মনে অল্প একটুতেই ধুলো-ওড়ানো আঁধি লাগে—উনপঞ্চাশ পবনের মধ্যে সেইটেই সবচেয়ে দুর্বল হওয়ার ছেলেমানুষি। দেখতে সে পালোয়ান। কিন্তু যারা সৃষ্টিকার্যের পক্ষে, তারা এর হঠাৎ হাঁসফাঁসানিতে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। অব্যবস্থিতচিত্তদের কে মনে করিয়ে রাখতে পারবে যে, মহৎ কাজে চাই তপস্যার চিত্তবৃত্তি—শান্তো দান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা।"

[প্রবাসী - জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬ ॥ পৃঃ ২৯৮ - ৩০০]

৯ই মে (২৫শে বৈশাখ) পুরীতে মহাসমারোহে কবির উনাশীতিতম জন্ম-দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ১১ই মে প্রাতে কবি কলকাতায় ফিরে আসেন। সেই দিনই অপরাহ্ণে সুভাষচন্দ্র কবির সঙ্গে নিভৃতে প্রায় একঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। সম্ভবতঃ কবি সব কথা শুনে তাঁকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত বড় গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের কোনও বিবরণই আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

১২ই মে কবি কলিম্পং যাত্রা করেন।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র : শেষ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ পুরী থেকে কলকাতায় ফিরে সুভাষচন্দ্রের মুখে তাঁর বক্তব্য শুনেছিলেন বলেই অনুমিত হয় (১১ই মে, ১৯৩৯)। এর কয়েকদিন পরই কবি মংপু যান। কিন্তু মংপুতে কবি স্থির থাকতে পারলেন না। বাংলা দেশে সরকারী চাকরির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়েও তখন খুবই উত্তেজনা ও তর্কবিতর্ক শুরু হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাংলা দেশের হিন্দু নেতাদের সম্মিলিত এক বিবৃতিতে তাঁকে স্বাক্ষর করতে হয় (দ্রঃ প্রবাসী - আষাঢ়, ১৩৪৬)। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের পর কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংকট ও দলাদলি যে রকম চরম আকার ধারণ করে তাতে কবি কংগ্রেসের তথা দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে খুবই উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এই সময় কবি মংপু থেকে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক খোলাচিঠিতে তাঁর মানসিক উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করেন (২০-১-৩৯)। তাতে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংকট দলাদলি সম্পর্কে তিনি তাঁর বক্তব্য ও মনোভাব পরিষ্কার ব্যক্ত করেন—কোন পক্ষই যাতে তাঁকে ভুল না বোঝেন (প্রবাসী-আষাঢ়, ১৩৪৬)।

এই খোলাচিঠি বা পত্রপ্রবন্ধটি ভাল করে পড়লে কয়েকটি জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথমতঃ, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কবি গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থা জ্ঞাপন করলেন। এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে সমস্ত বিভেদ অনৈক্যের অবসান ঘটিয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করবার আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন,

"দেশের যে-একটা মস্ত মিলনতীর্থ মহাত্মাজির শক্তিতে গড়ে উঠেছে এখনো সেটাকে তাঁরই সহযোগিতায় রক্ষা করতে ও পরিণতি দান করতে হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।...

"কিন্তু এই কন্‌গ্রেসের পরম মূল্য যখন উপলব্ধি করি এবং এ কথাও যখন জানি এই কন্‌গ্রেস একটি মহৎ ব্যক্তিস্বরূপের সৃষ্টি, তখন হঠাৎ একে সজোরে নাড়া দেবার উপক্রম দেখলে মন উৎকণ্ঠিত না-হয়ে থাকতে পারে না। তখন এই কথাই মনে হয়—এর পরিণতি ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এর ভিতর থেকেই সঞ্চারিত করতে হবে। বাইরে-থেকে কাটা ছেঁড়া করে নয়।"

দ্বিতীয়তঃ গান্ধীজীর প্রতি তাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেও কবি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের বিভেদপন্থী নীতি ও ফ্যাসিস্টসুলভ শক্তিমদমত্ততার তীব্র সমালোচনা করে তার অবসান ঘটাবার আবেদন জানালেন,

"ইম্পিরিয়লিজম্ বলো, ফ্যাসিজম্ বলো অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। কন্‌গ্রেসেরও অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে ব'লে সন্দেহ করি। যাঁরা এর কেন্দ্রস্থলে এই শক্তিকে বিশিষ্টভাবে অধিকার করে আছেন, সংকটের সময় তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, বিচারবুদ্ধি সোজা পথে চলে নি। পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য—যে বৈধতা রক্ষা করলে যথার্থভাবে কন্‌গ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হত, তার ব্যাভিচার ঘটতে দেখা গেছে; এই ব্যবহার-বিকৃতির মূলে আছে শক্তিস্পর্ধার প্রভাব।...কিন্তু এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একত্র হয়েছেন তাঁদের মন কি উদারভাবে নিরাসক্ত? তাঁরা পারস্পরিক আঘাত করে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে? তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারেই নেই, যে উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোভ থেকে উদ্ভূত? ভিতরে ভিতরে কন্‌গ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদি গড়ে উঠছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাই নি যখন মহাত্মাজিকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলীনি ও হিট্‌লারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন? সত্যের যজ্ঞে যে কন্‌গ্রেসকে গড়ে তুলেছেন তপস্বী তার বিশুদ্ধতা কি তাঁরা রক্ষা করতে পারবেন—শক্তিপূজায় নরবলি-সংগ্রহের কাপালিক মুসোলীনি ও হিট্‌লার যাঁদের আদর্শ?"

জওহরলালের প্রতি কবির গভীর আস্থা ছিল। তাই কতকটা তাঁকেই উদ্দেশ করে কবি প্রশ্ন করেন,

..."আমি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি জওহরলালকে; যেখানে ধন বা অন্ধ ধর্ম বা রাষ্ট্রপ্রভাব ব্যক্তিগত সংকীর্ণ সীমায় শক্তির ঔদ্ধত্য পুঞ্জীভূত করে তোলে সেখানে তার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, কন্‌গ্রেসের দুর্গদ্বারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করে নি? এতদিন পরে অন্তত আমার মনে সন্দেহ প্রবেশ করেছে। কিন্তু আমি পোলিটিশিয়ান নই, এই প্রসঙ্গে সে কথা কবুল করব।"

[কন্‌গ্রেস—কালান্তর ॥ পৃঃ ৩৬০-২]

তৃতীয়তঃ, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করেও কবি সঙ্গে সঙ্গে একথা সুস্পষ্ট করে ঘোষণা করেন যে, গান্ধীজীর অনুসৃত পথ কিংবা তিনি ছাড়া আর কেউ-ই দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারেন না—এ কথা তিনি মনে করেন না। অন্য কোন শক্তিমান দেশনায়ক যদি দেশের ভাগ্যতরী পরিচালনার কৃতিত্ব ও যোগ্যতা দেখাতে পারেন তবে সমভাবেই তিনি তাঁর সিদ্ধি ও সাফল্য কামনা করবেন। অর্থাৎ এক কথায় 'পন্থ-প্রস্তাব'-এর বিরুদ্ধেই কবি সুস্পষ্টভাবে তাঁর মত ব্যক্ত করেন। তিনি বললেন,

"আজকের দিনে কোন্ জননায়ক পলিটিক্‌স্‌কে কোন্ পথে নিয়ে যাবেন তা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। মনে নানা সংশয় জাগে, স্পষ্ট বুঝতে পারি নে এ-সকল পথযাত্রার পরিণাম। কিন্তু নিশ্চিত বিচার করা আমার পক্ষে কঠিন; আমি পলিটিক্‌সে প্রবীণ নই। এ কথা জানি, যাঁরা শক্তিশালী তাঁরা নতুন পথে অসাধ্য সাধন করে থাকেন। মহাত্মাজিই তার প্রমাণ। তবু তাঁর স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়। অন্য কোনো কর্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রেরণা যদি জাগে তা হলে দোহাই পাড়লেও সে বীর হাত গুটিয়ে ব'সে থাকবেন না। সেজন্য হয়তো অভ্যস্ত পথে যূথভ্রষ্ট

হয়ে অনভ্যস্ত পথে তাঁকে দল বাঁধতে হবে, সে দলের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে ও তাকে আয়ত্ত করতে সময় লাগবে। কন্‌গ্রেসের অভিমুখে যদি কোনো কৃতী নূতন পথ খুলতে বেরোন, আমি অনভিজ্ঞ, তাঁর সিদ্ধি কামনা করব, দেখব তাঁর কামনার অভিব্যক্তি—কিন্তু দূরের থেকে।”......

[কন্‌গ্রেস—কালান্তর ॥ পৃঃ ৩৬৭ - ৬৮]

তাঁর প্রথম বক্তব্যের সঙ্গে এর সংগতি কোথায়? বলা বাহুল্য, সুভাষচন্দ্র যে তখন কংগ্রেসের মধ্যে সংগ্রাম ও গতিশীলতা সঞ্চারিত করবার জন্য ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ গঠনের চেষ্টা করছিলেন, উপরোক্ত কয়টি কথার মধ্যে কবি পরোক্ষে তার সাফল্য ও সিদ্ধি কামনা করে তাঁকে উৎসাহ জানালেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কবি একথাও জানিয়ে দিলেন যে, সর্বভারতীয় রাজনীতি ও তাঁর নেতৃত্ব এবং নীতিগত তর্কাতর্কি থেকে দূরে থাকলেও তিনি বাংলা দেশকে পুনর্গঠিত করার জন্য—তার মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করার কথাটাই বেশি করে ভাবছেন। আর এই কাজেই তিনি সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়করূপে বাংলা দেশের হাল ধরবার আহ্বান জানালেন,

“আজ আমি জানি, বাংলাদেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের। সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা করে আসছেন সে পলিটিক্‌সের আসরে, আমি পূর্বেই বলেছি সেখানে আমি আনাড়ি। সেখানে দলাদলির ঝড়ে ধূলি উড়েছে, সেই ধূলিচক্রের মধ্যে আমি ভবিষ্যৎকে স্পষ্ট দেখতে পাই নে—আমার দেখার শক্তি নেই। আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন ‘আঁকড়ে ধরে’ আছে বাংলাকে। যে বাংলাকে আমরা বড়ো করব সেই বাংলাকেই বড়ো করে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ়-সংকল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ের তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে।

বাংলাদেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।"

[কন্‌গ্রেস—কালান্তর ॥ পৃঃ ৩৬৯]

ঠিক এই কথাই তিনি সুভাষচন্দ্রের সংবর্ধনার উদ্দেশ্যে লিখিত "দেশনায়ক" নামক ভাষণে (অপঠিত) বলেছিলেন। যাতে তাঁর বক্তব্য কেউ ভুল না-বোঝেন এজন্য কবি সেদিন স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন,

"এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে, বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই, অথবা সেই মহাত্মার প্রতিযোগী আসন স্থাপন করতে চাই রাষ্ট্রধর্মে যিনি পৃথিবীতে নূতন যুগের উদ্‌বোধন করেছেন, ভারতবর্ষকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্যে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলনযজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে। তোমার সাধনায় বাংলাদেশে সেই আত্মাহুতি ষোড়শোপচারে সত্য হোক, ওজস্বী হোক—তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।"

[দেশনায়ক—কালান্তর ॥ পৃঃ ৩৭৫]

এই সময় সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগেই কলকাতায় কংগ্রেস ভবন (মহাজাতি সদন) প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলতে থাকে। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার,—এর প্রায় দুই বছর পূর্বে কলকাতায় কংগ্রেসের বামপন্থীরা 'সুভাষ কংগ্রেস ফাণ্ড' নামে একটি তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু নানা গোলমালে তখন এটি তেমন ফলপ্রসূ হতে পারে নি। এরপর সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের পর—৪ঠা মে (১৯৩৯) কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সুভাষচন্দ্রের হাতে এক লক্ষ টাকার তহবিল সংগ্রহ করে

দেবার উদ্দেশ্যে 'সুভাষ ধনভাণ্ডার কমিটি' গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র এই অর্থ দিয়ে কলকাতায় কংগ্রেস-ভবন গঠনের প্রস্তাব দেন। রবীন্দ্রনাথ যখন পুরীতে তখনই সুভাষচন্দ্র তাঁর এই পরিকল্পনার কথা কবিকে জানিয়ে এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করেছিলেন বলে মনে হয়—এবং কবি তখনই এতে সম্মতি দিয়েছিলেন। ৮ই মে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি জানালেন,

"ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, 'সুভাষ কংগ্রেস ফাণ্ডে' সংগৃহীত অর্থ দ্বারা বঙ্গীয় কংগ্রেসের যে বাড়ি নির্মিত হইবে, আগামী ৩০শে মে তারিখে উহার ভিত্তি স্থাপিত হইবে। কবি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় কংগ্রেস ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সম্মত হইয়াছেন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ৯ই মে, ১৯৩৯]

রবীন্দ্রনাথ পুরী থেকে ফিরলে সুভাষচন্দ্র সাক্ষাতে তাঁর এই পরিকল্পনার বিষয়েও কবির সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন বলে মনে হয়।

এরপর সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক-এর সাংগঠনিক প্রস্তুতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করেছিলেন। ২৪শে মে তাঁর ঢাকা যাবার কথা ছিল। কিন্তু তার পূর্বদিন রাত্রেই সুভাষচন্দ্র হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মেডিকেল বুলেটিনে তাঁর এই অসুস্থতার সংবাদ প্রচারিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তখন মংপুতে। এই সংবাদে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে সুভাষচন্দ্রকে লিখলেন (২৭শে মে, ১৯৩৯),

কল্যাণীয়েষু,

তোমার অসুখের সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়েছি। বারে বারে তোমার শরীরে এই রোগের আক্রমণ দেশের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ।

তোমাদের সংকল্পিত কংগ্রেস ভবনের পরিকল্পনাটি যথোচিত হয়েছে বলে, আমি মনে করি। এই ভবনের প্রয়োজনীয়তা বিচিত্র এবং ব্যাপক। সর্বজনের আনুকূল্যে এর প্রতিষ্ঠা উপযুক্তরূপে সম্পন্ন হবে আশা করে

আগ্রহান্বিত হয়ে আছি। এই গৃহের সম্পূর্ণতার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্যের এবং গৌরবের রূপ দেখতে পাব।

ইতি ২৭।৫।৩৯

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এরপর ক্রমেই কংগ্রেসের দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধ-সংঘাত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ৪ঠা জুন গান্ধীজী অনির্দিষ্টকালের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেন। তার প্রায় একপক্ষ:কাল পরে বোম্বাইয়ে 'এ. আই. সি. সি'-র এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী থেকে সত্যাগ্রহ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া কংগ্রেস মন্ত্রিদের বিরুদ্ধে সমালোচনাও নিষিদ্ধ করা হয়। এর প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বামপন্থী সমন্বয় কমিটি ৯ই জুলাই 'সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস' পালন করেন। এদিকে ২৬শে জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি (বি.পি.সি.সি)-র রিকুইজিশান সভার অধিবেশনে পুরাতন কার্যনির্বাহক কমিটির জায়গায় নূতন কমিটি গঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য, এতে মোট ১৪৯ জন সদস্যের মধ্যে ২৮ জনকে বাদ দিয়ে নূতন সদস্য নির্বাচিত করা হয়। এর অনতিকাল পরেই বামপন্থী সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে কংগ্রেসের তৎকালীন আপোসমূলক ও সংগ্রাম-বিমুখ নীতির প্রতিবাদে ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে 'জাতীয় সংগ্রাম সপ্তাহ' পালনের আহ্বান জানান হয়। এর ফলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। ১২ই আগস্ট ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়ঃ

"গুরুতর নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে বঃ প্রাঃ রাঃ সমিতির সভাপতির পদের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস হইতে তিন বৎসরের জন্য তিনি কোন নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।"

তাছাড়া ২৬শে জুলাইয়ের বঃ প্রাঃ রাঃ সমিতির রিকুইজিশান সভাকে বেআইনী ঘোষণা করে নূতন কার্যনির্বাহক কমিটি ও ইলেকশান ট্রাইবুন্যালকে

নাকচ বা বাতিল করা হয়। ১১ই আগস্ট সুভাষচন্দ্র কলকাতায় ফিরে এলেন। বলা বাহুল্য, ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাংলা দেশে এবং অন্যত্র বামপন্থী মহল প্রবল বিক্ষোভ জানাতে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে ওয়ার্কিং কমিটির এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে তখনই তিনি কোন মন্তব্য করেন নি সত্য কথা, তবে এসম্পর্কে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তা অনুমান করা শক্ত নয়। ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে সুভাষচন্দ্র আর বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তকে কোন আমলই দিলেন না। এর মাত্র কয়েকদিন পরেই সুভাষচন্দ্র ও বাতিল বঙ্গীয় প্রাথমিক কার্যকরী কমিটি কর্তৃক আয়োজিত কলকাতায় কংগ্রেস ভবন (পরবর্তীকালে 'মহাজাতি সদন')-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে তিনি সম্মতি দিলেন।

১৮ই আগস্ট (১৯৩৯) কবি তাঁর সেক্রেটারী শ্রীঅনিল চন্দ সহ কলকাতায় এলেন। পরদিন মহাসমারোহে কবি 'মহাজতি সদন'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য, কবি স্বয়ং এই নামকরণ করেছিলেন। এইদিন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে আবেগ-আপ্লুতকণ্ঠে কবিকে এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের আহ্বান জানালেন। কিন্তু এই উপলক্ষেও সুভাষচন্দ্র তাঁর রাজনীতিক সতর্কবাণী করতে ছাড়ালেন না। তিনি বললেন:

"আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় গগন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। আমরাও ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি যেখান থেকে বিভিন্ন দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই—যে নিয়ম-তান্ত্রিকতার পথ আমরা ১৯২০ খৃঃ বর্জন করেছিলাম পুনরায় কি সেই পথে ফিরে যাব? অথবা আমরা কি গণ-আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়ে গণ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হব? এখনে তর্কবিতর্ক আমি শুরু করব না—আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে নবজাগ্রত ভারতীয় মহাজাতি স্বাবলম্বন, গণ-আন্দোলন এবং গণ-সংগ্রামের পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না। এই পন্থার দ্বারাই তারা অনেকটা সাফল্যলাভ করবে বলে বিশ্বাস করে।

সর্বোপরি বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সহিত একটা তুচ্ছ আপোস করে তাঁরা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার—স্বাধীনতা হেলায় ছেড়ে দেবে না।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ৩রা ভাদ্র, ১৩৪৬ ॥ ২০শে আগস্ট, ১৯৩৯]

কবির ভাষণটি এখন সংকলিত হয়েছে (দ্রঃ কালান্তর ॥ পৃঃ ৩৭৭-৭৯), সুতরাং এখানে তার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। পরদিন জওহরলাল কলকাতা হয়ে চীন যাত্রা করেন। কলকাতায় তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়ে কবির সঙ্গে দেখা করে আসেন। চীনের পরিস্থিতি নিয়েই তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল, সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে কোন কিছু আলোচনা হয়েছিল বলে জানা যায় না।

ইতিমধ্যে ইউরোপে যুদ্ধের ঘন কাল মেঘে চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) হিটলারের নাৎসী বাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এরপর অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারও যুদ্ধ ঘোষণা করে দেয় এবং কংগ্রেসের ও অন্যান্য দলের সঙ্গে কোন রকম পরামর্শ বা আলোচনা না করেই ভারতীয় সৈন্য-সামন্তদের দেশের বাইরে পাঠাতে থাকে। এদিকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে এ-যুদ্ধে ব্রিটেনের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে আসেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী বৈঠকে যুদ্ধ সম্পর্কে এক প্রস্তাবে ব্রিটেনকে তার উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করবার দাবি জানান হয়; —বিশেষ করে, ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া সম্পর্কে তাঁরা কোন প্রতিশ্রুতি দেবেন কিনা জানতে চাওয়া হয়। ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর 'এ. আই. সি. সি'-র অধিবেশনেও উপরোক্ত মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় (৯ই অক্টোবর)। বড়লাট তার জবাবে এক বিবৃতিতে যা বললেন (১৭ই অক্টোবর) তা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ত ছিলই, পরন্তু প্রাদেশিক

মন্ত্রিসভার অধিকার সঙ্কুচিত এবং ব্যাপক গ্রেপ্তার ও অন্যান্য দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করায় ইংরেজ সরকারের মনোভাব সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ২২শে অক্টোবর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বড়লাটের এই বিবৃতিতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রিদের পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু আইন-অমান্য বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার ব্যাপারে তাঁরা কোন রকম উচ্চবাচ্যই করলেন না,—সুভাষচন্দ্র ও বামপন্থীরা দীর্ঘকাল ধরে যেটি দাবী করে আসছিলেন। কংগ্রেস নেতারা সংগ্রাম শুরু করতে দ্বিধা ও দোমনা ভাব দেখাচ্ছেন এবং আপোসের জন্য ব্যগ্রতা দেখাচ্ছেন—সুভাষচন্দ্রের এই সন্দেহ ক্রমশঃ তীব্রতর হয়। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্নে ইংরেজের সঙ্গে কোন আপোসই চলতে পারে না, এই কথাই দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে তিনি প্রত্যক্ষ গণ-সংগ্রামের জন্য কংগ্রেস নেতাদের কাছে বার বার আবেদন জানাচ্ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন মংপুতে। কবি অবশ্য মহাযুদ্ধকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছিলেন। পূর্বেই বলেছি, হিটলার-মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট বর্বরতা ও সাম্রাজ্যলালসার বিরুদ্ধে বহুকাল ধরেই তিনি সতর্ক বাণী করে আসছিলেন। হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণের সংবাদে তিনি যে কি মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলেন তা তাঁর এই সময়ের চিঠিপত্র ও বিবৃতিগুলি পাঠ করলেই জানা যায়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মান-আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করলে কবি তাঁর নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন, সত্যি কথা। কিন্তু তার কারণ ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীদের অমানুষিক বর্বরতা তাঁর কাছে ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছিল। ২০শে সেপ্টেম্বর তাই এক খোলা-চিঠিতে (অমিয় চক্রবর্তীকে) তিনি লিখলেন,

……"এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসীজমের কলঙ্কপ্রলেপ আর সহ্য হয় না।"…

[প্রবাসী - কার্তিক, ১৩৪৬ ॥ পৃঃ ৮৭]

কিন্তু তবুও ভারতবাসীকে এযুদ্ধে ইংরেজকে নিঃশর্ত সাহায্য দান করার আবেদন জানাতে তিনি প্রচুর দ্বিধা সংকোচ করেছেন। কেননা মিত্রপক্ষ ও তার প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর এতটুকুও মোহ ছিল না। তাছাড়া কবি ইংরেজের প্রতিশ্রুতিতে আদৌ বিশ্বাস করতেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা তাঁর বার বার মনে আসে। কবি তাঁর এই মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কথা ব্যক্ত করে এই সময় মংপু থেকে এক খোলা-চিঠিতে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখলেন (৫।১১।৩৯),

"এবার যুদ্ধের বান ডেকে এসেছে, প্রলয়ের ঝোড়ো হাওয়া লেগেছে হিংস্র শক্তির হাজার হাজার পালের উপর। যে পক্ষই হোক উপস্থিতমতো একটা ফল পাবে যাকে সে বলে জিত। তার পরে চলবে সেই কাঁটা গাছের চাষ যা মনুষ্যত্বকে বিক্ষত করবার জন্যে। সেই জন্যেই বলি এ-পক্ষেরই হোক আর ও-পক্ষেরই হোক জয় কামনা করব কার। জয় যে হিংস্র শক্তির।

"আমি পোলিটিশান নই। যাঁরা আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতা তাঁরা কল্পনা করছেন যুদ্ধে যদি রাজশক্তির সহায়তা করি তা হলে বরলাভ করব। এই যে সহায়তার সম্বন্ধ এটা দরকষাকষির হাটে। এটা আন্তরিক মৈত্রীর নয়, দীর্ঘকাল হয়ে গেল সেই সম্বন্ধ-সাধনার অবকাশ এদেশে আজ পর্যন্ত ঘটেনি। আমাদের পক্ষে শাসনকর্তাদের বিশ্বাসপরতা অনুভব করিনি, অনুভব করেছি সন্দিগ্ধ শক্তির কটাক্ষপাত। যুদ্ধের যখন অবসান হবে তখন শক্তির জয় হবে, মৈত্রীর নয়। শক্তির পক্ষে কৃতজ্ঞতা একটা বোঝা, তাকে স্বীকার করার দ্বারা যে নম্রতা এবং দায়িত্ববোধ আনে সেটা তার স্বভাবের পক্ষে পীড়াজনক। গত যুদ্ধে ভারতবর্ষ তার পরিচয় পেয়েছে। ঠিক যে সময়টাতেই হিসাবনিকাশের অবকাশ এসেছিল ঠিক সেই সময়টাতেই প্রভূত পরিমাণে ঘনিয়ে এল বেত চাবুক জেল জরিমানা গোরাগুর্খা ও প্যানিটিভ পুলিস।"

[প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ ॥ পৃঃ ১৬৪-৬৭]

. . .

মোট কথা, কবি খুব পরিষ্কার কিছু একটা পথ দেখতে পাচ্ছিলেন

না তখনও পর্যন্ত। এই সময় সুভাষচন্দ্রের বিবৃতিগুলিও কবি গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করছিলেন। ৯ই নভেম্বর কবি মংপু থেকে কলকাতায় আসেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কবি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখন পূর্ববঙ্গ সফর করছিলেন। কবি কলকাতায় দিন দুই অপেক্ষা করে শান্তিনিকেতনে ফিরে যান (১১ই নভেম্বর)। প্রায় মাসখানেক বাইরে থেকে সুভাষচন্দ্র কলকাতায় ফিরে সব কথা শুনে কবির সঙ্গে দেখা করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেন। কিন্তু ইতিপূর্বে তাঁর উত্তর প্রদেশ সফরের কথা হয়েছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে বর্ধমান ষ্টেশন থেকে তিনি কবিকে এক পত্রে লিখলেন (১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯),

বর্ধমান ষ্টেশন
১১।১২।৩৯

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অনেকদিন হইল মনস্থির করিয়া আছি যে আপনার ওখানে আসিব। অনেক কথা আছে, যে বিষয়ে আপনার উপদেশ চাই। আপনি কলিকাতায় আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন একথা সময় থাকিতে জানিলে আমি নিশ্চয়ই পূর্ববঙ্গ হইতে শীঘ্র ফিরিতাম। যখন ফিরি কলিকাতায়, তখন শুনিতে পাই যে আপনি কলিকাতায় অপেক্ষা করিয়া শান্তিনিকেতনে চলিয়া গেছেন। আমি এখন U. P. হইতে ফিরিতেছি—শরীর তত ভাল নয়। আশা করি ২।৩ দিনের মধ্যে সুস্থ বোধ করিব। আসিবার পূর্বে আমি টেলিগ্রাম করিয়া আপনার অনুমতি লইব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন।

ইতি
বিনীত
(স্বাঃ) শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে আর শান্তিনিকেতন যেতে হল না। ঐদিনই

কলকাতায় ফিরে তিনি খবর পেলেন যে, ১৫ই ডিসেম্বর কবি কলকাতা কর্পোরেশনের আয়োজিত 'খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনী'র উদ্বোধন করতে আসছেন। এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হবার জন্য তিনি কবির সেক্রেটারী শ্রীঅনিল চন্দকে পরদিনই টেলিগ্রাম করলেন (১২।১২।৩৯),

"Is Poet coming fifteenth ?"

অনিল চন্দ মহাশয় এই তার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষচন্দ্রকে জবাবী-তার করলেন,

"Gurudev will see you fifteenth Howrah station afternoon three. Have written."

কবি তার পূর্বেই সুভাষচন্দ্রের পত্রের জবাবে লিখেছিলেন (১২।১২।৩৯),

ওঁ

শান্তিনিকেতন

সুভাষচন্দ্র বসু

কল্যাণীয়েষু,

১৫ই তারিখে মেদিনীপুর যাত্রা করছি। পথে হাওড়া ষ্টেশনে তিনটের সময় পৌঁছব। একটা সেলুন গাড়িতে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারব। তার পরে চারটের সময় খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনীতে আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। ফিরে এসেই যাত্রা করব মেদিনীপুরে। ঐ এক ঘণ্টার অবকাশ যদি তুমি তোমার কাজে লাগাতে পারো তবে হাওড়ায় নিরিবিলিতে কথাবার্তা হোতে পারবে। এইটেই হয়তো সব চেয়ে সুবিধের ব্যবস্থা।

ইতি—

১২।১২।৩৯

তোমাদের

(স্বাঃ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫ই ডিসেম্বর কবি হাওড়ায় পৌঁছলে যথারীতি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রায় ঘণ্টাখানেক আলোচনা হয়। এই আলোচনার কোন বিবরণ

পাওয়া যায় না। তবে কবি এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হন যে, এই সংকট মুহূর্তে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার স্বার্থেই কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংকট দূরীভূত করতে হবে এবং সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিয়ে কংগ্রেসকে তাঁর সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। মেদিনীপুর থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরেই কবি গান্ধীজীকে ওয়ার্ধায় তার করলেন (২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯),

"Owing gravely critical situation all over India and especially in Bengal would urge Congress Working Committee immediately remove ban against Subhas and invite his cordial co-operation in supreme interest national unity."

এর জবাবে গান্ধীজী ওয়ার্ধা থেকে তার করলেন (২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯),

"Your wire was considered by Working Committee. With knowledge they have they are unable lift ban. My personal opinion is you should advise Subhas babu submit discipline if ban is to be removed. Hope you are well."

কিছুদিন পর গান্ধীজী এণ্ড্রুজকে এক পত্রে লিখলেন (১৫।১।৪০),

WARDHA (C.P.)
15-1-40

My dear Charlie.

If you think it proper tell Gurudev that I have never ceased to think of his wire and anxiety about Bengal. I feel that Subhas is behaving like a spoilt child of the family. The only way to make up with him is to open his eyes. And then his politics show sharp differences. They seem to be unbridgeable. I am quite clear the matter is too

complicated for Gurudev to handle. Let him trust that no one in the committee has anything personal against Subhas. For me, he is as my son. I hope you are well. Love.

(Sd.) Mohan

কবি গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাব স্পষ্টই বুঝে চুপ করে গেলেন। এর অল্পকাল পরেই গান্ধীজী কবির আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে আসেন (১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০)। কবি বার্ধক্যজনিত অবস্থায় শান্তিনিকেতনের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। গান্ধীজীকে তিনি তাঁর এই উদ্বেগ-অশান্তির কথাই বলেন। তবে সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে একেবারেই কোন আলোচনা হয় নি, তা মনে হয় না। কিন্তু তার কোন বিবরণ কিংবা নোট পাওয়া যায় না।

এর অল্পকাল পরেই ঐতিহাসিক রামগড় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় (২০শে মার্চ, ১৯৪০)। রামগড়ে কি হতে চলেছে তা পূর্বেই জানা গিয়েছিল পাটনায় ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত থেকে। গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘর্ষে নামতে দ্বিধা ও দোমনা ভাব দেখাচ্ছেন—এই বিশ্বাস সুভাষচন্দ্রের মনে দৃঢ়তর হয়েছিল। তাই রামগড়ে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা আপোস-বিরোধী সম্মেলন (All Indain Anti-Compromise Conference) আহ্বান করেছিলেন (১৯শে মার্চ)। এই সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে কংগ্রেস নেতাদের আপোসমূলক মনোভাবের সমালোচনা করে দেশবাসীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান জানালেন। এর অল্পকাল পরেই 'জাতীয় সপ্তাহ' উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র ও স্বামী সহজানন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সূচনা করবার আবেদন জানিয়ে এক বিস্তৃত কর্মসূচী রাখলেন (৩১শে মার্চ, ১৯৪০)।

এই সময় থেকেই 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' বা কমিউনিষ্ট পার্টির সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট ও এম. এন. রায়-পন্থীরা পূর্বেই

সরে দাঁড়িয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য, এই 'জাতীয় সপ্তাহ' উদ্‌যাপন উপলক্ষেই কলকাতায় বাংলা কংগ্রেস ও 'এড্‌হক কংগ্রেস' অর্থাৎ সুভাষপন্থী ও খাদিপন্থীদের মধ্যে কলহ ও বিবাদ-সংঘর্ষ বেধে যায়। তীব্র বাদানুবাদ, বিতণ্ডা ও চেয়ারটেবিল ভাঙা-ভাঙিতে সভা-সমিতি পণ্ড হাওয়া একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। অত্যন্ত তিক্ত ও বেদনাজনক সেই ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। বলা বাহুল্য, এসব তিনি কোন দিনই অনুমোদন করেন নি। এই সময় একদিন 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস এসে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কবি স্বদেশী যুগের স্মৃতিচারণ উপলক্ষে সেদিনকার তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বাংলা দেশের চারিত্রিক প্রবণতা ও দোষ-ত্রুটির তীব্র সমালোচনা করলেন। সেদিন কবি আবেগ-উচ্ছ্বাসের মুখে যা বলেছিলেন সজনীকান্ত দাস মশায় তা 'শনিবারের চিঠি'তে ছেপে দিলেন। এখানে তার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা হল ঃ

"এই আমাদের দেশ, এ দেশের কোন্ সফল কীর্তি আমরা আশা করতে পারি? আদুরে ছেলের মত আমরা আবদারে ঠোঁট ফুলিয়ে ভাঙবার কাজেই আছি। গড়ার কাজ ধৈর্যের—পুরুষের। আমাদের দিয়ে তার কোনটা হ'ল না। শুধু মেয়েলি নালিশ—ওরা দিলে না এই অধিকার; সুতরাং কান্না শুরু কর, অলক্ষ্যে মাথা লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়। নিজেরা করব না, কাউকেও কিছু করতে দেব না।

"একটা বড় আশ্চর্য জিনিস দেখছি এই বাংলা দেশে, যে-সব পুরুষ এখানে দেশনেতার সম্মান লাভ করেন, নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের মত ঘর ভাঙাভাঙির খেলাকেই তাঁরা উচ্চ রাজনীতি ব'লে ঘোষণা করেন। তাঁদের পুরুষত্বে এতটুকু বাধে না। এখানকার লোকে তাই তিলে তিলে কিছু গ'ড়ে তোলবার জন্য দল বাঁধে না, দল বাঁধে গড়া জিনিসকে ভাঙবার পৈশাচিক আনন্দে। এ জিনিসকেও ক্ষমা করা যেত, যদি না দেখতাম, পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি তার দংষ্ট্রা বের করেআছে ।"...

"এই আমাদের ললাটলিপি। নইলে সেদিন যে সুযোগ বাঙালি

পেয়েছিল, তেমন সুযোগ জাতির জীবনে কচিৎ আসে। না আসুক, কিন্তু সেদিনের শিক্ষা কি আমাদের কোনও কাজে লেগেছে? যে খোকামি প্রশ্রয় পেয়ে আজ বাংলাদেশের কপিধ্বজ রথের চূড়ায় চড়ে বসেছে, সেই খোকামির স্বরূপ চেনবার শক্তি বাঙালির এতদিন অর্জন করা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, তা হয় নি। বাংলাদেশের আধুনিক পলিটিকস্ সেই নিষ্ফলতাই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

"দেখ আমার দেহ আজ অপটু, কিন্তু মন ছুটে চলেছে সেই পুরাতন কল্যাণের আদর্শ ধরে। ইচ্ছে করছে, আবার সকলের সঙ্গে মিলে কাজে লেগে যাই। তা আর সম্ভব হবে না। এই অক্ষমতার বেদনা নিয়েই আমাকে যেতে হবে। যদি পার, আমাদের সেদিনের সেই বিলুপ্ত ইতিহাস সংগ্রহ করবার চেষ্টা কর।"

[শনিবারের চিঠি - বৈশাখ, ১৩৪৭]

বৈশাখ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কবির ঐ স্মৃতিচারণ নিয়ে বাংলা দেশে বেশ কিছুটা গুঞ্জন ও চাঞ্চল্য পড়ে যায়। বাংলা দেশে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে তখন কয়েকটি দলই কুৎসা-অপপ্রচার করছিলেন। শুধু এড্ হক কংগ্রেস ও খাদিপন্থীরাই নয়—হিন্দু মহাসভা দলও তখন সুভাষচন্দ্রের তীব্র বিরোধিতা করছিলেন। উল্লেখযোগ্য, কিছু দিন পূর্বে কলিকাতা কর্পোরেশনে অল্ডারম্যান নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র মুসলিম লীগের সঙ্গে প্যাক্ট করে কর্পোরেশনকে যেভাবে ইউরোপীয়ানদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন তা খুবই চাঞ্চল্যকর ও প্রশংসনীয় হয়েছিল। এতে হিন্দু মহাসভা দল সুভাষচন্দ্রের উপর ভীষণ চটে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করেন। এমন কি রামানন্দবাবুও এরজন্য সুভাষচন্দ্রের উপর অত্যন্ত বিরূপ হন—যে-রামানন্দ শুরু থেকেই সুভাষচন্দ্রের পক্ষে প্রচার করে আসছিলেন। তাছাড়া বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা দীর্ঘকাল ধরে সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে আসছিলেন। বৈশাখ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুভাষ-বিরোধীরা উল্লসিত হয়ে

উঠে অপপ্রচার শুরু করেন যে রবীন্দ্রনাথ আসলে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদেরই তিরস্কার-ভর্ৎসনা করেছেন। ২৫শে এপ্রিল (১২ই বৈশাখ, ১৩৪৭) 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তার প্রতিবাদে "মিথ্যার জঞ্জালস্তূপ"—এই শিরোনামায় লিখলেন :

......"কিন্তু মিথ্যার ও একটা সীমারেখা আছে। কিন্তু কবির উক্তিকে বাংলার সর্বজনবরেণ্য নেতার বিরুদ্ধে এইরূপ নির্লজ্জভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, বোধ করি বা সে সীমারেখাও অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বড়কে ছোট করিবার এবং তৈরী জিনিসকে ভাঙ্গিবার কাজে বাঙালি যে কতদূর দক্ষতা অর্জন করিয়াছে, রাজধানীর কোলাহল ও কদর্যতা হইতে দূরে শান্তিনিকেতনের নিভৃত ছায়ার বসিয়া কবি তাহার সবটুকু দেখিবার তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন কিনা জানি না। না করিয়া থাকিলে এবার থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার লেখাকে কেহ দলগত স্বার্থসিদ্ধি করিবার কদর্য কার্যে ব্যবহার করিতে পারে তাহা বোধ হয় তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহার লেখার এমন অপপ্রয়োগ আর কখনও হইয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না। আমরা আশা করি, তিনি তাঁহার লেখাকে এইভাবে ব্যবহৃত হইতে দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করিবেন।"

কিন্তু এই অপপ্রচার সমানে চলতে লাগল। ৩০শে এপ্রিল (১৭ই বৈশাখ) দৈনিক 'ভারত' পত্রিকায় 'ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ' এই শিরোনামায় সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত লিখলেন :

"বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু নেতা আজ নাই। গতবর্ষেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সুভাষচন্দ্রকেই রাজনৈতিক নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। সেদিনও বাংলার রাজনৈতিক আকাশে মতবিরোধীর প্রতি 'অলক্ষ্যে মাথা লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়া' হইতেছিল। গান্ধী কুচক্রী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ মন্দ, জওহরলাল. কলের পুতুল ইত্যাদি ধুয়া অবলম্বন করিয়া বাংলার বহু জনসেবিত জনসভা মুখরিত হইতেছিল। যে নেতৃত্ব হইতে এই পৈশাচিক তাণ্ডব শুরু হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাহার কদর্যতা হয়ত সেদিন দেখেন নাই। হয়ত দেখিয়াও আশা করিয়াছিলেন যে, আহত অভিমান শান্ত হইলে

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিবে। জানি না, মাস ১২।১৪ পূর্বে গত বৎসরের এই বর্ষ আরম্ভের দিকটায় কিভাবে তাঁহাকে প্রণোদিত করিয়াছিল, বাংলার নেতৃত্বের যে সকল পরিচয় দোষবহ বলিয়া আজ তিনি তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, সেদিন তিনিই সেই নেতৃত্বের অকুণ্ঠিত সমর্থক হইয়াছিলেন। এই কয়েক মাস পূর্বে যাহাকে দেশগৌরব বলিয়া উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনা দিয়াছেন—আজ তাঁহারই অগৌরবে সারা বাংলাকে রবীন্দ্রনাথ মলিন দেখিতেছেন। হয়ত তিনি পরিবর্তনের জন্যই দিয়াছিলের—উন্নতির আশা করিয়াছিলেন। আজ কংগ্রেসের প্রতি বিদ্রোহ ও প্রগতি-বিরোধী জাতীয়তা-বিরোধী মুসলিম লীগের হাতে বাংলার নেতৃত্বের আত্মসমর্পন হয়ত নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার উদারতার ও স্নেহের অপব্যবহারের পরিচয় তাঁহাকে দিয়াছে, সেই জন্য তিনি যত কঠোর শব্দে পারেন বাংলার নেতৃত্বের উপর কশাঘাত করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। কিন্তু এই কশাঘাত কেবল সুভাষবাবুর উপর নয়। সুভাষবাবু বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা কাজেই নেতৃত্বের গৌরবের সুগন্ধী ফুলের মালাও যেমন তাঁহার প্রাপ্তব্য অগৌরবের দুর্গন্ধ-কর্দমতিলকও তেমনি তাঁহারই প্রাপ্তব্য।”......

এইবারের বৈশাখ সংখ্যা ‘শনিবারের চিঠি’ ঠিক কোন তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল তা বলা শক্ত। তবে ১০ই বৈশাখ, ১৩৪৭ (২৩শে এপ্রিল, ১৯৪০) ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় ‘স্বদেশী যুগের স্মৃতি’—এই শিরোনামায় লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হয়;—আর ‘যুগান্তর পত্রিকায় হয় ১২ই বৈশাখ বা ২৫শে এপ্রিল নাগাদ। সুতরাং ২১।২২ এপ্রিল নাগাদ ‘শনিবারের চিঠির,’ ঐ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল অনুমান করে নিতে পারা যায়। ১৮ই এপ্রিল কবি তাঁর সেক্রেটারী অনিল চন্দ সহ কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতায় তিনি দিন-দুই থেকে ২০শে এপ্রিল কালিম্পং যাত্রা করেন। অর্থাৎ কবির কালিম্পং যাত্রার পরই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শনিবারের চিঠির ঐ লেখাটি নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়।

যাই হোক, ঐ সব সমালোচনা ও অপপ্রচারে রবীন্দ্রনাথ-সুভাষচন্দ্রের মধ্যে কোন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় নি। সুভাষচন্দ্র অবশ্য কবিকে এসম্পর্কে কোন চিঠি লিখেছিলেন বলে মনে হয় না। কবি তখন মংপুতে।

সম্ভবতঃ সুভাষচন্দ্র কবির সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনা করেই এসম্পর্কে তাঁর বক্তব্য জানবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাছাড়া কিভাবে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সংগঠিত ও সর্বাত্মক রূপ দেওয়া যায়, সেই সমস্যা নিয়েই তিনি তখন আহোরাত্র চিন্তাভাবনা করছিলেন। একটি জিনিস তিনি স্থির বুঝতে পেরেছিলেন, যেমন করেই হোক ভারতের বিশাল মুসলিম সম্প্রদায়কে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সামিল করতে হবে। এই কারণেই ২৫শে মে (১৯৪০) ঢাকায় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তিনি হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনের পরিকল্পনা রাখেন। এরপর তিনি এই আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য তাঁর সমস্ত শক্তি ও উদ্যম নিয়োজিত করেন। ২৯শে জুন অপরাহ্নে কলকাতায় এলবার্ট হলে এক বিরাট জনসভায় সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন,

"হলওয়েল মনুমেন্ট জাতীর পরাধীনতার অন্যতম চিহ্নস্বরূপ। বহু বৎসর যাবৎ এই অলীক কলঙ্কচিহ্ন বাংলার বুকে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু আজ আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করিতেছি যে আমরা অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা পাইব এবং আমরা স্বাধীন জাতি হইব। তাই আজ আমরা আমাদিগকে পরাধীন হিসাবে ভাবিতে চাই না; আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করিতে চাই। সেই জন্য আমাদের যাহা কিছু পরাধীনতার চিহ্ন তাহাই অপসারিত করিতে চাই। হলওয়েল মনুমেন্ট ঐগুলির অন্যতম। ইহাকে অপসারিত করার সময় আসিয়াছে। এই বিষয়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সকলেই একমত। তাই যখন এমন একটা বিষয় পাওয়া গিয়াছে যাহা লইয়া বাঙালি মাত্রই একমত, তখন তাহা লইয়া আমাদের কাজ করিতে হইবে। ৩রা জুলাই সিরাজদ্দৌলার স্মৃতি দিবসের মধ্যে হলওয়েল মনুমেন্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লইবার দাবী বাংলা সরকারের নিকট করা হইয়াছে। আমরা চাই জাতির মিথ্যা কলঙ্কস্বরূপ এই মনুমেন্টটি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরাইয়া লওয়া হউক।"......

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ৩০শে জুন, ১৯৪০ ॥ ১৬ই আষাঢ়, ১৩৪৭]

ঐদিনই 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

আগামী ৩রা (জুলাই) থেকে আমাদের অভিযান শুরু হবে। আমি সিদ্ধান্ত করেছি যে, প্রথম দিনের বাহিনী পরিচালনা করব আমি নিজে।"

ঐদিনই রবীন্দ্রনাথ কালিম্পং থেকে কলকাতায় ফিরলেন (২৯শে জুন)। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখন খুবই ব্যস্ত। ২রা জুলাই মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় সুভাষচন্দ্র কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সংবাদ দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখলেন (৩রা জুলাই, ১৯৪০),

"মঙ্গলবার বেলা এগারটায় সময় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কবির সহিত তাঁহার আলোচনা হয়।"

সুভাষচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের এই শেষ দেখা-সাক্ষাৎ। আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, এই সাক্ষাতকারের মাত্র দু-তিন ঘণ্টা পর—বেলা আড়াইটার সময় গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার এলগিন রোডের বাড়িতে গিয়ে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করেন—ভারতরক্ষা আইনের ১২৯ ধারা মতে। গ্রেপ্তারের পরই তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে প্রেরণ করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখনও কলকাতায়। এই সংবাদে তিনি বিস্মিত না-হলেও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি যে গ্রেপ্তার হবেনই—সুভাষচন্দ্রের মুখে সম্ভবতঃ তিনি তা শুনেছিলেন। পরদিন (৩রা জুলাই) প্রাতে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কবি শান্তিনিকেতন যাত্রা করেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে পৌঁছে কবি স্থির থাকতে পারলেন না। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত তাঁর ঐ স্মৃতিচারণটি নিয়ে কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চলেছিল কবি কলকাতায় তা বিস্তারিত সব শুনেছিলেন। সম্ভবতঃ সুভাষচন্দ্রও সাক্ষাতে কবির বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার জানতে চেয়েছিলেন। এই সব শুনে কবি তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছিলেন। তাঁর কয়েকটি উক্তির যে এমন অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ হতে পারে একথা তিনি ভাবতেও পারেন নি। শান্তিনিকেতনে পৌঁছে সেই দিনই কবি ইউনাইটেড প্রেস-এর মারফৎ ঐ সম্পর্কে লোকের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করবার জন্য নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রচার করেন (৩রা জুলাই, ১৯৪০):

"অল্প কয়েকদিন হোলো আমার কোনো ভাষণে আমি দেশের লোকের কাছে যে বেদনা জানিয়েছিলুম সেটাতে বিশেষভাবে সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে একটা অনুমান সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, সেটা আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়, কারণ ইঙ্গিতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখে ব্যক্তি-বিশেষকে এরকম গঞ্জনা আমার স্বভাবসঙ্গত নয়।

"মোকাবিলায় আমি সুভাষকে কখনো ভর্ৎসনা করিনি তা নয়, করেছি তার কারণ তাকে স্নেহ করি। কিন্তু সেদিন আমি সাধারণত বাংলাদেশের সেই শ্রেণীর লোককেই ধিক্কার জানিয়েছিলুম, যাঁরা কাজ করেন না, কলহ করেন, দল বঁ·· · গয়ে দল ভাঙেন। একদিন সমস্ত বাংলাদেশে আশ্চর্য উদ্যমের সঙ্গে জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। তখন আমরা নানারকম সঙ্কল্প নিয়ে নানা কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম। কিন্তু সেই কর্মধারা আমাদের সমবেত শক্তির বিকারবশত বিলুপ্ত হয়ে গেল। সেদিনকার এত বড় সুযোগ নষ্ট করেছে বাঙালি এ দুঃখ ভুলতে পারব না। সেদিন বাংলা ভারতের সকল প্রদেশের চেয়ে অগ্রবর্তী হয়েছিল। তারপর একদিন সেই সমাজ সাধনার মধ্যে পলিটিক্স-এর কূটকৌশল নানা দুর্নীতি এনে দিলে। ভয় হয় এই চাতুরী আমাদের স্বভাবে আছে। আমরা সোজা পথ দিয়ে না চলে বাঁকা পথ দিয়ে তাড়াতাড়ি ফল পাবার চেষ্টা করে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি জাগিয়ে তুলি, গোড়া ঘেঁষে আপনার সর্বনাশ করে থাকি, পরস্পরকে বিশ্বাস করিনে, পরস্পরকে উপরে উঠতে বাধা দিই, দেশবাসীদের ধ্বংসপ্রবণ স্বভাবের বিরুদ্ধেই আমার অভিযোগ জানিয়েছি।

"ব্যক্তিগতভাবে সুভাষকে আমি স্নেহ করি। তাঁর কোন্ অভিপ্রায় কোন্ প্রণালীর সুদূর পরিণতি লক্ষ্য করে চলেছে তা আমি জানিনে, কেন না পলিটিক্স আমার অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরে। কিন্তু তিনি দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসেন এবং দেশবিদেশের রাষ্ট্রনীতি তিনি চর্চা করেছেন। সেই জন্যই তাঁর কাছে আমি আশা করি এবং দাবী করি তিনিও দেশকে তার বর্তমান দুর্গতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন, তার সাংঘাতিক অনৈক্য গহ্বরের উপর সেতুবন্ধন করবেন, তাঁর প্রতি

দেশের সকল শ্রেনীর লোকের বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করবেন, তাঁর দেশসেবা সার্থক হবে। চারিদিকে দলীয় আঘাতে অভিঘাতে তাঁর মনকে উদ্‌ভ্রান্ত না করে, তাঁর প্রতি আমার এই সস্নেহ শুভকামনা।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২০শে আষাঢ়, ১৩৪৭ ॥ ৪ঠা জুলাই, ১৯৪০]

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ঐদিনই আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে লেখা হল :

"দীর্ঘ দুই মাস পরে কবি সেই আপত্তি জানাইয়াছেন। আরও কিছুদিন পূর্বে জানাইলেই ভাল করিতেন। যাঁহাকে ঘিরিয়া একদা এই কদর্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, আজ তিনি সরকারের বিধানে কারাগারের পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে। সংবাদপত্রের কদর্য কোলাহল সেখানে পৌঁছিবে না। ভরসা করি কবির শুভকামনা তাঁহার নিঃসঙ্গ দিনগুলি আশায় ও আনন্দে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে।"

এর পরের ঘটনা আজ সকলেরই সুবিদিত। ঐ বৎসরই নভেম্বরের শেষ ভাগে (২৯শে) সুভাষচন্দ্র জেলখানায় আমরণ অনশন শুরু করলে তার কিছুদিন পর গভর্ণমেণ্ট তাঁকে মুক্তি দিয়ে (৫ই ডিসেম্বর) তাঁদের এলগিন রোডের বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখেন। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরই তিনি দেশের বাইরে পালিয়ে যাবার মতলবে সুযোগে-সন্ধান খুঁজছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথের কথা তাঁর বার বার মনে আসে —হয়ত দেখা করেও কিছু বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। কয়েকমাস পূর্বে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) কবি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। জেলখানায় সে সংবাদ পেয়ে সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন—কবিকে চিঠিও লিখতে চেয়েছিলেন। পালিয়ে যাবার মাত্র ছয় দিন পূর্বে রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে এই সব কথা জানিয়ে লিখলেন (১১ই জানুয়ারী, ১৯৪১)। তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল, পুলিশ অচিরেই তাঁকে পুনর্বার গ্রেপ্তার করবে।

চিঠিটি ছিল এই :

38-2 Elgin Road, Calcutta
১১।১।৪১

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

গুরুদেবের অসুখের সময় থেকেই ভাবিতেছি আপনাকে চিঠি লিখি। সে সময়ে আমি জেলখানায় এবং আপনারা তাঁর অসুখ লইয়া খুবই বিব্রত। তারপর গুরুদেবের কতকটা আরোগ্য হইবার পরই আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি এবং অসুস্থ অবস্থায়ই অনশন আরম্ভ করিতে বাধ্য হই। বাড়ী ফিরিয়া প্রত্যহই ভাবিতেছি আপনাকে লিখি—শেষে আজ সঙ্কল্প করিয়া লিখিতে বসিলাম।

আমার প্রিয়বন্ধু নাথালাল পারেখ ও তাঁহার স্ত্রী গুরুদেবের এবং আপনাদের সহৃদয় ব্যবহার ও আতিথ্যলাভ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। গুরুদেবের প্রশংসা তাদের মুখে আর ধরে না।

গুরুদেবের শরীর আজকাল কেমন আছে লিখিয়া বাধিত করিবেন। আপনি নিজে কেমন আছেন?

আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা ভাল—তবে কতকগুলি গ্লানি এখনও আছে। বোধ হয় স্বস্থানে শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে হইবে—প্রভুদের সেই রকম ইচ্ছা।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনীত

(স্বাঃ) শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

১৭ই জানুয়ারী (১৯৪০) শেষ রাত্রে সুভাষচন্দ্র ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ শিশির বসুকে নিয়ে এলগিন রোডের বাড়ি ত্যাগ করে মোটরযোগে বেরিয়ে পড়েন। পরদিন শেষ রাত্রে গোমো ষ্টেশন থেকে তিনি উত্তর ভারতের পথে রওনা হন। শিশির বসু কলকাতায় ফিরে আসেন।

প্রায় দশ দিন পর গভর্ণমেন্ট তাঁর এই পালিয়ে যাবার খবর জানতে পারেন। ২৮শে জানুয়ারী সমস্ত প্রভাতী সংবাদপত্রে ফলাও করে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের খবর প্রকাশিত হয়। এই সংবাদে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন

হয়ে উঠলেন। ৩০শে জানুয়ারী তিনি শান্তিনিকেতন থেকে শরৎ বসুকে তার করলেন,

"Deeply concerned over Subhas's disappearance. Convey to mother my sympathy. Kindly keep me informed of news."

জবাবে শরৎ বসু তার করলেন,

"Mother and we profoundly touched by message. No news Subhas yet despite utmost efforts last few days. Hope he will have your blessings wherever he may be."

কবি বিস্তারিত সব খবর জেনে আসবার জন্য অনিল চন্দকেও শরৎবাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। জরাজীর্ণ ও রোগশীর্ণদেহেও সুভাষচন্দ্রের জন্য তাঁর উদ্বেগের অন্ত ছিল না। এর ছয় মাস পরেই কবির মৃত্যু হয়। জীবনের শেষদিন পর্যন্তও সুভাষচন্দ্রের জন্য কবির আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছিল।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

দিলীপকুমার রায়কে সুভাষচন্দ্রের পত্র

ম্যাণ্ডেলে জেল

৯/১০/২৫

ভাই দিলীপ,

এ কথা কিছুতেই মনে কোরো না যে, আমার দৃষ্টি নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। "Greatest good of the greatest number"-এতে আমি যথার্থই বিশ্বাস করি, কিন্তু সে "good" আমার কাছে সম্পূর্ণ বস্তুগত নয়। অর্থনীতি বলে, মানুষের যে-কোন কাজই হয় "productive", নয় unproductive"; তবে কোন্ কাজ যে "productive", তা নিয়ে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হ'য়ে থাকে। আমি কিন্তু কারুকলা বা সে-সংক্রান্ত কোন প্রচেষ্টাকে "unproductive" মনে করিনে। আর দার্শনিক চিন্তা বা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে নিষ্ফল বা নিরর্থক ব'লে অবজ্ঞা করিনে। আমি নিজে একজন আর্টিস্ট না হ'তে পারি—আর সত্যি বল্‌তে কি আমি জানি যে তা নই—কিন্তু সেজন্যে দোষী প্রকৃতি বা ভগবান যাই বলো, আমি নই। অবশ্য যদি বলো যে আর জন্মের কর্মফল এ-জন্মে ভোগ কর্‌ছি, তাহ'লে আমি নাচার। সে যাই হোক্, এ জন্মে যে আর্টিস্ট হ'লুম না তার কারণ, হ'তে পারলুম না; আর আমার বিশ্বাস, "শিল্পী জন্মায়, তৈরী করা যায় না", এ কথা অনেকটা সত্য। কিন্তু নিজে আর্টিস্ট না হ'লেই যে আর্ট উপভোগ করা যায় না, এমন কোনো কথা নেই; আর কোনও কলার সমঝদার হ'তে গেলে তা'তে নিজের যেটুকু পরিমাণ দখল থাকা দরকার, আমার মনে হয় তা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সুলভ।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে এ আক্ষেপ কোরো না যে সঙ্গীত নিয়ে তুমি সময়টা হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, যখন শেক্সপীয়রের কথায় বল্‌তে গেলে "the time is out of joint", বন্ধু, সারা দেশকে সঙ্গীতের বন্যায় প্লাবিত ক'রে দাও,

আর যে-সহজ আনন্দ আমরা প্রায় হারিয়ে বসেছি, তা' আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো। যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সঙ্গীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে জগতে বৃহৎ কি মহৎ কিছু সম্পাদন করা কি কখনও সম্ভব? কার্লাইল বলতেন সঙ্গীত যার প্রাণে নেই, সে করতে পারে না হেন দুষ্কার্যই নেই। এ কথা সত্যি হোক বা না হোক, আমার মনে হয় যার প্রাণে সঙ্গীতের কোন সাড়া নেই, সে চিন্তায় বা কার্যে কখনও মহৎ হ'তে পারে না। আমাদের প্রত্যেক রক্তকণিকায় আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হোক এই আমরা চাই, কারণ আনন্দের পূর্ণতাতেই আমরা সৃষ্টি করতে পারি। আর সঙ্গীতের মত এমন আনন্দ আর কিসে দিতে পারে?

"কিন্তু আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষেও সহজলভ্য করতে হবে। সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য ছোট-ছোট গণ্ডীর মধ্যে চল্‌বে, আর সেরকম চর্চা হওয়াও উচিত; কিন্তু সঙ্গীতকে সর্বসাধারণের উপযোগীও ক'রে তুল্‌তে হবে। বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হ'লেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে, আর তাতে আর্ট নির্জীত (নির্জীব?) ও খর্বই হ'য়ে যায়। আমার মনে হয় লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের (folk music and dancing) ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে। ভারতবর্ষে জীবন ও আর্টের মধ্যে এই যোগটি পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায় ছিন্ন ক'রে ফেলেছে, অথচ তার স্থানে নূতন কোন যোগসূত্র যে আমরা পেয়েছি, তাও নয়। আমাদের যাত্রা, কথকতা, কীর্তন প্রভৃতি যেন কোন অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুতঃ যদি আমাদের গুণী শিল্পীরা অচিরে আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না কর্‌তে পারেন, তাহ'লে আমাদের চিত্তের যে কি দৈন্যদশা ঘটবে, তা ভাবলেও শিউরে উঠ্‌তে হয়। তোমার হয়ত মনে আছে তোমাকে আমি একবার বলেছিলাম যে, মালদায় "গম্ভীরা" গানের সৌন্দর্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। তা'তে সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়ই ছিল। বাঙলার অন্যত্র ওরূপ জিনিস কোথাও আছে ব'লে ত আমি জানিনে; আর মালদাতেও ওর মৃত্যু শীঘ্রই অবশ্যম্ভাবী, যদি নূতন ক'রে প্রাণশক্তি ওতে সঞ্চারিত কর্‌বার চেষ্টা না হয়, আর বাঙলার অন্যান্য স্থানেও ওর

প্রচলন না হয়। বাঙলা দেশে লোকসঙ্গীতের উন্নতিকল্পে মালদায় তোমার শীঘ্রই যাওয়া উচিত। গম্ভীরার মধ্যে জটিল বা বিশাল বা মহৎ কিছুই নেই, —তার গুণই এই যে তা সহজ, সাদাসিধে। আমাদের নিজস্ব folk-music ও folk-dancing একমাত্র এই মালদাতেই এখনও বেঁচে আছে, আর সেই হিসেবেই গম্ভীরার যা মূল্য। সুতরাং যাঁরা ও-প্রকার সঙ্গীত ও নৃত্য পুণর্জীবিত করতে চান, তাঁদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা।

লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের দিক্ থেকে বর্মা এক আশ্চর্য দেশ। খাঁটি দিশি নাচ ও গান এখনও পুরোদমে এখানে চলেছে, আর সুদূর পল্লীতে পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ লোককে আমোদ-আহ্লাদের খোরাক জোগাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অনুশীলন করার পর, তুমি যদি ব্রহ্মদেশের সঙ্গীতের চর্চা করো ত' মন্দ হয় না। সে-সঙ্গীত হয়ত তত সূক্ষ্ম বা উন্নত নয়, কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিতকেও আনন্দ দান কর্‌বার যে ক্ষমতা তার আছে, আপাততঃ আমি তা'তেই আকৃষ্ট হয়েছি। শুনি নাকি এখানকার নাচও বড় সুন্দর। বর্মায় জাতিভেদ না থাকাতে এখানকার শিল্পকলার চর্চা কোন শ্রেণী বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ফলে বর্মায় আর্ট চারিদিকে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছে। বোধ হয় এই কারণে, আর লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের প্রচলন থাকার দরুন ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের চেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সৌন্দর্যজ্ঞান-অনেক বেশি পরিণতি লাভ করেছে। দেখা হ'লে এ বিষয়ে আরও কথা হবে।"......

ইতি

তোমার স্নেহবদ্ধ

সুভাষ

[অনামী ॥ পৃঃ ৩২৭-৩১]

সুভাষচন্দ্রের পত্র পড়ে দিলীপ রায়কে রবীন্দ্রনাথের পত্র

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিখানা কাল পেয়ে বড় খুসি হলুম। সুভাষের চিঠি বড় সুন্দর —এই লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছি। সুভাষ আর্ট সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার বিরুদ্ধে বল্‌বার কিছুই নেই। যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা করা যায় না —সেইখানেই নানা রঙের রসের মেঘ জমে ওঠে—সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে ব'লেই তার বর্ষণের দ্বারা নীচের মাটি উর্বর হ'য়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি ক'রেই হয়, উপরকে নীচে বেঁধে দিলে হয় না। যারা রসের সৃষ্টিকর্তা তাদের উপর যদি হাটের ফরমাস চালানো যায়, তাহলেই সর্বনাশ ঘটে। ফরমাস তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে। সেই ফরমাস অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিস তৈরি করতে পারে, তা'হলেই আপনিই তার উপরে সর্বলোকের অধিকার হবে। কিন্তু সকলের অধিকার হলেই যে হাতে হাতে সকলে অধিকার লাভ কর্‌তে পারে —ভালো জিনিস এত সস্তা নয়। বসন্তে যে-ফুল ফোটে সে-ফুল তো সকলেরই জন্যে, কিন্তু সকলেই তার মর্যাদা সমান বোঝে, এ কথা কেমন ক'রে বলব? বসন্তে আমের মুকুলে অনেকেরই মন সায় দিলে না ব'লেই কি তাকে দোষ দেব? বলব, তুমি কুম্‌ড়ো হলে না কেন? বলব কি, গরিবের দেশে বকুল ফুল ফোটানো বিড়ম্বনা—সব ফুলেরই বেগুনে ক্ষেত হয়ে ওঠা নৈতিক কর্তব্য? বকুল ফুলের দিকে যে অরসিক চেয়ে দেখে না, তার জন্যে যুগযুগান্তর ধ'রেই বকুল ফুল যেন অপেক্ষা ক'রে থাকে, মনের খেদে এবং লোকহিতৈষীদের তাড়নায় সে যেন কচুবন হ'য়ে ওঠবার চেষ্টা না করে। গ্রীসে সর্বসাধারণদের জন্যেই সফোক্লীস্, এস্কিলাসের নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল, কেবল

বিশিষ্ট কতিপয়ের জন্যে নয়। সেখানকার সাধারণের ভাগ্য ভালো যে, তারা কোনো গ্রীসীয় দাশু রায়ের শরণাপন্ন হয় নি। সাধারণকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভালো জিনিস দিতে থাক্‌লে ক্রমশই তার মন ভালো জিনিস গ্রহণ কর্‌বার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। কবিকে আমরা যেন এই কথাই বলি—তোমার যা সর্বশ্রেষ্ঠ তাই যেন তুমি নির্বিচারে রচনা করতে পারো; কবি যদি সফল হয়, তবে সাধারণকে বলব—যে-জিনিস শ্রেষ্ঠ তুমি যেন সেটি গ্রহণ কর্‌তে পারো। যারা রূপকার, যারা রসস্রষ্টা, তারা আর্টের সৃষ্টি সম্বন্ধে সত্য ও অসত্য, ভালো ও মন্দ এই দুটি মাত্র শ্রেণীভেদই জানে—বিশিষ্ট কতিপয়ের পথ্য ও ইতরসাধারণের পথ্য ব'লে কোনো ভেদ তাদের সাম্‌নে নেই। শেক্‌সপীয়র সর্বসাধারণের কবি ব'লে একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হ্যাম্‌লেট কি সর্বসাধারণের নাটক? কালিদাস কোন্ শ্রেণীর কবি জানিনে, কিন্তু তাঁকে আপামরসাধারণ সকলেই কবি ব'লে প্রশংসা ক'রে থাকে। জিজ্ঞাসা করি, যদি মেঘদূত গ্রামের দশজনকে ডেকে শোনান যায়, তা'হলে কি সেই অত্যাচার ফৌজদারী দণ্ডবিধির আমলে আসতে পারে না? সর্বসাধারণের মোক্তার যদি কালিদাসের আমলে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন বেদখল ক'রে কালিদাসকে ফরমাসে বাধ্য কর্‌তেন, তা'হলে মেঘদূতের জায়গায় যে পদ্যপাঠ তৈরি হ'ত, মহাকাল কি সেটা সহ্য করতেন? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো, এ-সমস্যার মীমাংসা কী? আমি বলব মেঘদূত গ্রামের দশজনের জন্যেই, কিন্তু যাতে সেই দশজনে মেঘদূত নিজের অধিকার করতে পারে, তারই দায়িত্ব দশোত্তরবর্গের লোকের। যে-দশজন মেঘদূত বোঝে না, তাদের খাতিরে মেঘদূতের বদলে পদ্ম-ভ্রমরের পাঁচালিতে সস্তা অনুপ্রাসের চক্‌মকি ঠোকা কবির দায়িত্ব নয়। কৃত্রিমতা সকল কবি সকল আর্টিস্টের পক্ষেই দূষণীয়, কিন্তু যা সকলেই অনায়াসে বোঝে সেটাই অকৃত্রিম, আর যা বুঝতে চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধনের দরকার সেটাই কৃত্রিম, এ-ধরণের কথা অশ্রদ্ধেয়। সর্বসাধারণকে আমরা মনে অশ্রদ্ধা করি ব'লেই রসের নিমন্ত্রণ-সভায় আমরা বাইরের আঙিনায় তাদের জন্য চিঁড়ে-দইয়ের ব্যবস্থা করি—সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি যাদের বড় লোক বলি তাদের জন্যেই। শিশুদের আমরা অশ্রদ্ধা করি ব'লেই শিশু সাহিত্যের রচনার ভার গোঁয়ার সাহিত্যিকদের

ওপর। তারা ছেলেমানুষির গ্যাকামি করাকে ছেলেদের সাহিত্য ব'লে মনে করে। আমি ছেলেদের শ্রদ্ধা করি, এইজন্যে আমি আমাদের বিদ্যালয়ে যখন ছেলেদের পড়াই তখন তাদের জন্য যথার্থ সাহিত্যেরই আয়োজন করি —এমন সাহিত্য যা আমাদের সকলেরই ভোগের জন্য। অবশ্য আমাকে চেষ্টা করতে হয় যাতে শিশুরা এই সাহিত্যের রস বুঝতে পারে। এ-চেষ্টা ক'রে আমি বিফল হয়েছি, তা বলতে পারিনে।

এত কথা তোমাকে বল্‌বার দরকার ছিল না,—বাচালতা ক্রমে বেশি ক'রে অভ্যস্ত হ'য়ে আসছে ব'লে বন্ধু সমাজে কথার মাত্রা রাখতে পারি নে। যাহোক্, সুভাষের চিঠিখানি পাঠিয়ে তুমি আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছ— সেই কৃতজ্ঞতাবশতই, আমার ডান হাতের তর্জনী এই খানিক আগে ছুরিতে বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও এতখানি লিখে ফেলল্‌ম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অনামী। পৃঃ ৩৩১-৩৩]

পরিশিষ্ট-২

১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে ঐতিহাসিক কলকাতা-কংগ্রেসেই সুভাষচন্দ্র সর্বপ্রথম "পূর্ণ স্বাধীনতা'র দাবীতে প্রকাশ্যেই গান্ধীজীর বিরোধিতা করলেন। গান্ধীজীর উত্থাপিত মূল প্রস্তাবে ইংরেজকে এক বৎসরের সময় দেওয়া হয়েছিল—যদি তারা ইতিমধ্যে সর্বদলীয় কমিটির খসড়া-শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারতবর্ষের 'ডোমিনিয়ন স্টেটাসের' দাবী মেনে নেয়। ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার মধ্যরাত্রে 'সাবজেক্ট কমিটি'র মিটিঙে গান্ধীজীর ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরদিনই সুভাষচন্দ্র তার প্রতিবাদে আশু পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে এক প্রেস-বিবৃতি দেন। বিবৃতিটি যথাযথভাবে এখানে উদ্ধৃত করা হল:

"On Friday night Mahatmaji's resolution just adopted in the Subjcet Committee.

The implication of the resolution is that if the British Government accept the constitution on or before the 31st December, 1929, the Congress will adopt it and thereby commit itself definitely to Dominion Status. That is a position to which we can never agree. Even if Dominion Status is conceded to-day, we cannot accept it as a fulfilment of our National Demand. *We stand for 'Independence' not in the distant future but as immediate objective. The cleavage, between the two wings in the Congress is, therefore, fundamental.** We in Bengal had great hopes that among the older Leaders at least Pandit Motilal Nehru would be with the younger school, and take upon himself the task of leading and

*ইটালিকস্ আমার—লেখক।

guiding them. But for the time being that expectation has not been fulfilled. But we still hope that ever long he will be whole-heartedly with us.

Everybody realises, and our older Leaders also do so, that we shall not get even Dominion Status however unanimous our demand may be, unless we are able to devise sanctions. The resolution in question does not mention any sanction. The campaign of Non-co-operation is to be organised not for the purpose of enforcing our demand but in the event of non-acceptance of it by the British Government on or before the 31st Dec. or in the event of its earlier rejection. Unless the campaign of Non-co-operation or some other effective sanction is resorted to at once, it is sure as the Sun rises in the East that our demand even for Dominion Status will be rejected with contempt by the British Government.

Mahatmaji's moving the resolution has created an impression in certain quarters that he is going to take up the Leadership as he did in 1920. This has led many members of the All India Congress Committee vote for the resolution. Nobody would be more happy than myself if Mahatmaji could be persuaded to take the lead. I have myself begged him more than once to take up the leadership. When I had been to the Sabarmati Ashram a few months ago I assured him that the time had come for a bold lead and that the entire younger generation was anxiously waiting for it. From what fell from his lips in Calcutta the other day in reply to a straight question I put to him, I doubt if Gandhiji

will take upon himself the task of creating the sanctions for enforcing India's National demand in the same manner in which he did in 1920.

What we feel most acutely is that at a most critical juncture in our history our older leaders have failed to rise to the occasion. After the death of Lala Lajpat Rai and the manner in which it was brought about, after the happenings at Lucknow and Cawnpore and at other places and after the speech of His excellency the Viceroy, we would have expected our Leaders to respond to the attitude of the Government in a fitting manner by adopting a policy, at once bold and defiant. Unfortunately we have been presented with a resolution which does not inspire any one which makes no appeal to man's highest emotions and aspirations. And even this unsatisfactory resolution our older Leaders were made to agree to the greatest difficulty.

The resolution when it goes out to the world will have a damping effect on the souls of the younger generations and the effect of it will be that at least for some time to come, the Youth Congress and the Independence League will become more real and more living bodies. As the Labour Party in England drew away the most active and virile elements from the Liberal Party by the adoption of a more progressive policy, so also will be the Indian Youth Congress and the Independence for India League attract the progressive minds in the Congress. A comparison between a sitting of the All Parties Convention and a sitting of the Youth Congress in the same Pandal will clearly show which way

the wind blows. It is regrettable that our old leaders do not fully realise what the younger generation think and feel and how rapidly they have advanced within the last few years.

Our task at the moment is quite clear. We cannot waste our time and energy by quarreling with those with whose views we may be at variance. We have to carry on our work according to our light and the dictates of our conscience. Even if the ideal of our older leaders falls short of ours, we are prepared to co-operate with them whole-heartedly and work under their guidance, if their policies and programmes meet with our approval. Inspite of our differences in the world of ideal, it is still possible to have united action in the field of (?) if only those responsible for the resolution come forward with a fighting programme. Whether their programme of action will come up to our expectation or not, remains to be seen.

There is another point which many of us may have lost sight of. The effect of this resolution will be to affect our international prestige and reputation International opinion is no small asset to a nation. The Madras Congress gave us an added prestige in International politics which the Calcutta is going to destroy. I would like to know how our older leaders are going to compensate us for this loss.

The responsibility which has been cast on the youths of this country is very great and they have to prepare themselves for the task that lies ahead. My faith in them is unbounded and I have no doubt that if the older leaders fail to rise to the occasion the younger generation will march ahead and had the country on to the cherished goal of freedom." (*A. P. I.*)

[*Amrita Bazar Patrika*—Saturday, December 29, 1928]

Bengal Flood Relief Controversy

Acharyya P. C. Roy's Letter :

To Subhas Chandra Bose

My dear Subhas,—I have your letter of the 19th instant. I already gave you reasons why I could not be President of the B. P. C. C. Relief Committee. You write that on the 8th August your Committee elected me President. But between the 8th and 15th you did not communicate this to me nor do the appeals and notices issued by the B. P. C. C. Committee mention my name as the President although the name of the Secretary was specifically mentioned. I accepted Presidentship of the *'Sankat Tran Samity'* on the 14th instant.

You mentioned that you issued press message all over India announcing my name as President. It is strange that no such press messages appeared in Bengal. If it is true then you have used my name without my permission and knowledge. You have committed a serious breach of code of honour. Kindly send me copies of all such telegrams and messages. I am afraid that you did not want me but wanted to use my name.

Having regard to the events that have happened since my last letter to Captain Dutt expressing my inability to be President of your Committee, you have left me no alterna-

tive but to withdraw my name even as a member of the B.P. C. C. Flood & Famine Relief Committee.

Now I shall deal with another letter of yours published in the *Liberty* of yesterday apparently meant for me but strangely not delivered to me containing allegations against the working of the Bengal Relief Committee of 1922.

After the first aid was rendered instead of giving gratuitous relief, the Committee agreed to do some work of permanent good to the people. Charka had then already been given for relief work. The Charka work was agreed upon by the Committee to be continued and along with it a hospital was to run so long as the founds lasted. At this time the Committee had 1,16,000 (one lakh sixteen thousand rupees) assets in all. This included fixed property like land, building, furniture at different centres. These excluded there was Rs 85,000 to carry on hospital and Charka work as long as possible.

At first about 40 workers were engaged in Charka work. The result is that the money spent on Charka has given the people of the locality a sort of staying power during times of distress. During the present flood, which has also affected the old flooded area, in those parts where Charka was continued, people are relying upon Charka for relief—the object of the Committee to substantially aid the people has been fulfilled.

Another benevolent work was undertaken and is still continued. It is the maintenance of a hospital and dispensary at Atrai. About 70 to 80 patients receive treatment

and medicines every day free. People from miles come and bless this as a magnificient piece of relief.

The funds were utilised in making the site of Atrai a suitable one for work of a permanent nature. The Committee has 20 Bighas of excellent land in a lovely site at Atrai and 13 Bighas of land at Talora. At both these places there are buildings suitable for accommodation of worker and for carrying on the work. These were built out of the cash then in hand, a portion of which thereby got fixed up.

After subscription ceased to come, it was a question of continuing as long as possible and maintained the work undertaken. The hospital and Charka work are conducted under the guidance and control of Dr. Niren Dutt, whose capacity and devotion is known to the public of North Bengal. His reputation as a successful physician is one of the assets, which has endeared Atrai relief base to the people of the locality. The Charka work, although continued to be a spending work like the hospital, has been so far successful that relief yarn is the finest yarn in Bengal and Relief Khadi hopes to stand equal to Andhra Khadi in texture and cheapness. A stage has been reached when even the Khadi work promises to be self-supporting. The present position is that Rs. 15,000, the entire present surplus is with the *Khadi Pratisthan* for carrying on the current work. *Khadi Pratisthan* manages the selling side only. The *Pratisthan* spends four to five thousand rupees annually for the relief organisation but does not take anything from it and has helped to keep the work alive all these years.

I am sorry you do not know all these. When gratuitous relief was stopped and husking operations were closed and Charka work was begun, may be you were not interested in it and therefore you do not remember or it may be, you were in internment at that time. The accounts were audited and published at that time. I invite you to come to Atrai and acquaint yourself with the work done and see the accounts past and present.

Dr. Niren Dutt has been selflessly serving these nine years. He is a bachelor. He does not take any remuneration. It is through his sacrifices that it has been possible to continue the work of Relief Commitee for such a long time. He is still there at his post now devising means for protecting the people from the effects of the present flood. This work through God's grace is continuing through nine years. I hope you do not want all these activities to stop.

You may remember that in 1922 when the flood broke in, you were placed in charge of the entire relief operations from Santahar Base. Satish was then at Calcutta office. Before the work was fully organised during the days of extreme distress of flood, you left the Seva work and suddenly came away to Calcutta evidently for fresh and more congenial field. You did not give us notice, you did not give us time to choose a successor. You left your position of trust and came to Calcutta, never to return. Then the responsibility was put on the shoulder of Dr. Indra Narayan Sen. He had to give up his Calcutta practice for that. He went there for temporary service and was not prepared for continued work. He had a

big family to maintain at Calcutta, but when you came away without giving any time to get prepared, I had to ask Dr. Indra Narayan to take up the work in the absence of any other suitable man. Dr.' Indra Narayan had to be fixed up there. He had to break up his Calcutta establishment, give up Calcutta practice. Now he is a cultivator doctor in a village. He is serving poor villagers. God has rewarded him with poverty.

To-day after nine years you come and say that all the money of the Bengal Relief Committee be handed over to your Committee, all the money that I am now collecting for *'Sankat Tran Samity'* be handed over to your Committee, not only this, you lay claim on me also. I wish for that happy day when you may be associated with all my benevolent activities, but to-day from your direction I see no signs of it.

I have been administering the founds of the Bengal Relief Committee with the help of colleagues like Satish Chandra Das Gupta, Dr. Niren Dutt, Dr. Indra Narayan Sen Gupta etc. The country knows what service I have been able to render with the help of these selfless friends.

You have cast aspersions on the *Khadi Pratisthan* also, it being a losing concern. There is a clear hint as to how the *Pratisthan* might be managing its affairs. It is a losing concern ! So it may be misdirecting Relief money or other funds. That may be your suspicion. But will you know how the *Khadi Pratisthan* stands ? Satish has given his everything to it. His everything means a sum in cash of one lakh twenty

five thousand rupees honestly earned, which he brought over with him when he left Bengal Chemical, his furniture and utensils, his library, his wife's jwellery, the shares of the Bengal Chemical, Life Assurance Policies compounded and cashed. He has kept nothing, not a copper. I protested, but he did not listen. Kshitish also has given his all and his running concern, the Printing Ink Factory. I had also some thing, about fifty thousand rupees in cash and shares. These were also handed over to a Trust and the *Pratisthan* is the beneficiary. Whatever little income I have the savings, go mainly to the *Khadi Pratisthan*. Gandhiji has given over two lakhs to the *Pratisthan*. Gandhiji's admirers and my friends help the *Pratisthan* annually with about 10 to 15 thousand rupees. Well, only lately Satish got tweenty five thousand rupees by making some soap and selling a soap formula, which he handed over to the *Khadi Pratisthan*. There is the sacrifice and capacity and devotion of Satish, Kshitish and their group of yong men behind the *Khadi Pratisthan*. That is how the *Pratisthan* runs. You may cut it, squeeze it, rub it, but you won't get any dirt out of it, only the more you rub, like Chandan the sweeter the scent will emanate. I have dwelt at length on these points to clear away all your doubts and of those others who may think like you.

It ill becomes you to invite me to become the President of your Flood Relief Committee while at the same breath you accuse me of maladministration, if not actual breach of trust with regard to the funds of another Relief Committee, namely, the Bengal Relief Committee of 1922.

You are angry because I did not accept the Presidentship of the B. P. C. C. Relief Committee. You have threatened to label me as an extreme partisan if I do not submit to your coercion. You have now taken up the game of throwing mud on my stainless irreproachable colleagues and on an institution of my creation having a mission before it namely the *Khadi Pratisthan*. Well, you may do so, but you won't draw me into a controversy. I need not defend myself against your insinuations. I hope my countrymen will bear with me for a few more years that I may be allowed to serve my motherland. God is merciful and you are young. May he give you wisdom.

As you have already sent copies of your letters to me to the Press, without my permission, you asked for, I have no other alternative but to send a copy of the reply to the Press."

Sd/- P. C. Ray

[*Amrita Bazar Patrika*—Tuesday, August 25, 1931]

A Reply To Sir P. C. Roy :
Sj. Subhas Chandra Bose About Relief Fund of 1922 :
Protest Against Unauthorised Diversion.

The following letter has been sent by Sj. Subhas Chandra Bose to Sir P. C. Roy in reply to the latter's letter to Sj. Bose :

Calcutta

The 23rd August, 1931

My dear Sir,

I am in receipt of your letter of the 22nd August 1931. I am constrained to say that the letter does not do justice to yourself.

Regarding your presidentship of the Congress Relief Committee, I have already said that I made a public pronouncement at the Albert Hall meeting on the 10th August. I was standing next to you while speaking and you could not have missed my words. While no objections came from you, how could I surmise that you would later on object to being the President of the Congress Relief Committee? During the last ten years both you and I have served on Relief Committees organised by the Congress and you have always (or practically always) been the President. It was therefore only natural that we should elect you as the President on this occasion. This however is the first occasion on which you have declined to be the President of a Congress Relief Committee.

The Presidentship

The appeals that have been made for funds in the Calcutta Papers have appeared in the same form from the very beginning and bear the names of all the signatories. The appeal was drafted before the Committee elected you as President. You will kindly remember that when the

B. P. C. C. formed the Relief Committee, they appointed the Secretary only and left it to the Committee to elect their own President and Treasurer. That is why in the very first appeal and in all the subsequent publications of that appeal, the name of the Secretary appears without the names of the treasurer and the President.

In the messages sent to the press outside Bengal neither the whole appeal nor the names of all the signatories were sent. But in order to distinguish the Congress Relief Committee from other Committees the names of prominent members of the Committee like yourself, Ramananda Babu, Sir Nilratan Sircar and others were published and the name of the President was also given. I am attaching for your information a copy of one such message. So far as Bengal is concerned, I think it was common knowledge that you were the President of the Congress Relief Committee. To Confirm what I say I am sending a copy of a hand bill which will show that your name was actually advertised in many places as the President of the B. P. C. Flood and Famine Relief Committee and you are a signatory to this appeal which states that you are the President of the B. P. C. Flood and Famine Relief Committee.

I have nowhere in the past minimised your invaluable services to the causes of the country nor shall I ever do so. But though the Congress Relief Committee will be profoundly grieved to lose your kind offices, I may respectfully assure you that the Committee will survive the shock of your non-co-operation.

The letter I published regarding the Bengal Relief Committee was meant for the President of the B. P. C. Flood and Famine Relief Committee. It was not sent to you because was not sure that you would agree to call yourself the President of that Commitee.

Relief Fund of 1922

Your explanation regarding the expenditure of the funds of the Bengal Relief Committee after gratuitous relief was stopped is far from convincing. I do maintain that after gratuitous relief was stopped some time in 1922, the further use of the relief fund for the promotion of cottage industries, hospitals, dispensaries etc. was entirely unauthorised. The Bengal Relief Fund was expressly started with the intent and purpose of spending the surplus funds for gratuitous relief in case of future floods famines in any part of Bengal. You will kindly remember that long after the North Bengal Floods, when distress broke out in Chittagong some of us pressed for a grant for relief work in Chittagong. Sj. Satish Chandra Das Gupta did not favour the idea but in spite of his opposition the committee did make a grant.

Diverted to other purposes

I would beg of you to imagine what the fate of Bengal would have been if on such a crisis as the present one the Bengal Relief Committee had come forward with a magnificent

grant of one lac of rupees. This would easily have been possible to-day if the funds of Bengal Relief Committee had not been diverted by its custodians in an unauthorised manner. No one will say for one moment that the starting of dispensaries and hospitals and the promotion of cottage industries are not desirable activities. My contention is—"What right had the custodians of the Bengal Relief Fund to divert the funds to a purpose other than that for which the fund had been started without the sanction of the committee or even of all the Secretaries ?"

You will pardon me, Sir, if I say that you have side-tracked the issue by referring to the glorious sacrifices made by Sri Satish Chandra Das Gupta, Dr. I. N. Sen, and Sri Niren Dutt. But their sacrifices will not right the wrong that was done in diverting the Funds of the Bengal Relief Committee. Personally I am a propertyless man. But even if I had property and had made a gift of the whole of it to the public—that sacrifice would not have justified my action in setting up a hospital at Serajgang or in promoting cottage industries at Tangail with the funds that I am now raising for the Relief of the flood-stricken people of my province. You have complained that I am complaining after a lapse of several years. I am complaining now because I feel that to-day the country cannot afford to raise a big fund though our countrymen are in such dire distress. Therefore the surplus funds of the Bengal Relief Fund should have been available for gratuitous relief. If the country had been able to raise a big fund to-day, I would not have complained. I

would not mind if the grant to the *Khadi Pratisthan* be in the nature of a temporary loan because in that case the *Khadi Pratisthan* can repay money to the Bengal Relief Committee whenever required to do so. But I would certainly object with all the strength at my command if the grants be in the nature of a permanent gift. If my information that the *Khadi Pratisthan* is a losing concern be correct then there is little hope of our recovering the money from *Khadi Pratisthan* for relief work.

You Sir, have said that you have been administering the funds of the Bengal Relief Committee with the help of colleagues like Sjs. Satish Chandra Das Gupta, Niren Dutt and Indra Narayan Sen Gupta. I am thankful to you for the information but I would respectfully remind you that I am one of the Secretaries of that Committee who has unfortunately been completely ignored by you.

The Appeal of the Needy

You have said that I do not remember the activities of the Relief Committee after gratuitous relief was stopped in 1922 because probably I was not interested in it or I was in internment at the time. In reply to that I say that I was outside jail for full 2 years after the gratuitous relief was stopped and as far as my information and memory go—the diversion of funds did not take place with the sanction of the Committee. You have referred to the accounts being audited and published. That point was unnecessary because

I never suggested that (any) defalcation took place. My sole contention is that the surplus funds of the Bengal Relief Committee were diverted in an unauthorised manner and that is why to-day the money is not available when need it so badly. I would once again beg of you with folded hands on behalf of the flood-stricken people of this province to use all your influence with the '*Khadi Pratisthan*' and see if that money could be recovered.

I would not have made this request to-day (and I have not done so up till now) if the country had been in a position to raise a big fund for gratuitous relief on the present occasion.

You have throughout your letter attempted to rebuke me. do not mind that considering your age and position and the regard in which I hold you.

At Deshbandhu's Command

But there is one point wherein you have cast an indirect aspersion against my late leader which I cannot but strongly resent. You have attacked me for leaving Santahar at the call of Deshbandhu and you have tried to make capital out of it. To that I may say that I am proud that throughout my public career I was ever loyal to my leader and I was not one of those who directly or indirectly tried to undermine his position or influence. Deshbandhu sent repeated telegrams to me to come to Calcutta. I sent some of those messages to you and requested you to talk out the matter with Desh-

bandhu and get his consent to my staying on at Santahar. also told that if you fail to do that I would ultimately have to leave Santahar because being a disciplined soldier I would ultimately have to do his bidding.

You could not or would not settle the matter with him and that is why ultimately I had to return to Calcutta. But it ill becomes you to distort facts. It is not true that I left Santahar suddenly. You had a long notice about my departure and in spite of repeated telegrams from Deshbandhu I did not actually leave Santahar until I felt that the work could very easily be handed over to some one else. You know as well as I do that I was on the spot from the very beginning of the floods and my stay there was more or less unbroken. Towards the end the organisation had been made thorough and complete and Dr. I. N. Sen was then second-in-command. When I left Santahar, he stepped into my shoes and the work went on smoothly. You know that Deshbandhu required my services for the organisation of the Swaraj Party and you have never been kindly disposed towards that party though you have from time to time issued manifestoes supporting condidates for the legislatures including non-Congress or anti-Congress candidates.

But whatever your feelings about the Swaraj Party may be I do not think that you should in fairness attempt to minimise the little service I had the fortune to render to my countrymen in the North Bengal nor should cast an indirect aspersion against my late leader for requisitioning my services or the organisation of the Swaraj Party.

In conclusion I shall only say that in what I have said or written to you I have stood for a principle and I hope that you will not think that my personal feelings towards you have changed. If unfortunately you think so it will give me much pain.

I am

Yours Sincerely

Subhas Chandra Bose

Appendix

(*Khiddirpore Students' Association*)

[*Liberty*—Monday, August 24, 1931]

সুভাষ কংগ্রেস ফণ্ড

'সুভাষ কংগ্রেস ফণ্ড'-এর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র নিম্নলিখিত আবেদন প্রচার করিয়াছেন ঃ

"শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বন্দী-নিবাস হইতে মুক্তিলাভ করিলে স্থির হয় যে, তিনি যখন পুনরায় দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন, তখন এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার হাতে দেওয়া হইবে। তিনি ঐ অর্থ বাংলার কংগ্রেসের জন্য কলিকাতার মধ্যস্থলে একটি গৃহ নির্মাণে ব্যয় করিবেন। ঐ গৃহের একটি হল দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নামে করা হইবে এবং হিন্দী পুস্তকসহ একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা হইবে।

অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে। ঐ কমিটি অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা ১৯৩৭ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতিথি পর্যন্ত অর্থসংগ্রহ করিবেন। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর মুক্তিতে সমগ্র দেশ আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, 'বহুকাল নির্বাসন ও কারাবাসের পর সুভাষচন্দ্র বসুর মুক্তিলাভ কেবলমাত্র বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমরা এতকাল উদ্বেগ ও আগ্রহ লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম।—এখন তিনি আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন। আমরা আশা করি, তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া শীঘ্রই রাজনীতি-ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইবেন। আমি জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, সুভাষচন্দ্রের প্রত্যাবর্তনে তাঁহাকে যোগ্য অভিনন্দন দান করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। বাংলা কংগ্রেসের কাজের ভিত্তিকে শক্ত করা হইতে সুভাষচন্দ্রের যোগ্য অভিনন্দন আর কি হইতে পারে? কংগ্রেসের কাজের জন্য এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার প্রস্তাব বিশেষ সময়োচিত

বলিয়া মনে করি। আশা করি, আমরা যে ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করি, যে আদর্শকে ভালবাসি তাহার জন্য সাড়া দিতে দ্বিধা করিব না।'

"দেশের সুসন্তান শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের মুক্তিতে সমগ্র জাতি যে আনন্দিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে এই ফণ্ডের অর্থ সংগ্রহ।

"যাঁহারা বাংলা কংগ্রেসের কার্য সম্পর্কে উৎসাহ পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে মুক্ত হস্তে এই তহবিলে দান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। বাংলার বাহিরে বাংলার যে সকল সন্তান আছেন, তাঁহাদিগকেও এই তহবিলে দান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। আমাদের বিশ্বাস, এই আবেদনে সকলেই সাড়া দিবেন। আমরা বিশ্বাস করি, প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে কেহ কেহ অগ্রবর্তী হইয়া এই ফণ্ডের জন্য স্বেচ্ছায় অর্থ সংগ্রহ করিবেন। অর্থ 'সুভাষ কংগ্রেস তহবিলের' নামে কলিকাতা ১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট 'সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া'তে জমা দিতে হইবে। অথবা ভবানীপুরে ২নং মিন্টো পার্কে কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ কিংবা ৭নং লায়ন্স রেঞ্জে শ্রীযুক্ত বসন্তলাল মুরারকার নামে পাঠাইতে হইবে। উহা ৫নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে আমার ঠিকানায়ও পাঠান যাইবে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা—৩১শে বৈশাখ, ১৩৪৪ ॥ ১৪ই মে, ১৯৩৭]

পরিশিষ্ট-৫

কলিকাতায় কংগ্রেস ভবন প্রতিষ্ঠা : জমির জন্য কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের নিকট সুভাষচন্দ্রের আবেদন :

'সুভাষ কংগ্রেস ফণ্ড' সংগৃহীত অর্থে যথাসত্বর কলিকাতায় বাংলার 'কংগ্রেস ভবন' নির্মাণের আয়োজন চলিয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এই সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সংলগ্ন এক বিঘা আঠার কাঠা জমি ৯৯ বৎসরের জন্য নামমাত্র খাজনায় ইজারা বন্দোবস্ত চাহিয়া নিম্নলিখিত মর্মে এক পত্র লিখিয়াছেন :—

"আমি কলিকাতা কর্পোরেশনের সম্পত্তিভুক্ত উত্তরে মিত্র লেন, দক্ষিণে মুন্সী সদরউদ্দীন লেন, পূর্বে মাড়োয়াড়ী যুবক সমিতির দখলী জমি ও পশ্চিমে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ—এই চতুঃসীমা মধ্যস্থ আনুমানিক এক বিঘা আঠার কাঠা পরিমিত একখণ্ড জমি নামমাত্র খাজনায় ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা পাইবার জন্য আবেদন জানাইতেছি। এই জমিতে আমি জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থে একটি বৃহৎ হলঘর বিশিষ্ট তিন বা চারতলা অট্টালিকা নির্মাণের সংকল্প করিয়াছি।

"জনসাধারণ বিশেষতঃ কলিকাতা অধিবাসীদের মধ্যে যাহাতে নাগরিক, সামাজিক, সংস্কৃতিমূলক ও রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে আধুনিকতম জ্ঞান বিস্তারের সহায়তা হয় তদুদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত হলঘরে ঐসকল বিষয়ে জনসভা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা হইবে এবং নাগরিকদের মানসিক ও নৈতিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা সভার আয়োজন করা হইবে।

"এই অট্টালিকার একাংশে কলিকাতার নাগরিকদের ও শিক্ষিত জনসাধারণের পাঠ ও জ্ঞানলিপ্সা মিটাইবার উপযোগী একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার স্থাপন করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থ ব্যতীত বহু বিষয়ে প্রমাণ্য গ্রন্থসমূহ রক্ষিত হইবে।

"অট্টালিকার অপর এক অংশে কলিকাতার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে গঠিত কোনও উপযুক্ত ক্লাব বা এসোসিয়েশনকে স্থান দেওয়া যাইবে, এবং ঐ ক্লাবের সদস্যগণ অট্টালিকা সংলগ্ন ফাঁকা জমি ব্যবহার করিতে পারিবেন।

"এই সম্পর্কে আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, সুভাষ কংগ্রেস ফাণ্ডের উদ্যোক্তাগণ ঐই উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত প্রায় (৩০,০০০৲) ত্রিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রস্তাবিত অট্টালিকার আকৃতি ও গঠনসৌষ্ঠব যাহাতে বাংলা দেশ ও কলিকাতা মহানগরীর গৌরব বজায় রাখিতে পারে তদুদ্দেশ্যে এই অট্টালিকা নির্মাণ বাবদ আমি আরও এক লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইব, আশা করি। 'সুভাষ কংগ্রেস ফণ্ড' যে লক্ষ্য লইয়া স্থাপিত হইয়াছে তাহার প্রসারকল্পে এবং উপরোক্ত উদ্দেশ্যে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করিবার সর্তে উপরোক্ত জমি আমাকে ইজারা বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারে।

"নির্মাণকার্য শেষ হইলে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন অনধিক সাতজন ভারতীয় নাগরিক ট্রাষ্টি মনোনীত করিয়া আমি ঐ ট্রাষ্টি বোর্ডের হাতে পূর্ববর্ণিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য পরিচালনার সর্তে জমিসহ অট্টালিকা অর্পণ করিব। আশা করি, যথাসত্বর কর্পোরেশন আমার এই আবেদন মঞ্জুর করিবেন।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ১০ই শ্রাবণ, ১৩৪৫ ॥ ২৬শে জুলাই, ১৯৩৮]

শ্রীনিকেতন শিল্প-বিপণি উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ

কলিকাতায় শ্রীনিকেতন শিল্পজাত দ্রব্যের বিপণি উদ্বোধন (৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৮)উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের বাণীর শেষাংশ ঃ

"যাঁরা স্থূল পরিমাণের পূজারী তাঁরা প্রায় বলে থাকেন যে, আমাদের সাধনক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, সুতরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। এ কথা মনে রাখা উচিত—সত্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তিমহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘে প্রস্থে নয়। দেশের যে অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি সেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে। সূক্ষ্ম একটি সল্‌তে যে শিখা বহন করে সমস্ত বাতির জ্বলা সেই সলতের মুখে।

"আজকের দিনের প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতনের একটি মাত্র বিশেষ কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দেওয়া হল। এই চেষ্টা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছে এবং ক্রমশ পল্লবিত হচ্ছে। চারদিকের গ্রামের সহযোগিতার মধ্যে একে পরিব্যাপ্ত করতে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সময় লেগেছে, আরও লাগবে। তার কারণ আমাদের কাজ কারখানা-ঘরের নয়, জীবনের ক্ষেত্রে এর অভ্যর্থনা। অর্থ না হলে একে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় বলেই আমরা আশা করি এই সকল শিল্পকাজ আপনি উৎকর্ষের দ্বারাই কেবল যে সম্মান পাবে তা নয়, আত্মরক্ষার সম্বল লাভ করবে।

"সবশেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই। তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান। একদা স্বদেশের রাজারা দেশের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশ্বর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্যের। অর্থাৎ কুবেরের ভাণ্ডার এর জন্যে নয়, এর জন্যে লক্ষ্মীর পদ্মাসন।

"তোমরা স্বদেশের প্রতীক! তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা,—রাজার দ্বারে নয়,—মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি

দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্যে এবং সকল কার্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময় এই বলে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। একথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখ এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কি না, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কি না। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তাহলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ করে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ ॥ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮]

পরিশিষ্ট-৭

University College of Science

Department of Physics

November—15, 1938.

Dear Mr. Chanda,

Let me express to you my heartfelt thanks for the hospitality shown to me during my visit to Santiniketan. I sent the whole thing to the Associated Press, as instructed by you. Please give my best regards to the Poet.

I hope you have been able to persuade the Poet to write the two letters to Pandit Jawaharlal and the Mahatma, as agreed upon between ourselves. Kindly send me copies of these letters if you had sent them. The Poet expressed a desire to be acquainted with my article on the 'Philosophy of Industrialisation'. I am therefore sending you two copies of this article and two Presidential Addresses delivered by me in the last meeting of the Indian National Institute. I shall feel much obliged if you can kindly bring these pamphlets to the notice of the Poet. I shall be very glad if he can wield his powerful pen in favour of the view which I have taken and which, I think, should be pushed by all thinking men of the country.

Yours sincerely
Sd/- M. N. Saha

A. K. Chanda Esq M. A.
Sec. Santiniketan,
Birbhum.

November 19, 1938

Dear Dr. Saha,

I hope you will kindly forgive the delay in replying to your letter which happened owing to unavoidable reasons. I have also received your articles which the Poet has been reading with great interest.

You will find herewith the Poet's letter to Jawaharlalji and hope it will be sufficient for our purpose. The poet is not yet quite sure if it would be proper for him to write to Mahatmaji on the other matter. Hc feels he might be putting Mahatmaji in a difficult situation should the exigency of the political situation demand some other President. But I do not think he has made his final decision.

I sent you the other day a copy of the *Moscow News* which we get regularly. Please let me know if it interests you. I have also gone through our list of recent Soviet books but I am sorry there are none which could interest you ; they are all on general literature and art.

With kind regards
Yours sincerely
A. K. C.

University College of Science
Department of Physics

November 22, 1938

Dear Mr. Chanda,

Thanks very much for your kind letter of November. 19. I am really very much grateful to the Poet for having kindly

written to Pandit Jawaharlalji for accepting the Presidentship of the National Planning Committee.

As regards the other matter, I shall be glad if the Poet could see eye to eye with me in the matter and I may be excused for repeating my arguments. Let me assure you that I really hold no brief for any person. I have set my heart on this National Planning and I want that our labours should not be regarded merely as academic efforts but should be given effect to by the National Congress. My experience of the leaders are that much depends on the personality.** I took several days in Calcutta to talk the matter over with Mr. Bose and to convert him to my views. If therefore he continues to be the President he will be automatically Chairman of the Industrial Planning Commission, whose function it would be to give effect to the recommendations of the committee. So if Mr. Bose continues; it will not be necessary for me to urge him to work. He will do it on his own urge. But if any other person happens to be the Congress President, I have to start the cycle again. He has to be converted to my view and even then it will be difficult to find out anybody from amongst the present leaders of the Congress, besides Pandit Jawaharlal and Mr. Subhas Bose, who can be made to realise the importance of this work. You might say why the Planning Commission should be presided by the Congress President. There is no alternative to it, because this has been decided in the A. I. C. C. meeting. I shall be glad if my opinion can be conveyed to the Poet and he can be persuaded to add his Great Voice in this cause.

I am very much interested in the *Moscow News* which you sent. If you do not preserve it we shall be glad if you kindly pass it on to us. I think the really important Soviet books published by the Left Book Club are not allowed to be brought to India. You told me that Mr. Yusuf Meherali has got a full collection of such books. Can you kindly put me in touch with him?

Please give my Pranams to the Poet.

Yours sincerely
M. N. Saha

P.S. I need hardly add how much I enjoyed my visit to the Santiniketan. I wish to come after some time & make a longer stay. My lecture at Bolpur is being vigorously attacked in the Press. I believe that I put my finger in a hornets nest.

November 30, 1938

Dear Mr. Saha,

I wrote to you day before yesterday about Subhas Babu and I hope you got it in time.

Two days ago, I had a letter from Pandit Jawaharlal in which he writes,—"I should like to know if there is any special matter which Gurudeva wants to discuss with me. He mentioned the Planning business. I am greatly interested in this and I want to give some time at least to it. But I have to find my bearings before I decide finally how much time I can give to it. The Committee appointed is a very mixed

crew. Some of them are good like Saha, others are not so promising. Planning is of the greatest importance but I have to face another and more vital problem—the gradual disintegration of our political life. ...."

I have written to him yesterday a long letter telling him all about Gurudev's ideas and his wishes in the matter. If in the meantime Panditji can come, Gurudeva will also certainly request him to pull his weight in favour of re-election.

Yusuf Meherally has not yet returned from Europe. As soon as he returns, I shall put him into touch with you.

Another copy of *Moscow News* has been sent to your address. I am getting the Poet to write to them to send you some of their literature regularly. With kind regards.

Yours sincerely
A. K. C.

University College of Science
Department of Physics

December 1, 1938

Dear Mr. Chanda,

Thanks very much for your kind letter of recent date

Please express my gratefulness to the Poet for having kindly complied with my wishes.

Hoping you are all right

yours sincerely
M. N. Saha

P.S.—I received your *Moscow News* which I enjoy immensely. I shall be glad to get more such papers.

University College of Science
Department of Physics

December 3, 1938

Dear Mr. Chanda,

Thanks very much for your kind letter of November 30. I am indeed very much thankful to the Poet for having written to Pandit Jawaharlal. From the quotations from his letter which you sent me it appears that he is taking up the business seriously. This is encouraging. If he comes to Santiniketan you can tell him that his misgivings about the personnel of the Committee are probably exaggerated. I can personally speak of Dr J. C. Ghose and Mr. A. K. Saha, who will be very helpful and who will fit in with the ideology underlying the policy. Dr. J. C. Ghose is a very thoughtful and capable man and he has given a lot of thought to planning. The old gentleman, Sir M. Visvesvaraya will also be very helpful and it really speaks volumes of his enthusiasm for the cause that at the age of nearly 80 he undertakes a journey to Delhi for taking part in the Industrial Conference. I know less of the Bombay members, but I think they will be useful. It is always open to Panditji to press for co-option for more members in whom he may have more confidence. Some very good men have been prevented by the Government of India from joining the Committee. You have probably seen in the papers that the Viceroy has called a meeting of the Directors of Industries of the different Provinces at Bombay by the middle of January. This shows that the Government

of India does not want to be left behind. This is all the more reason why the Congress should tackle the question of planning very seriously. If Pandit Jawaharlal happens to come to Bolpur I hope you will kindly let me know and I shall come immediately there. Hoping you are all right.

Yours sincerely

Sd/- M. N. Saha

Anil Kumar Chanda Esq. M. A.
Sec. Santiniketan, Birbhum

Please give my Pranams to the Poet.
M. N. S.

পরিশিষ্ট - ৮

ছাত্রদের প্রতি সুভাষচন্দ্র

শান্তিনিকেতনে 'সিংহ-সদন'-এর, সম্মুখস্থ ময়দানে ছাত্রদের সম্বোধন করে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বলেন:

"এখানে যাঁরা শিক্ষার জন্য আসেন তাঁরা কেন আসেন? দেশে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, এই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য কি? বৈশিষ্ট্য কিছু আছে। এখানে এমন কিছু আছে যা অন্য জায়গায় পাওয়া যায় না। যে আদর্শকে এখানে মূর্ত করবার চেষ্টা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি জিনিষ ধরা পড়ে।

"প্রথম কথা এই—এখানকার শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় আদর্শের একটা সংযোগ আছে। যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায় সে-সমস্ত ব্রিটিশ শাসনে গড়ে উঠেছে। তার সঙ্গে জাতির নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের সংযোগ নাই, বাইরে থেকে ইউরোপ দিয়েছে। এখানকার প্রচেষ্টার মধ্যে বিদ্রোহের ভাব রয়েছে। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী, যার উদ্দেশ্য কতকগুলি কেরাণী বা চাকুরীজীবী লোক তৈয়ারী করা—সেটা আমরা চাই না। জাতীয় জীবনে বিভিন্ন প্রকার সংযোগ আছে, প্রকৃতির সঙ্গে একটা সংযোগ আছে। এখানে সে-সমস্ত জিনিষ রয়েছে। যাঁরা জাতীয় সাধনা ও কৃষ্টির মূর্ত প্রতীক তাঁরা এই প্রণালীকে প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের কর্মজীবনের সঙ্গে এর একটা সংযোগ রয়েছে। তাই শান্তিনিকেতনের পাশে শ্রীনিকেতন গড়ে উঠেছে। মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি, তার মানুষ্যত্বের, চরিত্রের, শিল্পকলার—এই সমস্তের উন্নতি শিক্ষার উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের সম্পদ শিক্ষার মধ্য দিয়ে, কর্মের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে। নইলে সে শিক্ষা কার্যকরী হবে না। তাই শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন উভয়ের সংযোগে শিক্ষা এখানে মূর্তি গ্রহণ করেছে।

"সমস্যা এই, এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হলে ভবিষ্যতে আপনারা কোথায় গিয়ে দঁাড়াবেন, কি রকম কর্মের ভার গ্রহণ করবেন। দেশের বুকের উপর একটা সংগ্রাম চলেছে, যার উদ্দেশ্য দেশকে মুক্ত করা। এমন এক সময় ছিল যখন স্বাধীনতা স্বপ্ন বলে প্রতিভাত হ'ত, সে-যুগ কেটে গেছে। আজ আমরা যাত্রার পথে এগুতে এগুতে এমন স্থানে এসে পৌঁছিয়েছি যেখানে প্রাণের মধ্যে অনুভূতি জেগেছে যে, স্বাধীনতা আমাদের করতলগত —অদূর ভবিষ্যতে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করব। আজ আমাদের কাছে স্বাধীনতা সমস্যা নয়। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন এই—স্বাধীনতা যখন আমরা পাব, তার সদ্ব্যবহার করব কি করে। স্বাধীনতা এই জন্য চাই—উহা ব্যতীত জাতিকে মানুষ করে গড়ে তোলা যায় না। এখানে আমাদের কর্মপথে বাধা পড়েছে। যখন কর্মের পথে কোন বাধা থাকবে না তখন জাতির প্রাণে আদর্শকে মুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।

"দেড়শত বৎসরের পরাধীনতা সত্ত্বেও আমাদের দেশে কত মহাপুরুষ জন্মেছেন যাঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, একদিকে মহাপুরুষের আবির্ভাব, অন্যদিকে সাধারণ লোকের পশুবৎ জীবন যাপন—দারিদ্র্য নির্যাতন নিষ্পেষণের মধ্যে জীবন-যাপন, যেন তাদের জীবন মানুষের জীবন নয়।

বিশ্বসভ্যতায় ভারতের দান ঃ

"পরাধীনতা সত্ত্বেও আজ ইউরোপে ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার সম্মান আছে। মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ আমাদের গৌরবের বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে বলতে চাই, ভারতের পরিচয় শুধু এই দুই জন লোকের পরিচয়ে কেন হবে, সমগ্র জাতি কেন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবে না। যেদিন আমরা দিকে দিকে গঠনের কাজ করতে পারব সেদিন সমগ্র জাতিকে এক উচ্চতর সোপানে তুলতে পারব। তখন ভারতের পরিচয় কয়েক জন মহাপুরুষের মধ্যে থাকবে না, সমস্ত জাতির সাধন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জাতির পরিচয় দিতে পারব।

"যদি জাতিকে অল্প সময়ের মধ্যে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হয় তবে এর জন্যও একদল প্রকৃত কর্মী চাই, যারা সকল দিকে জাতিকে মানুষ করে

তুলবে। যারা শিক্ষার্থী তারা যখন বড় হবে তখন এই কর্মের ভার তাদিগকে গ্রহণ করতে হবে। তা করতে হলে প্রাণের মধ্যে চাই একটা আদর্শের ভাব যা প্রতিমুহূর্তে অনুভব করবে—জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ হচ্ছে জাতির সেবা।

"ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশ্যে ভোগ নয়—সেবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য ভোগ। এই মনোভব না-থাকলে কোন বড় কাজ হবে না। সেবকের মনোভাব যদি নিতে পারি যে কোন শিক্ষা পাই না কেন সেটা সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হবে। সেবা করতে হলে তার অধিকারী হওয়া চাই। কে কোন্ দিকে সেবা করবে, স্বভাব ও প্রকৃতি দেখে প্রত্যেকে তা স্থির করবে। ঐকান্তিক নিষ্ঠা না থাকলে সেবা হবে না এবং জাতিকে আমরা মহাজাতিতে পরিণত করতে পারব না।

"আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। যারা. শিক্ষা পেয়েছে তাদের মনে করতে হবে তারা সৌভাগ্যবান—কারণ তারা শিক্ষার মধ্য দিয়ে সেবার সুযোগ পেয়েছে। শিক্ষা সমাপ্ত হলে সমাজের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাহলে ভারতবর্ষের চেহারা বদলে যাবে। এর জন্য পরিকল্পনা চাই। সেবকের প্রাণের মধ্যে সেবার একান্ত প্রবৃত্তি যদি না থাকে তবে সে পরিকল্পনা কখনও সার্থক হবে না। আজকাল ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে পরিকল্পনা চলেছে। সেটা সামান্য কাজ। জাতির জীবনে কর্মের যত দিক আছে প্রত্যেক দিকে এক একটা পরিকল্পনা চাই—শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য, সামাজিক কল্যাণের জন্য এক একটা পরিকল্পনা চাই। পরিকল্পনার দিকে যখন জাতির দৃষ্টি পড়েছে তখন ব্যাপক পরিকল্পনা হবে সন্দেহ নাই। তবে পশ্চাতে যদি সমস্ত শক্তি নিয়ুক্ত করতে পারি, অসম্ভব সম্ভব করতে পারব। রাশিয়া দেখেছে, জাতি পিছনে থাকলেও সে যদি পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে তাহলে ৫/১০ বৎসরের মধ্যে সমাজের চেহারা বদলাতে পারে। রাশিয়াতে বেকার সমস্যা নাই। এটা সমগ্র ইউরোপকে পাগল করে তুলেছে। ভবিষ্যতে এদেশেও পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যাপকভাবে কাজ করতে হবে। কিন্তু পরিকল্পনা কার্যকরী হবে কি করে? আজ যারা ছাত্র-ছাত্রী যুবক-

যুবতী তারা তৈরী হলে সে কাজ হবে। শিক্ষার সুযোগ সেবার অধিকারী হওয়ার সুযোগ। সে চেষ্টা হলে পরিকল্পনা যখন আসবে তখন তাকে কার্যকরী করে তুলতে পারব এবং স্বাধীন ভারতকে আদর্শ জাতিতে পরিণত করতে পারব।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে ছাত্রদের দায়িত্ব

"আমরা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সংশ্লিষ্ট আছি, আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি, স্বাধীনতা পেলে আমাদের কাজ আরম্ভ হবে। এখন জমি তৈরী করছি, বীজ বপন করি নাই। স্বাধীনতা যখন পাব তখন বীজ বপনের সময় হবে। তার জন্য আয়োজন করা চাই। এখন যারা ছাত্র-ছাত্রী তারা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হবে, তখন তাদের উপর দায়িত্ব এসে পড়বে। যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সিপাহী, দায়িত্ব তাদের উপর পড়বে। কি ভাবে তারা সেটা ব্যবহার করবে তার উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আশা করি, সে-সুযোগ পেলে আপনারা তার সদ্ব্যহার করবেন। আমরা যে নূতন ভারত তৈরী করব তার প্রতিষ্ঠা হবে মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম আদর্শের উপর। তাকে ভিত্তি করে স্বরাজের সৌধ নির্মিত হবে। তার মধ্যে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ফুটিয়ে তুলতে পারব, ভারতবর্ষকে আবার ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ করতে পারব এবং ভারতের নর-নারীকে সকল রকমে যোগ্য করে তুলতে পারব। যেদিন ভারতের প্রত্যেক নর-নারীকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে উন্নীত করতে পারব সেদিন আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে। নচেৎ একজন মহাত্মা গান্ধী বা একজন রবীন্দ্রনাথের দ্বারা জাতির সাধনা সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবে না। ওঁদেরকে পুরোভাগে রেখে জাতিকে অগ্রসর হতে হবে। তাকে নিয়ে যাওয়ার ভার যুবক যুবতীর উপর। তাঁরা সে প্রেরণা লাভ করুন এই আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে শিক্ষার যে আয়োজন রয়েছে তার যদি সদ্ব্যবহার তাঁরা করেন তাহলে তাঁদের জীবন সার্থক হবে এবং জাতির সংগঠনকার্য সাফল্যমণ্ডিত হবে।

আমি আশা করি এ-সুযোগ ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়বেন না, এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে বৃহত্তর সেবার জন্য চেষ্টিত হবেন।

"পূর্বের চেয়ে এখানে এসে সহস্রগুণ বেশী আনন্দ পেয়েছি। আজ বিশ্বভারতীর স্থান শুধু ভারতের বুকে নয়, বিশ্বের বুকে। এখানকার কর্মপ্রচেষ্টা শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য। ভারতের কৃষ্টি শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য। জাতীয়তার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। একটি অপরটির সোপান মাত্র। একথা সত্য হলে বিশ্বভারতীর স্থান বিশ্বের বুকে। যাঁরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁরা বিশ্বভারতীর আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করুন, ইহাই ভারতের প্রত্যেক নরনারীর আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ৯ই মাঘ. ১৩৪৫ ॥ ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৯]

পরিশিষ্ট-৯

Statement of Mahatma Gandhi

Bardoli,
January 31, 1939.

Mr. Subhas Bose has achieved a decisive victory over his opponent Dr. Pattabhi Sitaramayya. I must confess that from the very beginning I was decidedly against his re-election for reasons into which I need not go. I do not subscribe to his facts or the arguments in his manifestos. I think that his references to his colleagues were unjustified and unworthy. Nevertheless, I am glad of his victory; and since I was instrumental in inducing Dr. Pattabhi not to withdraw his name as a candidate when Maulana Saheb withdrew, the defeat is more mine than his. And I am nothing if I do not represent definite principles and policy. Therefore, it is plain to me that the delegates do not approve of the principles and policy for which I stand. I rejoice in this defeat.

It gives me an opportunity of putting into practice, what I preached in my article on the walk-out of the minority at the last A.I.C.C. meeting in Delhi. Subhas Babu instead of being President on the sufference of those whom he calls Rightists is now President, elected in a contested election.

This enables him to choose a homogeneous Cabinet and enforce his programme without late or hindrance.

There is one thing common between the majority and the minority viz., insistence on internal purity of the Congress organisation. My writings in the *Harijan* have shown that the Congress is fast becoming a corrupt organisation in the sense that its registers contain a very large number of bogus members. I have been suggesting for the past many months the overhauling of these registers. I have no doubt that many of the delegates who have been elected on the strength of these bogus voters would be unseated on scrutiny.

But I suggest no such drastic step. It will be enough if the registers are purged of all bogus voters and are made fool-proof for the future. The minority has no cause for being disheartened. If they believe in the current programme of the Congress, they will find that it can be worked, whether they are in a minority or a majority and even whether, they are in the Congress or outside it. The only thing that may possibly be affected by the changes is the Parliamentary programme.

The Ministers have been chosen and the programme shaped by the erstwhile majority. But Parliamentary work is but a minor item of the Congress programme. Congress Ministers have after all to live from day to day. It matters little to them whether they are recalled on an issue, in which they are in agreement with the Congress policy or whether they resign, because they are in disagreement with the Congress.

After all Subhas Babu is not an enemy of his country. He has suffered for it. In his opinion his is the most forward and boldest policy and programme. The minority can only wish it all success. If they cannot keep pace with it, they must come out of the Congress. If they can, they will add strength to the majority. The minority may not obstruct on any account. They must abstain, when they cannot co-operate. I must remind all Congressmen that those, who being Congress-minded remain outside it by design, represent it most. Those, therefore, who feel uncomfortable in being in the Congress, may come out, not in a spirit of ill will, but with the deliberate purpose of rendering more effective service.

[*Crossroads*—Pp. 105-6]

পরিশিষ্ট - ১০

ত্রিপুরীর গান

ত্রিপুরী কংগ্রেসে 'কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি ছাড়া প্রায় সমস্ত বামপন্থী দল ও গোষ্ঠীই সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ 'কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি'র ভোটদানে বিরত থাকার ফলেই সুভাষচন্দ্রের পরাজয় ঘটে ;—তাঁরা ভোট দিলে অন্ততঃ এতখানি ভোটের ব্যবধানে পরাজয় ঘটত না। তার ফলে বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে পণ্ডিত পন্থের মূল প্রস্তাবটি ২১৮-১৩৫ ভোটে গৃহীত হয় ;—এবং সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হয় (১০ই মার্চ, ১৯৩৯)। এর ফলে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিকে সমস্ত বামপন্থী দলের নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, বিশেষ করে বাংলা দেশে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের অল্পকাল পরেই সুভাষচন্দ্র এক পত্রে অমিয়নাথ বসুকে লিখেছিলেন (১৭/৪/৩৯):

Our defeat was due to the betrayal of C. S. P. leadership and some bungling in tactics on our side. The C. S. P. is now being shaken to its foundations owing to revolt among the rank and file against the Tripuri policy of the leaders....."

[দ্রঃ *Crossroads*—P. 113]

ত্রিপুরী কংগ্রেসের কিছুদিন পরেই 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'-এর সম্পাদক অধ্যাপক সুরেন গোস্বামী মশায় কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিকে তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে গান বেঁধেছিলেন। এটি 'ত্রিপুরীর গান' শিরোনামায় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয় :

ত্রিপুরীর গান

মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল
লাল বুলি আওড়ান আমাদের ছল
কাজে মোরা কংগ্রেসী পাণ্ডা
জওহরলালের ধরি ঝাণ্ডা
চিৎকার করি শুধু বাড়ায়েছি গান্ধীর বল
মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল ॥

লাল জুজু ভয়ে সদা সঙ্কুচিত
ত্রিপুরীতে তাই মোরা বল্লভিত
দক্ষিণী শক্তির ভক্ত
চেয়ে আছি কংগ্রেস তক্ত
অহিংস বাঘ সাথে মোরা ফেরুদল
মোরা সব কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দল ॥

—সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

[দ্রঃ আনন্দবাজার পত্রিকা - ৫ই চৈত্র, ১৩৪৫ ॥ ১৯শে মার্চ, ১৯৩৯]

ওয়ার্কিং কমিটির দণ্ডাদেশ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি

কলিকাতা-১২ই আগষ্ট, ১৯৩৯ :

"ওয়ার্কিং কমিটি আমাকে তিন বৎসরের জন্য কংগ্রেস হইতে কার্যতঃ বহিষ্কৃত করিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া দক্ষিণপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি করিবার যে প্রক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে যে প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হইয়াছে, ইহা তাঁহারই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। ওয়ার্কিং কমিটির এই কার্যে কংগ্রেসের বর্তমান সংখ্যাগুরু দলের প্রকৃত পরিচয় এবং তাঁহারা যে ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তবে আমার এই শাস্তিবিধান তাঁহাদের দিক হইতে সম্পূর্ণ সঙ্গত হইয়াছে। আমি নিয়ম-তান্ত্রিকতা ও সংস্কার পন্থার দিকে যে ঝোঁক ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে দেশকে সতর্ক করিয়া দিয়াছি, কংগ্রেসের বিপ্লবাত্মক মনোভাব বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি। বামপন্থীদিগকে শক্তিশালী করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবং সর্বোপরি আসন্ন সংগ্রামের জন্য পুনঃ পুনঃ দেশকে প্রস্তুত হইতে বলিয়াছি। আমার এই সকল অপরাধের শাস্তি আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। এই দণ্ডাদেশ আমার বহু সংখ্যক দেশবাসীর মনে আঘাত লাগিবে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার কোন ক্ষোভ নাই। নিয়মতান্ত্রিকতা ও গণসংগ্রামের মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধিয়াছে, তাহার স্বাভাবিক পরিণতি এবং আমাদের রাজনৈতিক বিবর্তনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে এই শাস্তিবিধান সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কাজেই ইহাতে আমার মনে বিন্দুমাত্র তিক্ততা বা ক্ষোভের সঞ্চার হয় নাই। আমার কেবল এই বলিয়া দুঃখ বোধ হইতেছে যে, এই ধরণের কার্যে আমার অপেক্ষা ওয়ার্কিং কমিটিরই ক্ষতি অধিক হইবে, এ কথাটা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই।

"ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্যগণ, সমস্ত বামপন্থী এবং জনসাধারণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এই ব্যাপারে উত্তেজিত না-হইয়া অবিকম্পিত চিত্তে এবং অধিকতর ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে তাঁহাদের কার্য করিয়া যান। আমার শাস্তি হইল তাহাতে কি আসিয়া যায়? আমি বরং পূর্বাপেক্ষা অধিক নিষ্ঠাসহকারে কংগ্রেসকে সেবক হিসাবে কংগ্রেস ও দেশের জন্য আঁকড়াইয়া থাকিব এবং জাতির দীন কাজ করিয়া যাইব। তাই দেশবাসীর নিকট আমার নিবেদন, তাঁহারা লাখে লাখে কংগ্রেসে যোগ দিন এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের সদস্য হউন। এই উপায়েই আমরা কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদিগকে আমাদের মতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইব, বর্তমানের নিয়ম-তান্ত্রিকতা ও সংস্কার-পন্থার দিকে ঝোঁক রোধ করিতে পারিব এবং সমগ্র ভারতের সমবেত শক্তির সাহায্যে পুনরায় স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ করিতে পারিব।

"পরিশেষে আমি জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আজ যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। বহু বৎসর পূর্বে তদানীন্তন বামপন্থীরাও এই প্রকারে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়া পুনরায় কংগ্রেসে ফিরিয়া আসেন এবং কংগ্রেসকে তাঁহাদের নীতি এবং কার্যক্রমই গ্রহণ করিতে হয়। আমি নিঃসন্দেহে মনে করি যে, আমরা—বামপন্থীরা যে উদ্দেশ্য চলিতেছি, তাহা ন্যায়সঙ্গত এবং ওয়ার্কিং কমিটির এইরূপ কার্যই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অধিক সহায়ক হইবে। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ফরোয়ার্ড ব্লকের আহ্বানে যে অত্যাশ্চর্য সাড়া পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, অবিলম্বে এমন দিন আসিবে, যে-দিন আমরা কংগ্রেসকে নবজীবন দিতে পারিব এবং উহার বৈপ্লবিক মনোভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিব এবং কংগ্রেসের নামে স্বাধীনতা সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ করিতে সক্ষম হইব।"—এ, পি.

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪৬ ॥ ১৩ই আগষ্ট, ১৯৩৯]

পরিশিষ্ট-১২

'মহাজাতি সদন'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্রের ভাষণ :

"বহুদিনকার এক স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবার প্রথম প্রচেষ্টা উপলক্ষে আজ আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করে আসছেন, তাঁরা অনেকদিন থেকে একটা অভাব বোধ করে আসছেন, সে অভাব একটা গৃহের, যেখানে তাঁদের যাবতীয় সেবাকার্য আশ্রয় পেতে পারে এবং যেটা তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও আদর্শের একটা বাহ্য প্রতীকস্বরূপ হতে পারে। ইতিপূর্বে আমাদের জাতীয় নিকেতন নির্মাণের চেষ্টা একাধিকবার করা হয়েছে কিন্তু কৃতকার্য হয় নি। পরিশেষে, আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা 'মহাজাতি সদন'-এর ভিত্তি স্থাপনা আজ করা হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং আপনার দ্বারা সেই বীজ আজ বপন করাতে পেরেছি যার ফলের দ্বারা আমরা একদিন ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট ও সুসমৃদ্ধ করে তুলতে পারব।

"আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের কথা আপনা-আপনি মনে আসছে। এই ভূমিতেই সেই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল যার দ্বারা আমাদের ধর্ম ও কৃষ্টি সংস্কারের ভিতর দিয়ে পুনর্জীবন লাভ করেছে। এই আন্দোলন প্রাদেশিকতার গণ্ডি মানে নি—এমন কি জাতীয়তার গণ্ডিও অতিক্রম করেছিল। রামমোহন ও রামকৃষ্ণ যে বাণী দিয়েছিলেন—তা কি বিশ্বমানবের জন্য নয়? তাঁদের ভিতর দিয়ে কি সুপ্তোত্থিত, নবজাগ্রত ভারত আত্মপ্রকাশ লাভ করে নি? আমরা জানি যে, আমরা তাঁদেরই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।

"নবজাগরণের ফলে, প্রবুদ্ধ ভারতের মুক্ত আত্মা যখন 'বহু'-র মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইলেন, তখন দেখলেন যে, একদিকে রাষ্ট্র

এবং অপরদিকে সমাজ তাঁকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। তারপর আরম্ভ হল—রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সমাজ-বিপ্লব। সেই বিপ্লবের সূচনাও এই ভূমিতে—যেখানে একদিন ধর্মবিপ্লবের ও কৃষ্টি-বিপ্লবের আবির্ভাব হয়েছিল।

"১৮৮৫ খৃঃ কংগ্রেসের (বা নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার) জন্ম হয়। কুড়ি বৎসর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এক নূতন যুগ আরম্ভ হয়—সেটা স্বাবলম্বনের যুগ, স্বদেশীয় ও বিদেশী-বর্জনের যুগ। তারপর একদিকে বঙ্গভঙ্গ এবং অপরদিকে আমলাতন্ত্রের দমননীতি এমন এক বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করল যে, দেশের তরুণ সম্প্রদায় উত্তেজনায় বশবর্তী হয়ে, আত্মসংযম হারিয়ে ইতিহাসের চিরপরিচিত পন্থা—সশস্ত্র বিদ্রোহের পন্থা—অবলম্বন করলে। দশ বৎসর অতীত হতে না-হতে আমরা পুনরায় আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করলাম—'অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের' অধ্যায়।

"আজ ভারতের রাষ্ট্রীয় গগন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। আমরাও ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি যেখান থেকে বিভিন্ন দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই—যে নিয়মতান্ত্রিকতার পথ আমরা ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বর্জন করেছিলাম পুনরায় কি সেই পথে ফিরে যাব? অথবা আমরা কি গণ-আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়ে গণ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হব? এখানে তর্কবিতর্ক আমি শুরু করব না—আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে, নবজাগ্রত ভারতীয় মহাজাতি স্বাবলম্বন, গণ-আন্দোলন এবং গণসংগ্রামের পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না। এই পন্থার দ্বারাই তারা অনেকটা সাফল্যলাভ করবে বলে বিশ্বাস করে। সর্বোপরি, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা তুচ্ছ আপোষ করে তারা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার—স্বাধীনতা হেলায় ছেড়ে দেবে না।

"যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি তা' শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়। আমরা চাই ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র—আমরা চাই এক নূতন সমাজ ও এক নূতন রাষ্ট্র, যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে

মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম আদর্শগুলি। গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বত কণ্ঠে আমাদের সুপ্তোত্থিত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন,—আপনি বিশ্বকবি। আমাদের স্বপ্ন মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে-সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠ্‌ছে—তা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারে?

"গুরুদেব! আজকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরহিত্যের পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমল দ্বারা 'মহাজাতি সদন'-এর ভিত্তি স্থাপনা করুন। যে-সমস্ত কল্যাণ-প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তি ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে—এই গৃহ তারই জীবনকেন্দ্র হয়ে 'মহাজাতি সদন' নাম সার্থক করে তুলুক—এই আশীর্বাদ আপনি করুন। এবং আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম-পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।"

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ৩রা ভাদ্র, ১৩৪৬ ॥ ২০শে আগষ্ট, ১৯৩৯]

পি. সি. যোশীর বিবৃতি

রামগড়ে আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে 'জাতীয় সপ্তাহ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র সংগ্রামের কর্মসূচী ঘোষণা করার পর কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে পি. সি. যোশী সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করেন :

বোম্বাই—১লা এপ্রিল, ১৯৪০ :

"রামগড়ে আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবসে বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় আন্দোলনগুলিকে উগ্রতর করা হইবে এবং নিখিল ভারতীয় একটি আন্দোলন করা হইবে। এই আন্দোলন আরম্ভ এবং পরিচালনার জন্য আপোষ-বিরোধী সম্মেলন একটি নিখিল ভারতীয় সমর পরিষদ গঠনেরও প্রস্তাব করিয়াছেন।

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী ও পাল্টা একটি জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া তাহার মারফতে ও তাহার নেতৃত্বে একটি জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার চেষ্টা করা হইতেছে। এরূপ প্রচেষ্টার ফলে জাতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ করা হইবে। প্রস্তাবিত সমর পরিষদ যে আন্দোলন করিবে তাহা 'জাতীয়' কিম্বা 'আন্দোলন' কোনটাই হইবে না। অধিকন্তু ইহার দ্বারা কংগ্রেসকে উদ্দীপিত এবং গণ-আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যও সিদ্ধি হইবে না। পক্ষান্তরে ইহা কংগ্রেসের ঐক্যকে শিথিল করিবার অর্থাৎ একমাত্র যে প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে প্রকৃত এবং কার্যকরী জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত করা যাইতে পারে সেই প্রতিষ্ঠানকেই শক্তিহীন করিয়া ফেলিবে। ইহাতে আপোষ-বিরোধী আন্দোলনের শক্তিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিবে এবং জাতীয় আন্দোলনকে দ্রুততর করিবার পরিবর্তে বরং তাহাকে ব্যাহতই করিবে।

এমতাবস্থায় উল্লিখিত প্রস্তাবানুযায়ী যে সমর পরিষদ গঠিত হইবে, তাহার সহিত কমিউনিস্টদিগের কোনই সম্পর্ক থাকিবে না, অথবা প্রস্তাবক তথাকথিত যে নিখিল ভারত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিতে চাহেন, তাহার সহিত আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন প্রকারেই যোগদান করিব না। ইহা নিশ্চিত, কারণ কমিউনিস্টগণ পূর্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত বসুর কর্মপন্থা সংহতি ক্ষুণ্ণকারী এবং সেই জন্যই তাঁহারা আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। বর্তমান গান্ধীবাদ কংগ্রেসের ঐক্য ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং কংগ্রেসকে গণ-আন্দোলনের পথ হইতে অপসারিত করিতেছে বলিয়াই কমিউনিস্টগণ উহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। ঠিক এই কারণেই আমরা শ্রীযুক্ত বসুর কর্মপন্থার বিরোধী। কারণ উক্ত কর্মপন্থানুযায়ী একটি সমর পরিষদ গঠন করিয়া কংগ্রেসের ঐক্য বিনষ্ট করিবার এবং জাতীয় আন্দোলনকে দ্রুততর করিবার পরিবর্তে বরং ব্যাহত করিবারই চেষ্টা করা হইতেছে। বর্তমান ভারতের যে কোনও স্থানে স্থানীয় কিম্বা আংশিক ভাবে যে-সব আন্দোলন চলিতেছে, তাহা হয় কমিউনিস্টদিগের নেতৃত্বে অথবা তাহাদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে পরিচালিত হইতেছে।”

[আনন্দবাজার পত্রিকা - ২২শে চৈত্র, ১৩৪৬ ॥ ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪০]

নির্দেশিকা

গ্রন্থপরিচিতি

কালান্তর (সং ১৯৬২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পল্লীপ্রকৃতি (সং ১৯৬২) " "

চিঠিপত্র - ২য় (আষাঢ় ১৩৪৯) " "

চিঠিপত্র - ৫ম (পৌষ ১৩৫২) " "

রবীন্দ্র-রচনাবলী-২৪শ (বিশ্বভারতী সং) " "

ভারতের মুক্তিসংগ্রাম (মাঘ ১৩৭৩) সুভাষচন্দ্র বসু

পত্রগুচ্ছ (বৈশাখ ১৩৬৭) জওহরলাল নেহরু

বাংলায় বিপ্লববাদ (বৈশাখ ১৩৬১) নলিনীকিশোর গুহ

সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র (ডিসেম্বর ১৯৪৬) সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

অনামী (আশ্বিন ১৩৬৫) দিলীপকুমার রায়

মেঘনাদ রচনা সংকলন শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত —'সায়েন্স বুক এজেন্সী'

The Indian Struggle (Ed. - 1964) Subhas Chandra Bose

Crossroads (Ed. - 1962) " "

Selected Speeches of Subhas Chandra Bose (Ed. - 1962) Publication Division : Government of India

Congress Presidential Addresses (Vol. I) G. A. Natesan

A Bunch of Old Letters (Ed. 1958) J. Nehru

Hind Swaraj (Navajiban) M. K. Gandhi

The History of the Indian National Congress (Vol. I, II) Pattabhi Sitaramayya

Mahatma (Vol. III, IV, V) D. G. Tendulkar Publication Division : Government of India

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩	৭	hardly out	hardly point out
৫০	৭	বিশিষ্ট লেখকের	বিশিষ্ট ইংরাজী লেখকের
৫১	১৪	Indian nationalist	Indian rationalist
৫৬	১২	প্রগতিশীল	প্রতিক্রিয়াশীল
১৬৮	২৭	impassee	impasse
২০৫	২০	১৭ই জানুয়ারী	১৬ই জানুয়ারী
১৮৯	১০	প্রাথমিক	প্রাদেশিক কংগ্রেস